

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কবিতা-সংগ্রহ



சென்னை 5-19-2000

বিবেদন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহের 'নবম সম্ভার' প্রকাশিত হইল। বর্তমান প্রকাশনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শুভ-সংবাদ হইতেছে যে, এই খণ্ডটি আমাদের নব-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয় 'শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী' হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। সুষ্ঠু ও শোভনভাবে যাহাতে সংগ্রহসমূহ প্রকাশ করা যায় তাহার জন্ম যে-সকল সহৃদয় ব্যক্তি পরামর্শ ও সহযোগিতার দ্বারা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষ করিয়া সঙ্কলন ও প্রকাশ এবং নব-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণালয় স্থাপন-ব্যবস্থায় অকুণ্ঠ ও অক্লান্ত সহযোগিতার জন্ম শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পরিশেষে পরোক্ষ সহযোগিতার জন্ম বাঙলার বিদগ্ধ পাঠক-সমাজ ও শরৎ-সাহিত্যানুরাগীগণের প্রতি আমার সম্রদ্ব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

শরৎ-স্মৃতি-মন্দির

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা-২৯

শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী

সূচীপত্র

১। শেষ প্রশ্ন	১
২। স্বামী	২৭৯
৩। একাদশী বৈরাগী	৩২৫
৪। নারীর মূল্য	৩৪১
৫। অপ্রকাশিত রচনাবলী	৩৯৭
(ক) ক্ষুদ্রের গৌরব	৩৯৯
(খ) সত্য ও মিথ্যা	৪০৪
(গ) রস-সেবায়ত	৪০৯
(ঘ) আসার আশায়	৪১২
(ঙ) রসচক্র	৪১৫
(চ) সধবার একাদশী	৪২২
৬। গ্রন্থ-পরিচয়	৪২৫

শেষ প্রশ্ন

>

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালীপরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা সহরে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ-বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ-বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াছড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় বিকিব্ব জীবন। বাদশাহী আমলের কেলা ও ইমারৎ দেখা ইঁহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝাবি, ভাঙা ও আ-ভাঙা যেখানে বত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে ; এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া জ্যোৎস্নায় অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যান্ ফ্যান্ করিয়া চাহিয়া যমুনার এপার হইতে ওপার হইতে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার বত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোক কবে কি বলিয়াছে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে স্নমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়-ঘর ছিল, কোন্ জাঠসর্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে, সে কালীর দাগ কত প্রাচীন—কোন্ দস্যু কত হীরা-মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত, কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই।

এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী-সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আসে, আমেরিকান টুরিষ্ট হইতে শ্রীবন্দাবন-ফেরত বৈষ্ণবদের পর্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, এমনি সময়ে একজন প্রৌঢ়-বয়সী ভদ্র বাঙালী-সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা স্ত্রীপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য-উদ্ধারের অজুহাতে সহরের একপ্রান্তে মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারী, বাবুর্জি,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

দরওয়ান আসিল ; কি, চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল ; গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস, কোচম্যানে এতকালের এত বড় ফাঁকা-বাড়ির সমস্ত অঙ্ক-রন্ধ যেন যাহুবিজ্ঞায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল । ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কণ্ঠার নাম মনোরমা । অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক । কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরতিমান সহজ ভদ্র আচরণে । তিনি মেথেকে সঙ্গ করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, স্মরণে নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব । মনোরমা বাড়ির ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাঁহাকে পর করিয়া না রাখেন । এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা ।

শুনিয়া সকলেই খুশি হইলেন । তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ী এবং মোটর যখন-, তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনা-গোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল পৌছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনের হৃদয়তা এমনি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক এ-কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ-খানের অধিক সময় লাগিল না । কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই । ইঁহারা হিন্দু বা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত । বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয় না । তবে আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়া যতটা বুঝা যায়, সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে, ইঁহারা যে সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ বাচ-বিচার করিয়া চলেন না । বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্য্যন্ত মেথেকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ যে সমাজেরই অন্তর্গত হোন, বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ।

অবিনাশ মুখুয্যে কলেজের প্রফেসর । বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই । ঘরে বছর-দশেকের একটি ছেলে ; অবিনাশ কলেজে

শেষ প্রশ্ন

পড়ায় এবং বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা স্বচ্ছল—নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর-দুই পূর্বে বিধবা শালিকা ম্যালেরিয়া জরাক্রান্ত হইয়া বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জর ছাড়িল কিন্তু ভগিনীপতি ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহে তিনি কর্তী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন, বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে—বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দণ্ড ক'রো না—কপাল! নইলে চেষ্ঠার ক্রটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটার সর্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেণ্টিঙ, মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা বুলাইয়া দেয়। এইদিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস-পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোকসমাগম ঘটে। আজ কি-একটা পর্কোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহালাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন-দুই নীচের ঢালা বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন-দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকি সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের দিগ্ভাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটা মাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্নমেন্টের প্রতি রাইচ্যাম্ ইন্ডিগনেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমন সময় মস্ত একটা ভারি মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্ঠাকে লইয়া প্রবেশ করিতেই সকলেই সম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যাম্ ইন্ডিগনেশন জল হইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বন্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে পড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চহাস্তে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বস্তির অসময়? এতবড় দুর্নাম যে আমার ছোটখুড়োও দিতে পারেন না অবিনাশবাবু?

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বলচ বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক ছোটখুড়োর কথা। কন্ঠার আপত্তি, কিন্তু এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাকরুণের বাপের সাধি নেই যে দেয়। এই বলিয়া

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বলব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে যে পায়ের ধুলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধুলো ঝাঁট দেবার জন্তেই আপনাকে একটা চাকর রাখতে হ'ত অবিনাশবাবু। কিন্তু আজ আর বসবার যো নেই, এখনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্ত সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্ত মাকে পর্যাপ্ত টেনে এনেচি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেচি—সপরিবারে যেতে হবে। তার পর একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার ছকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে হবে না। আর একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ডস্, মেয়েদের জন্ত না হোক, আমাদের পুরুষদের জন্ত ছুরকম খাবার ব্যবস্থাই—অর্থাৎ কি না—প্রেজুডিস যদি না থাকে ত—বুঝলেন না?

বুঝিলেন সকলেই এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন সকলেই যে, তাঁহাদের প্রেজুডিসু নাই।

আশুবাবু খুশি হইয়া কহিলেন, না থাকারই কথা। মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলো না। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে তাঁদের অভিরূচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফিরতে আজ বোধ করি আমাদের সম্বন্ধে হবে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্ত উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্রালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার সখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে। মাছ-মাংস পিঁয়াজ-রসুন ও ত স্পর্শ করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস খান না?

আশুবাবু বলিলেন, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজির ভারি অনিচ্ছে, সে হ'লো আবার সন্ন্যাসী-গোছের মাগুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; পিতার অনমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি-সমস্ত বলে যাচ্ছ বাবা!

শেষ প্রশ্ন

পিতা খতমত থাইয়া গেলেন এবং কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিল না।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিল না এবং আরও ছু-চারি মিনিট যাহা ইহার বসিয়া রহিলেন, আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্ত সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষণ্ণতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবুর পত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সম্ভান তাহা সকলেই জানিত; নিজে গাজও সে অনুঢ়া—আয়তির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজা-সুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ এই সন্ন্যাসী-গোছের বাবাজী যেই হোন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ তাহার নিষেধ নহে, কেবলমাত্র অনিচ্ছাব চাপেই এতবড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কণ্ঠার মাছ-মাংস রঙুন-পিঁয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এবং লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে ভুড়-সড় হইয়া গেলেন, কণ্ঠা আরক্ত-মুখে শুক হইয়া রহিল—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল এবং এই আগন্তুক পরিবারের সহিত মিলা-মিশার যে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

২

মনে হইয়াছিল আশুবাবু সহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাহারা শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসরমহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন, বাড়ির মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্বে আনা হইয়াছিল।

৭

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন-দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অল্প কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলি! মোষ্ট ওয়েলকাম্।

ওস্তাদজীদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না যেন! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনার জন্তই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুশি হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেচি মশাই, আবিষ্কার করেচি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা নয়, সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। বলিয়া তিনি সকলকে এক-প্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্রামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, জ্র, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহ এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে যে কি বিশ্বয়ের বস্তু হয় তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক্ লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতি-নমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এমনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক। কই, আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিল, পাননি বুঝি? আশ্চর্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, বুঝতে পারিনি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্ভিগ্ন হয়েছিলেন।

শেষ প্রশ্ন

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহ-যোগীগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হোক, ইহারা যে পূর্ব হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনা এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কেবলমাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ-প্রকৃতি অবিনাশ পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইল না, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ির সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গান-বাজনা শুরু হইতে পারিতেছে না।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ-ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল— বিশেষত্ব-বর্জিত মামুলি ব্যাপার, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্রপরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্যসত্যই একেবারে অপূর্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত অনবগত কণ্ঠস্বরে নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহাতে পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গি, সুরের স্বচ্ছল সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই সর্বাঙ্গীণ তান-লয়-পরিপূর্ণ সঙ্গীত যখন শেষ হইল তখন মনে হইল খেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমির খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নহি শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতে গান-বাজনার চর্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বৃকের মধ্যটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টন্ টন্ করিতে থাকে তাহা সে জানিত না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেছি। তুলনাই হয় না। এই বছর-খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিটলি ইম্প্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাঁচা লোক বলিয়া বন্ধু-মহলে খ্যাতি আছে। গান-বাজনা ভাল-লাগাটা তাঁহার মতে চিত্তের দুর্বলতা। নিব্বলক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে সহরের আবহাওয়া পুনশ্চ কনুসিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শাস্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাটির মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইহাদের ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টি লেগে থাক, এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিল না এবং দ্বিতীয়তঃ গানের প্রাণ থাকা না-থাকার স্মূর্নির্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের শ্রায় আর কাহারও স্পষ্ট নয়। গুণগুণ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল, মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে এবং তাঁহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন এবং অঙ্গীর্ণ রোগগ্রস্ত মুসেফবাবু জল ও গান মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর-মহল। ক্রমশঃ তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্ত আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক আহারে রুচি ছিল না, সে না খাইয়াই বাঁসায় ফিরিতে উত্তত হইয়াছিল, কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুন্ড্রা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটয়াছিল এবং মাত্র দুই-তিনদিনের আলাপেই কি করিয়া সে পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর সবচেয়ে বাগাড়রি হচ্ছে আমার কানের। গুর গলার অক্ষুট সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া কণ্ঠকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন,

শেষ প্রশ্ন

কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক ? বলিনি যে, মণি এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা ?

কণা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ী থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক না অক্ষয়। থাক না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার-কয়েক মাথা নাড়িলেন ; কহিলেন, না অবিনাশবাবু, চাপলে চলবে না। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্তব্য জ্ঞান করি। উনি—

আহা হা, কর কি অক্ষয় ! কর্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে, হবে এখন আর একদিন। বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না। বলিলেন, আগনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই না কি ? কিন্তু তার কি স্থান-কাল নেই ?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ সহরে যদি আর না আসতেন, যদি ভদ্র-পরিবারে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, it is too much !

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, no, it is not.

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা হা—করচ কি তোমরা ?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রাঘ উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। গুর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি করে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্ত।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন, মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এইসকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, মিছে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কথাই ত! কারণ প্রফেসরি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের অর্থাৎ আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হ'লো। আর তাই ত হ'লো।

আগুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্ত।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সে-ই কখনো না কখনো মাতাল হয়। যে হয় না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাসতে পারেন, কিন্তু এ অপবাদে আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন, এ অপবাদ ত আমি দিইনি! আমাকে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করবার জন্ত আপনারা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন এ-সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা হলে আশা করি আরও একটা সত্য এখনি স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে। তবে এ জানি, অপরের সম্বন্ধে আপনার কোভূহল যেমন অপরিমিত, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেমনি বিপুল।
" কি স্বীকার করতে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিগ্ৰহমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার দিবাহ করেছেন সত্য কি না?

আগুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন—আপনি কি-সব বলছেন অক্ষয়বাবু? একি কখনো হয়, না হতে পারে?

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আগুবাবু। তাঁকে ত্যাগ করে আমি আবার দিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

" শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চললো—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট। তাতে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে করে দাঁত পড়ে, চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এইজন্তেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হ'লো।

শেষ প্রশ্ন

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—আ! শুধু এর জন্ত? তাঁর আর কোন অগরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না, মিথো একটা অগবাদ দিলে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্মল সত্যবাদিতায় অদিনাশ যেন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ-লোকসান চুড়োয় থাক, একবার মিথো করেই বল যে, সে গভীর অগরাধ করেছিল তাই তাকে ত্যাগ করেচ। একটা মিথোতে আর তোমার পাপ বাড়াবে না।

শিবনাথ রাগ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এরকম অযথা কথা আমি বলতে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জঙ্গিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আগনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু?

শিবনাথ ইচ্ছাতেও রাগ করিল না; শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথো দিলেকের শিকল গায়ে তড়িয়ে মিলেকে পধু করে তোমার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই জীবন-ধাবণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আগনার দ্বার দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রক্ত হয়ে পড়াটা পরিভ্রাণের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে, অসুখ ত অগরাধ নয় শিবনাথবাবু? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা অজীবন দুঃখ সহিব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই সে স্বেচ্ছায় হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেন না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মিস্ত্রক হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হ'লে কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেরে দিলে—এর দোধ হয় বাপ-মা নেই!

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝির বিধবা মেয়ে।

বাড়ির ঝির মেয়ে! চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানিনে। তাঁতি-টাঁতি হয়ে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষয়-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষয়-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্ত। এ বস্তুর বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের তায় ভারি হইয়া রহিল। কোতূহল ও উত্তেজনার বশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাছিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা হলে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহ-ই হ'লো ?

শিবনাথ ঘাড়া নাড়িয়া জবাব দিল, না—বিবাহ হ'লো শৈব-মতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশ দিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ ?

শিবনাথ সহাস্ত্রে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশবাবু! নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁক ছিল না, অথচ ফাঁকি যথেষ্টই ছিল। সেটা বার করার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিল না, শুধু সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল ! এ কি হইল !

মিনিট দুই-তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অদ্বন্দ্ব বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক এমনি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক, যাক, যাক—যাক এ-সব কথা শিবনাথ, তা হলে সেই পাথরের কারবারটা করচ ? না !

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর নাবালক ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হ'ল ? তাদের মা আছেন, না ? অবস্থা কেমন ? তেমন ভাল নয় বোধ হয় ?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা ! হঠাৎ মারা গেলেন, আমরা ভেবেছিলাম টাকা-কড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে ! অকৃত্রিম স্নেহ !

শিবনাথ ঘাড়া নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমার এতখানি সে-সময়ে তিনি করতে পেরেছিলেন। একটুখানি খামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে খাই হোক শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে একটা অংশের দায়ি করলে না কেন ? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিল না, কহিল, অংশ কিসের ? কারবার ত একলা আমার।

শেষ প্রশ্ন

প্রফেসারের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি-রকম শিবনাথবাবু ?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বই কি !

অক্ষয় বলিলেন, কখখনো না। আমরা সবাই জানি যোগীনবাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিষে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন ? কোন ডকুমেন্ট ছিল ? শুনেছিলেন ?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল নাকি ?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রী আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বেশ হয়েছে। তা হলে শেষ পর্যন্ত বিধবাদের দিতে কিছুই হ'ল না।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপ-টা খাসা রোঁপেচে হে! আর ছ-একটা আন ত ?

আশুবাবু অভিভূতের গ্রাস বনিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কই আপনারা ত কিছুই খাচ্ছেন না ?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চলে যাচ্ছেন ?

মনোরমা এ-কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; ঘুণায় তাহার সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।

৩

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহকাল গত হইয়াছে। দিন-দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া

শরৎ সাহিত্য-সংগ্রহ

মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, কিন্তু বেশ কাঁটে নাই। বে কোন সময়েই পুনরায় সুরু হইয়া বাইতে পারে, এমনি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটারকমের একটা দ্বালাপোষ গায়ে দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে একগানা বই। মেয়ে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাওনি, আজ যে আমাদের এতদারী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল না, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—

তা হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি। কাল না হয় বাওয়া বাবে, কি বল বাবা ?

পিতা বাবা দিয়া বলিলেন, না-না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে। তুই না হয় একটু ঘুরে আয় গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিক পত্রটার চোধ বুলিবে নিই। গল্পটা লাগচে ভাল।

আচ্ছা চললুম। কিন্তু ফিরতে আমার দেয়ি হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনব তা বলে যাচ্ছি, বলিয়াই সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ি ফিরিয়া পিতার ঘরে চুকিতে চুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা ? শেষ হ'ল ? কে লিখেচে ?

কিন্তু কথা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন ?

মনোরমা উত্তর দিল না, শুধু নমস্কারের পরিবর্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ গিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শিবনাথকে কহিল, গড়া শেষ হসে গেল বাবা ? কেমন লাগল ?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কত্য়া কহিল, তা হলে আমি নিয়ে বাই, পড়ে এখুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড়-ছাড়া, হাত-দুখ খোয়া পাড়িয়া রহিল, কাগজ-খানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন্ গল্প, কে লিখিয়াছে কিংবা কেমন লিখিয়াছে।

এইভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার হিরতা নাই; এইসময়ে চাকরটাকে সম্মুখ দিয়া বাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে ?

শেষ প্রশ্ন

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন গেল ?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশি নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মূলধারায় বারি-পতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জান এ-সব আমি ভালদাঙ্গিনে। এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি-সব মা ?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক দু'হাতে পেরেচ কি আনি বলচি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথবাবুর মত একজন দুর্বৃত্ত দুশ্চারিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্ন দিচ্চ ?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে ঘেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপীকৃত করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সমস্যাভাববশতঃ এখনো তাহাদের মধ্যস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেইদিকে চক্ষু নির্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সংবাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত ঘেন মিশিয়া গেল। শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলান না, আশুবাবু। এখন তা হলে চললাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে ?

শিবনাথ কহিল, তা হোক। ও বেশি নয়। এই বলিয়া সে বাইবার জন্ত উদ্ভত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সেজন্য আপনি লজ্জিত হবেন না। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে বলেননি। অত নির্দয় আপনি কিছুতে নন।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার অণ্ড নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি যেন একটা মতলব নিয়ে এ-বাড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি। সকল মানুষের জায়-অজায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়—এও আর একটা কথা। কিন্তু যাই হোক, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিল না, আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশি দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধুলো দেবেন, আমি খুশিই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেল। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেন না। আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল; এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরি করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, না, আমার জন্ম নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্য-বশতঃ আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চোকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি, ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী মেয়েদের মত কাপড়-পরা—ও-বেচারি বোধ হয় যেন আরও ভিজচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যত্ন, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে-বাবুটি এইমাত্র গেলেন তিনিই কি না? কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল, মেয়েটি শিবনাথের স্ত্রী নহে ত?

শেষ প্রশ্ন

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথবাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতুম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা বটে মণি, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ঠিক সেই স্ত্রী। সাহস করে এ-বাড়িতে আনতে পারেননি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল, এ-বাড়িতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যত্ন ঠিকের দু'জনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞেস করেন, কে ডাকচে, আমার নাম ক'রো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি, কাজটা হয়ত ঠিক হ'ল না।

কেন বাবা ?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক—তার কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। বি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা-কয়েকের জন্ত আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু করব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিল না। বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্ছি।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা ?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চিনে। তোমার ধারা সম-শ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জান। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দোষ, কিন্তু এ হ'ল—কি জান মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অমুরাগী—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মনোরমা বুকিল এ তাহারই প্রতি অনুরোধ, কহিল, আচ্ছা, বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ না? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্ছে, শিবনাথ যেন না আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আসচেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন—বেশ যা হোক শিবনাথবাবু, ভিজ্ঞে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল, তা আমার চেয়ে ইনিই ভিজ্ঞেচেন ঢের বেশি। এই বলিয়া সজ্জের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইঁহারাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামাকাপড় ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জলধারা গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—পিতা ও কন্যা এই নবাগত রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্বকালের কবির শিশির-ধোয়া পদ্যের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয়ত আর নাই। সেদিন অন্ধের নানাবিধ প্রণের উত্তরে শিবনাথ উত্থিত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্ত বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্ত, কথা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কোন কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত নাই হোক, পতি-পত্নী সম্বন্ধের পবিত্রতা ইহাদের মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নম্বর জগতের তেমনি নম্বর এই দুটি নরনারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! আর পরমাশ্চর্য্য এই, যেদেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যেদেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইঁহারা পরস্পরের সংবাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্ত্তকালের অধিক সময় লাগিল না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজ্ঞে কাপড়-জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যত্ন, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

শেষ প্রশ্ন

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সমবয়সী এবং সিন্ধু-বন্ধ পরিবর্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। রূপ ইহার যত বড়ই হোক, শিক্ষাসংস্কারহীন নীচ-জাতীয়া এই দাসী-কন্ঠাটিকে এস বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ বাধ করিল, আশুন বলিয়া সম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেমনি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্তার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়া দিতে হবে।

দিচ্চি। বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদ-মস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফর্সা ধোপার বাড়ির কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে-ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাথা-সাবান গায়ে মাখিনে ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে। কিন্তু শুনচেন, দিদিমণির স্নানের ঘর! তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারিনে, আমার ভারি ঘেমা করে। তা ছাড়া যার-তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নির্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝক ঝক করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখব? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাৎ মুখ্য। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুণ, সাবান-টাবান মেখে আগে তৈরী হয়ে নাও, তার পরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নেব। দিদিমণি, কে ইনি ?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্তদিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত সে এই অপরিচিত অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের পরে কোতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

৪

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কণ্ঠাই নয় ; তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য পালনীয় বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গত ঠেকিবে, কিন্তু ইহাদের ঠেকিত না। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসিতেন তাহার সীমা ছিল না ; স্ত্রী-বিয়োগের পর আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাই দিতেও পারেন নাই হয়ত তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি। অথচ বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে তিন মন ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্কনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন সে ত জানি, সে-ই আশু বস্তির যথেষ্ট।

মনোরমা এ-কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ-কথা আমার সঙ্গ না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত-কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে ?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বারো বছরের মেয়ে, জানিস্ ত সব। কান্দি গলায় যে কিসের মালা পরার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার হু'চক্কু ছল্ ছল্ করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্কাপেক্ষা হৃদয়তা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত

শেষ প্রশ্ন

প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সে দ্বিতীয় দ্বার-পরিগ্রহ করে নাই এবং পত্নী-প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ গৃহের সর্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি করে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষ দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি, মণির মাযের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ-ধরনের কি তারা জানে? জানে না। এই না অবিনাশবাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলছি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাষ্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে, বয়সও হয়েছে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুশি হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমিও সকলকে বলে বেড়িয়েছি, দেহের ওজন সাড়ে তিন মন, বাতে পঙ্গু, কখন চলতে চলতে হার্ট ফেল করে তার ঠিকানা নেই, মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেচে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ— মরেচে অবিনাশ, মরেচে আশু বক্তি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! এই বলিয়া স্নুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি শাশি পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিলেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাটির সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্ত্রে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেকে!

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এস, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দুটোর জায়গায় দুশোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়া হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বাতের জন্ম যেদিন এটুকুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেন না সেদিন অবিনাশকে ঘাইতে হইত। গাড়ি পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হোক, আশু বস্তির নির্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার যো ছিল না। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সৰ্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ—এ-সকল কি কিছুই নয়? তবে কিসের জন্ম এত সম্পদ তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার জন্ম? মাতাল হইয়াছে? তা কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল এমন ত কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ তিনি নিজেও ত করিয়াছেন, তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের ক্রটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই বলিয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেন না, অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোকে এ-কাজ করলে কি করে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত ভিতরে কি একটা রহস্য আছে—হয়ত—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বলতে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী বে নির্দোষ এ-কথা ত নিজের মুখেই স্বীকার করেছে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা করেছে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাতাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

• আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনিই নিজে এ দুর্কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিগ্রী দিলে কি করে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

শেষ প্রশ্ন

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েচে আমাকে বলতে পারেন ?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে-কথা ঠিক নয়, সে-কথা ঠিক নয়, তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জান অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেন না।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগাইত না।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশি! মুখে সে বিশেষ কিছুই বলিত না, কিন্তু পিতা কণ্ঠকেই ভয় করিতেন সর্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ-বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার দিন-দুই পর্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। কিন্তু আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন রূপ কখনো দেখিনি। মনে হ'ল এদের দু'জনকে ভগবান কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েচেন।

বলেন কি ?

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেন না, তা বলে রাখলাম অবিনাশবাবু।

অবিনাশ সহাস্ত্রে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা শুরু করেন তখন আর মাত্রা থাকে না।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ-ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেন না এ'র সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে ডানদিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্বের পরিহাসের ভঙ্গিও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তা হলে অকারণ দস্ত করেনি বলুন ? পরিচয় হ'ল কি করে ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে আনতে সাহস করেননি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বক্র হলে মানুষের কোশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হ'লও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড়-বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুশি হতে পারেনি। ওরই সমবয়সই, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে, শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন, মেয়েটি যথার্থ-ই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কণ্ঠ। অন্তত: সে যে আমাদের ভদ্র-সমাজের নয়, তাতে তার সন্দেহ নাই।

অবিনাশ কোতূহলী হইয়া উঠিলেন, কি করে বোঝা গেল ?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজ্জে কাপড়ের পরিবর্তে একখানি ফর্সা কাপড় চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কারও বাবহার-করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুকিতে পারিলেন না ইহার মধ্যে ভদ্র-সমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গির মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া, মেয়েদের চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্য্যন্ত বুকতে নাকি বাকি ছিল না যে, মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নীচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয় এরও হয়েচে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কিভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে না-কি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজ্জে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে, জায়গাটা ভাল লাগচে কি না—প্রশ্ন করবার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুকি ছিলেন না।

না। তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বললাম, মণি, তাঁদের বিদায় দিতেও একবার এলে না? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি,

শেষ প্রশ্ন

কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারব না, আসুন বলে বিদায় দিতেও পারব না। নিজের বাড়িতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি!

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না, শুধু মূহূর্থে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু। কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেছেন। এই-সব স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ-পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে জানে সবই, তার ভয় ছিল পাছে কোন বিলী কদর্য্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন না, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট একটু নিখাস ফেলিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া শুইলেন।

কয়েকমূহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন?

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন না, তেমনি অর্দ্ধশায়িতভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন একটা ব্যথার মত লেগেচে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত এমন ছটফট করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির— শুধু রূপই নয়।

অবিনাশ সহাস্ত্রে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখিনি, কথাও শুনিনি আশুবাবু!

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে স্বেচ্ছা বদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান না? আমি যে কেউ আছি এ-কথা না-ই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবি করিনে।

অবিনাশ কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন, এ ত খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু? শুনলে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্র-সমাজে চালিয়ে দিতে চায়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ তার কথা শুনে মনে হ'ল সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে! কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয়ই গোপন করেছে। এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সত্যিই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন, মেয়েটি তাঁর স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়। কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু এদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই, সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়। অবিনাশবাবু, আপনি ত অক্ষয় নন, এ ত আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনে।

অবিনাশ লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে। তার কল্যাণের জন্ত ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁর শেষ হইতে পাইল না, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবে না?

না মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবেন না মনোরমা?

নিশ্চয় পারব, চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে এবং বোধ হয় এক সপ্তাহের পূর্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

৫

দিন-দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর-দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা—বৈকালে নিশ্চয় আসবেন।—আশু বস্তি।

জগতের বিধবা মাসি দ্বারের পর্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের শ্রায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বস্তির কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল না কি—আসতে না আসতেই জরুরি তলব পাঠিয়েচে, যেতে হবে ?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যোমশাইকে গিলে খেতে চায় না কি ?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোটগিন্নি, কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোটগিন্নি, অমৃত ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখলে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বই কি !

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বে না।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবে না মুখুয্যোমশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখবো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দার আড়ালে অস্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহ-স্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধাৰ্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত—ইতিমধ্যে অধীনের দশ দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একেবারে দশ দশটা দশা ? প্রথমটা বলুন ?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দুটো শুধু তাজা হয়েছে তাই নয়, অতি ক্রতবেগে নীচে হতে উপর এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন সুরু করেছে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে, আজ কি একটা পরোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা-কূলে সমবেত হয়েছেন এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্দিকার-চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

ভাল কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু বঞ্জি অতি উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করেছেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ মহাশয়ে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটা গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশু উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েচে, বাবাজী স্বয়ং মেরামত-কার্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্তপ্রায় এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসিমুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটি কে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বলতে গিয়ে হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বলতে অন্ততঃ আপনাকে বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ণ বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন; আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম হিন্দুমতেই হয়। যথাসময়ে, অর্থাৎ বছর-চারেক পূর্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হ'তও তাই, কিন্তু হ'ল না। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে, সেও এক বিচিত্র ব্যাপার—বিধিলিপি বললেও অত্যাঙ্গি হয় না। কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়ে-হলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়িতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বাড়ির কর্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়িমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অথগু বিশ্বাস, এসে বললেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারে না। তিনি নিজে এবং অশ্রান্ত পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে, এখন বিবাহ হলে তিন বৎসর তিন মাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

শেষ প্রশ্ন

একটা হলুদুল পড়ে গেল, সমস্ত উত্তোগ-আয়োজন লগুত্তু হবার উপক্রম হ'ল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিনতাম, বললাম এর আর নড়-চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড়লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না, তিনি ভয়ানক রাগ কুরলেন; অজিত দুঃখে অভিমানে ইন্জিনিয়ারিং পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পবে ?

আগুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হলাম, হ'ল না শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বললে, বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেচে যার জন্ত তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে ? তিন বছর এমনিই কি বেশি সময় ?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে ত জানি। বললাম, মা তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বললে, তোমার ভয় নেই বাবা, আমি ঠাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচল বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোনদিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জানতো এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণী জীবন গ্রহণ করলে একটা দিনের জন্তও তা থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার যো নেই অবিনাশবাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত-চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার যো নেই। কিন্তু আমি আশীর্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আগুবাবু কন্ঠার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিফল হবে না। অজিত সর্কাগ্রেই খুড়োমশায়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েচেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতো না।

অতঃপর উভয়েই ক্রমকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আগুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেল, বছর-দুই পর্যন্ত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করিনি তা নয়। কিন্তু মণি জানতে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বললে, বাবা, এ চেষ্টা তুমি ক'রো না। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান করনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বললাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা। কিন্তু মেয়ের ছ'চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বললে, হয় না বাবা। শুধু কথা-বার্তাই হয়, কিন্তু তার বেশি—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেচেন তাই যেন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সহিতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি ক'রো না। দু'জনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, মুছে ফেলে বললাম, অপরাধ করেচি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ পূর্ন-স্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি এবং কত অন্তায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বৃষ্টিতে পারিলেন না, কহিলেন, কিসের ?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি, মেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে মেমসাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তার হৃদয়ে স্থান পায় না। কত বড় ভ্রম বসুন ত ?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্বন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে।—এই যে অজিত ! মণি কই ?

বছর ত্রিশ বয়সের একটি স্ত্রী বলিষ্ঠ যুবা বরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়-জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য করছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেচে, তাই বদলে ফেলতে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সামনে আনতে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, মণির আসতে মিনিট-পাঁচেকের বেশী লাগবে না। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেৱী হলে সব দেখবার সময় পাওয়া যাবে না। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটে না।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ তোমারই দেৱি, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকি।

ছেলেটি নিজের পোষাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদলাতে হবে না, এতেই চলে যাবে।

এই কালি-স্মৃতি ?

শেষ প্রশ্ন

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত খ্রীত হইলেন এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতার মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটয়াছে। বিশেষতঃ তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে-সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্করচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়! নিতান্তই সাধা-সিধা পোষাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, স্নগভীর প্রশমতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল, পিতৃ-স্নেহবশে হয় তিনি নিজের কণ্ঠকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গেছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটর-যানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্য-লুক্ক নারী ও রূপ-লুক্ক পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্বত্রই তাহাদের সাজ-সজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অন্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্ব-খ্যাত, অনন্ত সৌন্দর্যময় তাজের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে আসিতেছে।

যমুনা-কূলে যাহা-কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দলবল ইতিপূর্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সংবর্দ্ধনা করিলেন। বাত-ব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতিগুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিস্তৃত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচা গেল। এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ কর গে-বাবা, আশু বঞ্জি এইখান থেকেই বেগমসাহেবাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন। এর অধিক আর তাকে দিয়ে হবে না।

মনোরমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, সে হবে না বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারব না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আগুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন ?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ কহিল, তা যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্তায় হয়েছে এ-কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হ'তো না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন ; মনোরমা বলিল, সে হবে না বাবা, তোমাকে সঙ্গে বেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেল, এর অর্ধেক সৌন্দর্য ঢাকা পড়েই থাকবে। যিনি ষত খবর দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশি জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভাণ করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল, আগুবাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে !

আগুবাবু উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন এলেন শিবনাথ-বাবু ? এদিকে আসুন।

সঙ্গীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আগুবাবু তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না আগুবাবু।

আগুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়। কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীর পরিচিত। ব'সো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না।

আগুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বই কি। উনি আমার—উনি আমার পঞ্চমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিন-কয়েক হ'ল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখতে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখলে ?

শেষ প্রশ্ন

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আণ্ডাবাবু বলিলেন, তা হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেন-না এই পরম বিশ্বয়ের জিনিসটি সে কখনো দেখেনি, এইবার দেখবে। কিন্তু আলো কমে আসচে, আর ত দেরি করলে চলবে না অজিত।

মনোরমা বলিল, দেরি ত শুধু তোমার জন্মই বাবা! ওঠো।

ওঠা ত সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্ম যে আয়োজন করতে হয়।

তা হলে সেই আয়োজন কর বাবা!

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি-রকম মনে হ'ল?

কমল কহিল, বিশ্বয়ের বস্তু বলেই মনে হ'ল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি, পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইল না। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, ওঠো এইবার।

উঠি মা। বলিয়া আণ্ডাবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উত্তম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, গুর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ-প্রস্তাবে জবাবও দিল না, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা, সে হবে না। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিশ্বয় এই অপরিচিত রমণীর সর্কাজ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্শ্বরের অব্যক্ত বিশ্বয় যেন একমুহূর্ত্তেই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

অবিনাশের চমক ভাঙিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবে না। মনোরমার বিশ্বাস, গুর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্ধেক সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি করা যাবে না।

কমল সরল চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আণ্ডাবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক? এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলো ত ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্টার মত নয়!

আণ্ডাবাবু পুলকিত হইয়া কহিলেন, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই— সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিওনে

শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ

কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিমিত ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখান। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই ঘর্ষের কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজকণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশি হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না।

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিংবা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন; তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্য্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ মানুষ বধ করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো। এ একনিষ্ঠ প্রেমের দাম নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দ-লোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করুন না, মানুষের অন্তরে সে-শ্রদ্ধার আসন আর থাকে না।

কমল বলিল, যদি না থাকে ত সে মানুষের মুক্তা। নির্ণায়ক মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেছি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল অনড় জড়ধর্ম্ম সূক্ষ্মও নয়, সুন্দরও নয়।

শুনিয়া মনোরমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসী-কণ্ঠা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, অহুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের পক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

শেষ প্রহ্ন

আণ্ডবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি মা !

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সহিতে পারে না। আপনি সত্যই বলেছেন, আমার কাছে এ-বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনের প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে—এ মরেচে। এই বলিয়া সে মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আণ্ডন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি ?

অজিতের চমক ভাঙিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসি গে।

আণ্ডবাবু খুশি হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি, কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

৬

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ ভাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয়, রব তিনি ইতিপূর্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আণ্ডবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া উর্ধ্বভাগ দুই হাতের উপর স্তম্ভ করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া ধরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ খাড়াটা

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একটু নাড়িয়া, কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসৎ পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ, ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেমনিই ক্লান্ত ও মলিন; সে যেন কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গেছে।

আগুবাবু শুধু বলিলেন, ব'সো। কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিংবা বসিল কি না সে দেখিবার সময় পাইলেন না।

অবিনাশ বোধ করি অক্ষয়ের যুক্তিমালার ছিন্ন স্মৃতিটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন; বলিলেন, সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ স্মৃতির মার্কেলের মত সাদা, জলের ত্রায় তরল, সূর্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা—এই যেমন আমাদের আগুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিল না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ক্রটি ছিল না—জানি ত সব, কিন্তু একথা উনি ভাবতে পারলেন না তাঁর মৃত জীর জায়গায় আর কাউকে এনে বসান যায় কিরূপে! এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদু-স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন, এখন এ আলোচনা থাক।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিল, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চূপ করিল। তাহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিল না—সেই উদাস অন্তমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিল না, জানিবার চেষ্টাও করিল না।

কমল কহিল, ও—এমনিই। তোমার বাড়ি যাবার তাড়া পড়েচে বুঝি? কিন্তু বাড়িটি ত সন্দেশেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আগুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্তর্দিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য্য সুন্দর মুখে উপরে একটি রেখারও পরিবর্তন হইল না—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া, যেন দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

অবিনাশের দেরি সন্দিগ্ধে ছিল না, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে! তাঁর অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে

শেষ প্রণয়

হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেন না, কহিলেন, এ-ক্ষেত্রে অপরাধ হবে না। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি বল।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ঠাঁকে আমি ভালবেসেছি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝতে পারছি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করেছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, বলিলেন, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ডা বোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশু বঞ্জি বড় নিরীহ মানুষ কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাঁওর করেচ, আরও দিন-দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল, এসব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এইজন্যই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এইজন্যই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বলতে বাধে যে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গিতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেন না, কিন্তু কি মানেন একটু শুনতে পাই কি?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে স্মৃতি করাও যায় না, ছুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন ক'রে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ক্রম জ্ঞানে জীবনযাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটার আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বৈধব্য-জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। কি, তুমি মানো না?

কমল বলিল, না। একটি বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরঞ্চ বলুন এইভাবে এদেশের বৈধব্য-জীবন কাটানই বিধি, বলুন একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠাঁকিয়ে আসচে—আমি অস্বীকার করব না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্যের মধ্যে—না থাক, ব্রহ্মচর্যের কথা আর তুলব না, কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবন-যাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্যাদাটাও দেব না ?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ । 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে মর্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি ক্ষীত হয়ে উঠেচে যে, তার আর স্থান কাল কারণ অকারণ নেই । বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে । কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশি নয় এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয়, আমার হয় না । আমি সে দলের নই । অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে । স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে ।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি ?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করেন না ?

কমল জবাবও দিল না, রাগও করিল না, শুধু হাসিল ।

আর একটি লোক রাগ করিলেন না, তিনি আশুবাবু । অথচ কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশি ।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ-সব কদম্ব্য ধারণা আমাদের ভদ্র-সমাজের নয় । সেখানে এ অচল ।

কমল তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্র-সমাজে অচল হয়েই ত আছে । এ আমি জানি ।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন । আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞেসা করি কমল, পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্ত বলচিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু ভাবে না—এই যেমন আমি । মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারিলাম ।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু ।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েচি মনি, কিন্তু সেদিন ত বুড়ো ছিলাম না । কিন্তু তখনো ত এ-কথা ভাবতে পারিনি ?

শেষ প্রশ্ন

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। সেই বুড়ো শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো মন খুশি হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ! হাদ্জামা নেই, মাতামাতি নেই—এই ত শাস্তি, এই ত মাহুশের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের কত ভাল ভাল বিশেষণ, কত বাহবার ঘট। দুই কান পূর্ণ করে তার খ্যাতির বাণ্ড বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাণ্ড নয়, আনন্দলোকের বিসর্জনের বাজনা এ-কথা সে জানতেও পারে না।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়া প্রয়োজন—মেয়েমাহুশের মুখ দিয়া উন্মাদযৌবনের এই নির্লজ্জ স্তব-গানে সকলের কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন আশুবাবু মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে এ সত্যিই কি না।

কমল কহিল মনের বার্কক্য আমি তাকেই বলি আশুবাবু, যে মন স্তম্ভের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন জরা-গ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবি নেই—বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকি দিন-কটা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু, নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে।

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময়মত একবার দেখব বই কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিম্পলক চক্রে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আমার একটা প্রশ্ন—দেখুন মিসেস—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস কিসের জন্ত? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না?

অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল—না না, সে কি, সে কেমনধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমনধারা নয়। বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন আমাকে ডাকবার জন্তেই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা, তাই বলে যদি আমি ডাকি আপনি রাগ করেন নাকি?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায়, বছর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ-কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না রাজারা তাঁদের নামের আগে পিছে কতকগুলো নিরর্থক বাক্য নিয়ে, কতকগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়? নইলে তাঁদের মর্যাদা নষ্ট নয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিলেন, যেমন ইনি। কখনো কমল বলতে পারেন না, বলেন, শিবানী। অজিতবাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাটাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ আমি ত বুঝবই।

কিন্তু কি যে হইল, এমন স্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিল না, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অস্ত্রাণের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ ভ্রোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেইদিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা হিম পড়তে শুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েচেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েচেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, উপরের—উনি। এই বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আত্মিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করবার জন্য যেন আহাৰ-নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন?

অক্ষয় বলিল, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই তাই জিজ্ঞেসা করি, শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যি বিবাহ হয়েছিল?

আশুবাবু মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু?

শেষ প্রণয়

অবিনাশ বলিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে ?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট !

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুদজ্জা নেই ।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই । কিন্তু আমাদের ত আছে । কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল । যেন কত তামাসার কথাই না ইহার মধ্যে আছে । কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু ? আমি বলচি অক্ষয়বাবু । একেবারে কিছুই হয়নি তা নয় । বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল । যারা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহই নয়—ফাঁকি । ঠুকে জিজ্ঞেসা করতে বললেন, বিবাহ হ'ল শৈব মতে । আমি বললাম, সেই ভাল । শিবের সঙ্গে যদি শৈব মতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে !

অবিনাশ গুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কি না, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল ।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম কোনদিন ?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিল না, তেমনি উদার গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিল । তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট ! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে ? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না কি ?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই । কিন্তু সে হবে না । আমি আত্মহত্যা করতে যাব এ-কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেন না ।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল ।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গিতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্তায় । শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ঠুকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে ? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অহুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ঠুকে রাখব বেঁধে ? আমি ? আমি করব এই কাজ ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল ।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানি, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অহুষ্ঠানও মিথ্যে নয় ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ
যখন যায় ?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারি হিম পড়বে, এখন না
উঠলেই যে নয়।

এই যে মা উঠি !

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানি, আর দেরি ক'রো না, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল ; সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের
সঙ্গে পরিচয় হ'ল যেন কেবল তর্ক করার জন্তই। কিছু মনে করবেন না।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে শিবানি,
শিখলে না কিছুই।

কমল বিস্ময়ে.. কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে
পড়চে না ত।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইল। পার যদি
আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর
শেখবার কিছু নেই।

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বলচ কি আজ ?

শিবনাথ জবাব দিল না, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চল।

আশুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য্য !

৭

* আশ্চর্য্যই বটে। এ-ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি ? বস্তুতঃ
উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া—
পর্দার ও-পিঠে না জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচর রছিল। সকলের মনের
মধ্যে এই একটা কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল এবং সকলেরই মনে হইল, যেন

শেষ প্রশ্ন

এইজন্যই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন-জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের খেত-মর্নার মায়াপুরীর ছায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠলে তোমার সতিই অসুখ করবে বাবা।

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়চে, উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া, কিন্তু অক্ষয়-হরেরের টাঙ্গা-ওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশি ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব কোনমতে ঠেসাঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই চুপ করিয়াছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ; কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন দাসীর মেয়ে হতে পারে না। অসম্ভব! এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ ত গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশবাবু।

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাবচি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝতে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায় না।

হরের বলিয়া উঠিল, বাপু রে! আপনাকে ঠকানো! একেবারে monopolyতে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রুর কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্র-ধরের culture সিকি পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ-সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায় না অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দু-ই এক অবিনাশবাবু। দেখলেন না, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাসার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বললে, এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বললেন, তাই নাকি? Absolute indifference আপনারা কি নোটিশ করেননি? এ কি কখনও ভদ্র-কন্টার সাজে, না সম্ভবপর?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় তাঁহার ধ্যান ভাঙিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর formটার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। স্মরণীয় যা হোক কিছু একটা হলেই ওর হ'লো। স্বামীকে বললে, ওরা যে বলে বিয়েটা হ'লো ফাঁকি। স্বামী বললেন, বিবাহ হ'লো আমাদের শৈব মতে। কমল তাই শুনে খুশি হয়ে বললে, শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে, আমার শৈব মতে ত সেই ভাল। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু!

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরে বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করা—হাঁ গা, করবে না কি তুমি এইরকম? দেবে না কি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তার পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজচে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া একটু মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিলেন না, বলিলেন, আপনারা অবাক করলেন অবিনাশবাবু। তাদের যা-কিছু সমস্তই মিষ্টি মধুর। এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা 'নী' যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো?

হরেন্দ্র কহিল, শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয় না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাকলেই কি মধু ঝরবে?

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়া কহিলেন, হরেনবাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ-সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি, আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাঁহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাঁহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে, সহস্র খোঁচাখুঁচিতেও মুখ দিয়া তাঁহার কথা বাহির করা যায় না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকী পৃথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িল। সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য্য পরিহাস করিয়াছে এবং শিবনাথের শৈব-মতে বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্য ও ব্যবহারে যে আভিজাত্যের বাস্পও নাই, বরঞ্চ শিক্ষা ও

শেষ প্রশ্ন

সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক, ইহাই অত্যন্ত রক্ততার সহিত বারংবার প্রতিপন্ন করিতে করিতে গাড়ী আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্তান্ত সকলে নামিয়া গেল, হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পৌছাইয়া দিতে গাড়ী চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ীর মধ্যে এরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ঠুঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আন্তে আন্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিত না। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মনি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্বের ধারণা কি আজ বদলায়নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা?

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি জনিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিন্তা অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর তেমনি নিফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধ হয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতি-ধ্বনিমাত্রই হ'তো ত একথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হ'তো না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেচে, কেবল এরই জন্ত আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল—তার সেইদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু সমস্ত ছলাকলা সমস্ত বিক্রমই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিনতে পেরে থাকে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—কি যে তোরা সব বলিস্ মা ?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই আশুবাবু। যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এখানেই মস্ত মতভেদ আছে।

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে ত শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখেচো সে তুমিই জান বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায় !

আশুবাবু কণ্ঠার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা ? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব ত তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি।

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ পেলেই তার মিথ্যাচার হ'তো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য মনে করে বিশ্বয়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্নে ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেচে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে আমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই ত ঠিক, এতে ব্যথা পাবার ত কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্যাণ্ড অজিত অন্তমনস্কের স্থায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিত না, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপসা—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইল না, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন ?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হ'ল না। যাই হোক, তার কাছে নেই।

তা'হলে আত্ম-সংযমেরও দাম নেই ?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন সে শুধু নিফল আত্ম-পীড়ন। আর তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকান নয়, পৃথিবীকে ঠকান। তার মুখ থেকে শুনে মনে হ'লো কমল এই কথাটাই কেবল বলতে চায়। এই বলিয়া

শেষ প্রশ্ন

তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুনে ভাবি বিশ্বয় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল, বিশ্বয় লাগে! সর্কশরীরে জ্বালা ধরে না? বাবা, কখনো কোনো কথাই কি তুমি জোর করে বলতে পারবে না? যে যা বলবে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ ত দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকে না, অন্য পক্ষও ঠকে। যে-সব কথা তার মুখে আমরা শুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলেনি। সে যা বললে তার মোট কথাটা বোধ হয় এই যে, স্মর্দীর্ঘ সংসারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে সত্য বলে পেয়েছি, সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুজে মাথা নাড়ালেই হবে কেন মগি?

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটা দেখবার লোক ছিল না?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভাল করে জান যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোনো দেশেই মানুষের পূর্বাগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হলে সৃষ্টি থেমে যেতো। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধ করি কিছুই বুঝতে পারচো না, না?

অজিত ঘাড় নাড়িল। আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোম-কুণ্ডের আগুন জ্বলে দিলেন, লোকে চেয়ে দেখবে কি, ধূঁয়ার জ্বালায় চোখ তুলতেই পারলে না। অথচ মজা এই যে, আমাদের মামলা হ'লো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তার চাকরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈব-মতে—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়া জানলেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞেস করা হ'লো, মেয়েটি কি ভদ্র-ঘরের? শিবনাথ বললেন, সে তাঁদের বাড়ির দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হ'লো, মেয়েটি কি শিক্ষিতা? শিবনাথ জবাব দিলেন, শিক্ষার জন্য বিবাহ করেননি, করেচেন রূপের জন্য। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনি, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তার পরেই সবচেয়ে বেশি। আর এই হ'লো সমাজের সূবিচার

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা ?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা ? সমাজের অক্ষয়-বাবুও ত
আছেন, তাঁরাই ত প্রবল পক্ষ ?

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আনতে বোধ হয় ?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেন না, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই
আসে মা ?

অজিত বলিল, আশ্চর্য্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বিরোধ,
অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশি ।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু । কমলের আমরা কিছুই
জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে । আর জানি তার অথগু মন্দ দিকটাকে ।
তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয় । ভাবি, এইবার গেল
বুঝি সব ।

আশুবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, ঠাঁর নিস্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের
ছায়াও পড়ে না, ভয়েরও দাগ লাগে না । মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর
অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবে না । দেবতার দলই আশুক, আর
দৈত্য-দানাতেই বিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্বিষকার চিত্ত, শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি
খুশি । কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইল না, আশুবাবু অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া
কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেন না অবিনাশবাবু আপনার পায়ে পড়ি ।
নিরবিচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেচি, সেখানে কি করেচি, না করেচি
নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না । একেবারে নাড়ী-
নক্ষত্র টেনে বার করে আনবে । তখন ?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেত গিয়েছিলেন নাকি ?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য্য হয়ে গেছে ।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে
ইয়োরোপে । বাবা ব্যারিষ্টার । বাবা ডক্টর ।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি ?

আশুবাবু তেমনিভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে
গেছি । দীর্ঘকাল যাবাবরবৃত্তি অবলম্বন করে মেয়ে নিয়ে এখানে সেখানে টোল ফেলে
বেড়াই, ঐ যা বললেন সমস্ত চিন্ততলটা একেবারে ধুয়ে-মুছে নিস্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে

শেষ প্রশ্ন

গেছে। ছাপা-ছোপ কোথাও কিছু বাকি নেই। সে যাই হোক, দয়া করে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয়বাবুর গোচর করবেন না।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারি ভয় ?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে গুর কোতূহল জাগ্রত হলে একেবারে মারা যাব।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অশ্রায়।

আশুবাবু বলিলেন, অশ্রায় হোক মা, আশ্রয়ক্রম সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল; মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয়বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে কর ?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোল-মেলে বস্তু মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে ত হবার নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেচে, মীমাংসা আর হ'ল না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনও স্পষ্ট করে কিছু বল না। এ তোমার বড় অশ্রায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট করে বলবার মত বিশ্লেষণ-বুদ্ধি তোমার বাপের নেই মণি, সে তোমার কপাল। এখন খামোকা আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন বল ত।

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেচে, বাইরে বাইরে খানিক ঘুরে আসি গে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে ? এই অন্ধকারে ?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি নিষ্ক জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেড়িয়ে না।

না, গাড়ীতেই যাবো।

গাড়ীর চাকনাটা তুলে দিও অজিত, যেন হিম লাগে না।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা হলে অবিনাশবাবুকেও এমনি পৌছে দিয়ে যোগো। কিন্তু ফিরতে যেন দেরি না হয়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখি এখনো যায়নি। এ ঠাণ্ডায় চললো বেড়াতে।

৮

দিন-পনেরো পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা সহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে তাহারই একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ী থামাইয়া দেখিল শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙা-চোরা পুরাতনকালের একটা দ্বিতল বাড়ি, সম্মুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান, তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিলে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন আপনি এমনি একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলুম, কিন্তু শুনতে পেলেন না। পাবেন কি করে? বাপ্ রে বাপ্! যে জোরে যান, দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভয় করে না?

অজিত গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে? শিবনাথবাবু কই?

কমল কহিল, তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েছেন কেন? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভাল ছিল না। তাই তাঁরা কেউ বার হননি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাকতে পারিনি।

কমল কহিল, আমিও না। কিন্তু পারিনি বললেই ত হয় না—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নেবেন আমাকে সঙ্গে করে? একটুখানি ঘুরে আসবো।

শেষ প্রশ্ন

অজিত মুস্থিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্য্যন্ত ছিল না, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্বে শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই ?

কুমল কহিল, শোন কথা ! সঙ্গী-সাথী পাব কোথায় ? দেখুন না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। সহরের বাইরে বললেই হয়—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধ করি একটা চামড়ার কারখানা আছে—আমার প্রতিবেশী শুধু মুচিরা। কারখানায় যাব আসে, মদ খায়, সারা রাত হলা করে—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই ?

কমল বলিল, বোধ হয় না। আর থাকলেই বা কি—আমাকে তারা বাড়িতে যেতে দেবে কেন ? তা হলে ত মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়, তখন আপনাদের ওখানে যেতে পারতুম। বলিতে বলিতে সে গাড়িতে খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল, কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়িনি। কিন্তু আজ আমাকে অনেকদূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আনতে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইল না, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশি দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ি ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, নাঃ—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা হলে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুন না ?

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বসলে গল্প করব কি করে ? অতদূরে পিছনে বসে মুখ বুজে যাওয়া যায় ? আপনি উঠুন, আর দেরী করবেন না।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জন, কদাচিৎ এক-আধজনদের দেখা পাওয়া যায়—এইমাত্র। গাড়ীর দ্রুতবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল। কমল কহিল, আপনি জোরে চালাতেই ভালবাসেন, না ?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করে না ?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগচে। বোধ হয় স্বভাব, না ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অজিত কহিল, তা হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও, না ?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন ?

কমল কহিল, পড়লেই বা অজিতবাবু। দ্রুতবেগের ভারি একটা আনন্দ আছে। গাড়ীরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি ! কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুশি, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না। ঠিক না অজিতবাবু ?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিল না, বলিল, এর মানে ?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্রমেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই, এমনি।

কথাটা সে যে বুঝাইয়া বলিতে চাহে না, এইটুকু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিল, এরই মধ্যে ? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেকদূরে এসে পড়েছি, ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হ'লই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিলম্ব হলে ভাল হবে না।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা সহরে ত গাড়ীর অভাব নেই, তাঁরা অনায়াসে যেতে পারেন। চলুন আরো একটু। এমনি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সশুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোকবিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ একসময়ে উদ্ভিগ্ন-চিত্তে গাড়ীর গতিরোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরে চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম মিথ্যার সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদ না মানুষ নষ্ট করে। আমাদের একলা নিয়ে যেতে

শেষ প্রণয়

আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘটত না।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে নিশ্চয় করে ত কিছুই বলা যায় না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে!

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে উল্লসাসে কত দূরেই না বেড়িয়ে এলাম! আজ আমার কি ভালই যে লাগচে তা আর বলতে পারিনে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই।—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিয়াছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মত হয়ত সত্যই ইহাতে কিছুই নাই, তবুও প্রথমটা সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ওই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধ হয় কেহই কিছু জানে না—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানি মিথ্যা, এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে, চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে, তাহার দেন না, যেন সমস্তটাই তাঁহাদের কাছে একেবারে নিছক অর্থহীন।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতেই কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভাল কথা, কি বলছিলেন ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে? পারে বই কি!

অজিত কহিল, তা হলে?

কমল বলিল, তা হলেও এ প্রমাণ হয় না, যে-আনন্দ আজ পেলাম তা পাইনি!

এবার অজিত হাসিল। বলিল, সে প্রমাণ হয় না, কিন্তু এ প্রমাণ হয় যে আপনি তর্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূট-তর্কিক তাই আমি?

অজিত কহিল, না, তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার ছুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক, তাকে সত্যকার আনন্দ-ভোগ বলা চলে না। এ ত আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না, আমি মানিনে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মনে নিতে পারি। ছুঃখের দাহ যেন আমার বিগত-স্বপ্নের শিশিরবিন্দু-গুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত অন্নই হোক, পরিণাম তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক, তবুও যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন না

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আর একদিনের নিরানন্দের কাছে সজ্জাবোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল শুরু থাকিয়া কহিল, এ-জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকারের পাওয়া। এই কি ঠিক নয় ?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের ছুই চক্ষু একান্ত আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিত কিছু একটা শুনিতে চায় ?

কৈ জবাব দিলেন না ?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না ?

না।

একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। তাহার পরে কমল ধীরে ধীরে বলিল, তার মানে স্পষ্ট বোধবার এখনো আপনার সময় আসেনি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত ?

অজিত কহিল, করব।

গাড়ী আসিয়া সেই ভাঙা ফুল-বাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাটার দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও একটু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্তায়। কাউকে জানিয়ে গেলেন না, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেছেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনার ভারে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি করে ? গাড়ীতে একটা হাত-স্বর্ণ আছে সেটা জেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো ?

কমল অত্যন্ত খুশি হইয়া কহিল, তা হলে ত বাঁচি অজিতবাবু। আস্থন আস্থন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অস্থনের কণ্ঠে কহিল, আর যা হকুম করুন পালন করব, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেন না। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল, মাহুষের সাড়া পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাড়িটি দ্বিতল। উপরে

শেষ প্রশ্ন

ছোট ছোট গুটি-দুই ঘর। অতিশয় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচে মিট মিট করিয়া একটি হারিকেন লণ্ঠন জলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচ-ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। অনেক রাত হ'লো ৷

কমল জিদ করিয়া কহিল, সে হবে না, আসুন।

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাবচেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে তাঁরি লজ্জার কথা হবে। কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বেশি এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নীচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারবো না।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্প মূল্যের আরাম-কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা-তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা—যেন সাধারণতঃ তাহাদের প্রয়োজন নাই এমনি একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব। ঘর শূণ্য—শিবনাথবাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল, কিন্তু মনে মনে ভারি একটা স্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, কই তিনি ত এখনো আসেননি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধ হয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চলচে!

কি করে জানলেন?

কাল-পরশু দু'দিন যাননি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে নিচ্ছেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, এ দু'দিন যাননি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন। সম্ভবতঃ আপনি ছেড়ে দেননি বলেই তিনি যেতে পারেননি। নইলে স্বেচ্ছায় গর-হাজির হয়েচেন এ ত তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না।

কমল কয়েকমুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজনা করতে! বাস্তবিক, মানুষকে জ্বরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্তায়, না?

অজিত বলিল, নিশ্চয়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

কমল কহিল, উনি ভাল লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে যদি কেউ ধরে রাখতো, থাকতেন ?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখবার ত কেউ নেই ?

কমল হাসিমুখে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ ত মুন্সিল। ধরে রাখবার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জানবার যো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেছি তা টেরও পাননি। থাক্ থাক্, সব কথায় তর্ক করেই বা হবে কি ? কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাই আমি ও-ঘর থেকে চা তৈরি করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ করে বসে থাকবো ? সে হবে না।

হবার দরকার কি ! এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ করে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো—কিন্তু সে ত আর একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু, তবুও আপনাকে বসতে দিলুম। অথচ কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান !

ইহার অর্থ যে কি ভাবিয়া পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুঃস্বপ্ন। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাঁকেই বা বসতে দেননি কেন ?

কমল কহিল, এই ত মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাঁদের নিজের হাতে, কিন্তু কোথায় বসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয় কেউ তার সন্ধান পায় না। আপনার চায়ে কি বেশি চিনি দেব ?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষে এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাইনে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি বুঝি তা হলে আসামে ?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও চায়ে আপনার রুচি নেই ?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্ত।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর ?

শেষ প্রশ্ন

কমল বলিল হ্যাঁ ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি? কিন্তু কই, আজকে রাঁধবার ত সময় পাননি?

কমল কহিল, না ।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল । কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞাসা করুন—তা হলে আপনি থাকেন কি? তার জবাবে আমি বলব, রাত্রে আমি খাইনে । সমস্তদিনে কেবল একটবার মাত্র খাই ।

কেবল একটবার মাত্র?

কমল কহিল, হ্যাঁ । কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হ'লো, তবে শিবনাথবাবু বাড়ি এসে থাকেন কি? তাঁর খাওয়া ত দেখেচি—সে ত আর এক-আধবারের ব্যাপার নয়? তবে? এর উত্তরে আমি বলব, তিনি ত আপনাদের বাড়িতেই খেয়ে আসেন, তাঁর ভাবনা কি? আপনি বলবেন, তা বটে, কিন্তু সে ত প্রত্যহ নয় । শুনে আমি ভাববো এ-কথার জবাব পরকে দিয়ে লাভ কি? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না । -তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হবে অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না । শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেচে ।

অজিত সত্যসত্যই এ-কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না । গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে? আপনি কি রাগ করে বলছেন?

কমল কহিল, না রাগ করে নয় । রাগ করবার বোধ হয় আজ আমার জোর নেই । আমি জানতুম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আশ্রা ছেড়ে আজও তিনি যাননি । চলুন ও-ঘরে গিয়ে বসি গে ।

এ-ঘরে আসিয়া কমল বলিল, এই আমাদের শোবার ঘর । তখনও এর বেশি একটা জিনিসও এখানে ছিল না—আজও তাই আছে । কিন্তু সেদিন এদের চেহারা দেখে থাকলে আজ আমাকে বলতেও হ'তো না যে আমি রাগ করিনি । কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু? আর ত দেরি করা চলে ন ।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হ্যাঁ, আজ তা হলে আমি যাই ।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল ।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি ।

হ্যাঁ, আসবেন । বলিয়া সে পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

অজিত বার-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাবু কতদিন হ'ল আসেননি ?

হ'ল অনেকদিন। বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লগ্নের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

৯

অজিত যখন বাড়ি ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ, কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয় ত দুইটা—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আগুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকর্ষার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত ; শোওয়ার কথা দূরে থাক, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবনা হয় না।

গেট খোলা ছিল। দরওয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ী আন্তাবলে রাখিয়া অজিত আগুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বলচি, কি একটা এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাটলো ত? শিক্কে হ'ল ত?

অজিত সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোলবার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত।

শেষ প্রশ্ন

দুঃখ কাল ক'রো। বড়ির পানে তাকিয়ে জ্বাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোও গে। কাল শুনবো সব কথা। যত্ন! যত্ন! সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজতে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্তায়। এত বড় সহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বললে অন্তায়। কিন্তু আমাদের যা হচ্ছিল তা আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে—মণিই বা গেলো কোথায়? তাকে ত তখন থেকে দেখচিনে।

অজিত কহিল, বোধ হয় গুয়েচেন।

শোবে কি হে? এখনো যে তার খাওয়া হয়নি। বলিয়াই তাহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখলে?

অজিত কহিল, কই না?

তবেই হয়েছে। বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়ীটা নিয়ে সেও দেখচি খুঁজতে বেরিয়েছে। জ্বাখো দিকি অন্তায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে। আজ রাতটা তা হলে জেগেই কাটলো।

আমি দেখচি গাড়ীটা আছে কি না। বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ী মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পাঠুকিয়া হুঁচুচুতে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নীচের বারান্দার উত্তর প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাঁউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেইদিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মাহুঘের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা কহিতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলার প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল উভয়ের কেহ জানিতেও পারিল না—তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রান্তালাপের কেহ সাক্ষী রহিল কি না।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ী-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আণ্ডবাবু নিশ্চিন্ত পৰিতৃপ্তির দীৰ্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হ'ল, সে বোধ হয় ক্লাস্ত হয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখি মেয়েটার খাওয়া হ'ল না। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

অজিত বলিল, এত রাতে আমি আর খাবো না, আপনি শুতে যান।

যাই। কিছু কিছুই খাবে না? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুতে যান। এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার ধবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যত্ন বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়ী-বারন্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালার গিয়া পড়িয়াছিল।

কে?

আমি অজিত।

বাঃ। কখন এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে ধামিতে দিল না। বলিতে লাগিল, ঠাণ্ডো ত তোমার অস্থায়। বাড়িল্লুক লোক ভেবে সারা—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই ত বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এইসকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিল না।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেননি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা ধবর দিই গে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা ধবর দিলে না কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েচ।

ঘুমিয়ে পড়ব কি-রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্যন্ত।

শেষ প্রশ্ন

তা হলে ধেরে শোও গে। রাত আর নেই।

তুমি খাবে না ?

না, বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বা! বেশ ত কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিল না। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া, রাগ করিয়া, নিজের জিদ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই—এখন কিপে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে, বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিল না। এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্ঝাক্ নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল, জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিল না, সে রহিল, কি গেল একটু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিল না। গম্ভীর নিশীথে এমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু ধবর পাইলেন কাল অজিত কিংবা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকর্ষার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা এ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল, না ?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল ?

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হ'ল যে ?

অজিত শুধু কহিল, এমনি।

মনোরমা নিজে চা খায় না। সে পিতাকে চা তৈরী করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ্য করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কণ্ঠকে নিরালায় পাইয়া উদ্ভিগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভাল নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক, তবুও এ-বাড়িতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই।

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাইনে এ-কথা ত আমি বলিনি বাবা !

না না, বলনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মনোরমা বলিল, তা মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুনলে ?

আশুবাবু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি শোনেনি কিছুই, জানেননি কিছুই, সমস্তই তাঁহার অমুমানমাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইল না। কারণ এমনি করিয়া তর্ক করা যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায় না। ধানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেন না, আমিও শুতে গেলাম; তুমি ত আগেই শুয়ে পড়েছিলে—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওর মনটা আজ তেমন ভাল নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে কাটাতে চায়, আমাদেরও কি তার জন্তে ঘরের মধ্যে জেগে কাটাতে হবে? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য বাবা?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তা হলে তাঁর কর্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে চের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থ যদি অন্য কাউকে বোঝায় ত তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলাম না। শুধু একটা রাত মাত্রই নয়, তবু একজন তাই নিয়ে গোটা তিনটে রাত্রি জানালায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্তব্য কে নির্দেশ করেছিলেন তখন জিজ্ঞেস করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে এ-কথা জেনে নিতে ভুলবো না। এই বলিয়া তিনি ঋণকালের জন্ত মুখ ফিরাইয়া কণ্ঠার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া ঘরের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু ব'সো, আমি রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশি দূর গড়াইবার সময় পাইল না ইহাতে সে স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র

শেষ প্রশ্ন

লিখিতভেদে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় সে প্রায় কথাই কহিল না এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অত্যাচার দিনের তুলনায় তাহা যেমন রুচ তেমনি বিষ্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি ?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে ত বাবা !

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি ত জেগেই ছিলাম। খেতেও বললাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলে না। তোমার গুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি কিন্তু এতে এমন কি অত্যাচার হয়েছে আমি ত ভেবেই পাইনি। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত করে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে ?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন ?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞেস করবার কি আছে বাবা ?

জিজ্ঞেস করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন—বিশেষতঃ মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ ত খুব স্পষ্ট। বোধ হ'ল সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা কর। এ-রকম অত্যাচার ধারণা ত তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অত্যাচার করে থাকেন সে তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনের গায়ে পড়ে নিতে হবে বাবা ?

তিনি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মেয়েকে তিনি যেভাবে মাহুষ করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেন না। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলপাড় করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। 'একুশ কলহ ঘটাই থাকে এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেন না। অজিতকেও তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়াই সুশিক্ষিত নয়, তাহার মধ্যে একটা চরিত্রের সত্যপরতায় তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয় না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্তে রাগ করিয়া রহিল, এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা কঠিন।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ী গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু ধবর লইয়া জানিলেন। গাড়ী আসিয়াছে অজিতের জন্ত। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিতে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত ?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হ'লো ? আবার বিগড়েচে নাকি ?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে ত।

যদি হয়ও তার জন্তে একটা ঘোড়ার গাড়ী আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বল। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে ?

অজিত কহিল, কই আমি ত জানিনে ! তবে আজ আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে, বাড়ি পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশি। ঘোড়ার গাড়ীতে ঠিক হয়ে উঠবে না।

সকাল হইতে নানারূপ দৃষ্টিস্থায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল কাল সভাভঙ্গের পর আজিকার জন্তেও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পর মজলিশ বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল এই সঙ্গে এ-কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্থিততায় কথাটা তাঁহার নিজেরই মনে নাই এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ-সকল কতদূর বিরক্তিকর তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবে না অজিত।

অজিত কহিল, কেন ?

কেন ? মণিকেই একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না। এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈশ্বরে ডাকাডাকি করিয়া কণ্ঠকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ করে আছ বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে ? মণি ? আচ্ছা সে-সব আর একদিন হবে, এখন যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসো গে। কিন্তু বেশি দেরি করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবে না তা বলে দিচ্ছি। ছাইভার* ব্যাটা যে কুড়ে হয়ে গেল ! এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্তার অভাবনীয় স্মৃতিমাংসা করিয়া উজ্জল আনন্দে আরাম-কেন্দ্রারায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ফোঁস করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া করে বেড়াতে ! হিঃ !

শেষ প্রণয়

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইল। সাদা পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুক স্নিগ্ধ-হাস্তে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে ত মা ? না একদম ভুলে বসে আছ ?

কি বাবা ?

আজ যে সকলের নেমস্তন্ন ? তোমাদের গানের পালা শেষ হলে তাদের যে আজ খাওয়াবে—বলি, মনে আছে ত ?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে বৈ কি ! মোটর পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁদের আনতে।

মোটর পাঠিয়েচ আনতে ? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ক্রটি হবে না।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। মুখের পরে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আমাকে এ-কথা বলতে হ'তো না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর পরে তুমি কেন রাগ করে আছ এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার করে নিতেন, কিন্তু তিনি ত নেই, আমাকে কি তা বলা যায় না ?

তাঁহার স্বর এমনি সক্রমণ যে ক্রেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্তা হয়নি ?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল ? কখন হ'ল ? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল ?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তার পরে ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমলে অস্তায় হ'তো না, কিন্তু তিনি ঘুমোননি। আপনি শুতে যাবার খানিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তার পরে ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তার পরে আর কোন কথা আপনাকে বলব না। বলিয়া সে চলিয়া গেল।
ঘারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল-পরশু আমি এখান থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা
ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল সে তিনি গুনিতে পাইলেন। মিনিট-
কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল সেও
তাঁহার কানে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেন না, সেইখানেই মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া
বসিয়া রহিলেন। বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সংবাদ দিল, বাবুর শরীর ভাল নয়
তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিল না, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল, সকলেরই বার বার মনে
হইতে লাগিল বাড়ির একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন এবং আর একজন
তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন নিন্দহাস্ত লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জল করিয়া রাখিতেন
আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

১০

এদিকে অজিতের গাড়ী আসিয়া কমলের বাটির সম্মুখে থামিল। কমল পথের
ধারের সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, চোখাচোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার
করিল। গাড়ীটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চোঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন।
সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে ত দিলেন, কিন্তু
ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত ?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন !

হেঁটে যাব ?

কেন ভয় করবে নাকি ! না হয় আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে
দিয়ে আসব। আসুন। বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাস্তাঘরে আনিয়া
বসিবার জন্ত কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন

শেষ প্রশ্ন

ধরে আমি কত রান্না রেঁধেছি। আপনি না এলে রাগ করে আমি সমস্ত মুচিদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ ত কম নয়! কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর চেয়ে বেশি সদগতি হ'তো।

এ-কথার মানে? বলিয়া কমল ক্রমকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে, কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্যবহার, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ-ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হ'লো সাধু লোকদের ভাল-মন্দ বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্ম-বুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না যে আসলে ঐটেই হ'লো ভ্রম। আনন্দের সূধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্ত্যয়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ-কথা তারা জানবে কোথা থেকে?

অজিত আশ্চর্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে আনন্দ নেই নাকি?

কমল কহিল, না নেই। কর্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই ত বন্ধন। তা না হলে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে রেঁধেছি—আপনি এসে খাবেন বলে, এত বড় অকর্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্‌খানে? অজিতবাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উন্টে কথার অর্থ যদি কখনো আপনাকে উপলব্ধি করেন, সেদিন কিন্তু আমাকে স্বরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক, আপনি খেতে বসুন। বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুকণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিতবাবু, আমি? আমার দরকার? বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলো অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহায়ে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কাল আমার খাওয়া হয়নি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাতে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেন না। তাই হয়েছে। আমার দোবেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুন্দ-সুন্দ আদায় হচ্ছে। কথাটা বলিয়াই তাহার স্বরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু আমি একেবারে জন্তরু মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খাননি, অথচ সেদিকে আমার হুঁস নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে বড়, তাই ত তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিতবাবু। এই বলিয়া সে একটু খামিয়া কহিল, আর এ-সব মাছ-মাংসের কাণ্ড আমি ত খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি ?

ঐ যে। বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল-ডাল আলু-সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ-বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল। কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিশ্বয় লেগেছিল তা বলতে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে ত আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেচে অক্ষয়বাবুর কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মাণিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্বয় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য থাকে না—রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই আপনি আমল দিতে চান না। হাত বাড়িয়ে পথ আগলানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত কুণ্ড হইল। বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিশ্বয় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শাস্তি! ধৈর্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছায় না। ইচ্ছে হয় আমি যদি তাঁর মেয়ে হ'তাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার জায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উত্তরের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিলতো কি করে ?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বললাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তক থাকিয়া

শেষ প্রশ্ন

কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেন না। তিনি এমনি দীর, এমনি শাস্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্ঠা, ছোটজাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখ তাহার জন্ম-রহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিত আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

থাওয়া শেষ হইল। কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার থাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্ছি।

না, সে হবে না। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে এক-পাও উঠবো না।

বেশ মানুষ ত! বলিয়া কমল হাসিয়া আহাৰ্য্য-দ্রব্যের ঢাকা তুলিয়া আহাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যাঙ্কি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্তান্ত দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানে না। কিন্তু আজ এত প্রকার পর্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায় এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্ম-সংযম অজিতের অভিজ্ঞত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল। এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্চিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। কমলের থাওয়ার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে করে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে মানি করে বেড়ায়, তারা কিন্তু আপনার পদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা জানিনে, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন ত একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কুচ্ছ অবলম্বন করেচেন ?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি ধাই। এতে আমার কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখের উপরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। সে কয়েকমুহূর্ত্ত শুক থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল নাকি ?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন অসমীয়া ক্রিষ্টান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ যোড়া থেকে পড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিল না, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এইরকম নানা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কুচ্ছসাধন আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেচি জাতে তাঁতি।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বলতেন তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতি নয় বৈশ্ব। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা তিনি যে-ই হোন, এখন রাগ করাও বৃথা, আপশোস করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেন না, কয়েক মাসের জরেই মারা গেলেন। বছর তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিবরণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্ত্তকাল পূর্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সবচেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল, মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র। তার বেশি নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততার—এমন মানুষ খুব কম দেখেছি অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

শেষ প্রশ্ন

অজিতের একবার সন্দেহ হইয়াছিল এ হয়ত পরিহাস করিতেছে। কিন্তু এ কি রক্ষম তামাসা? কহিল, এসব কি আপনি সত্যি বলচেন?

কমল একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জবাব দিল, আমি ত কখনই মিথ্যে বলিনে অজিত-বাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্ত তাহার মুখের পরে একটা নিঃসঙ্গ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আপনি ইংরাজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজি জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে কমল শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন ও-ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠব।

বসবেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না, শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথবাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর 'পরে ত আপনার জোর নেই!

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে ত তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিরে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে। বাড়ি-ভাড়াটা এমাসের দেওয়াই আছে, আমি তা হলে কাল-পশু' চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আসবার সময় আপনার অন্তে কিছু টাকা এনেছিলাম। নেবেন ?

না।

না কেন ? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছুই নেই। যাও'বা ছিল, আজ আমারই জন্তু তা নিঃশেষ হয়েছে। কিছু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয় না ?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নন।

না-ই হ'লাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয় ; আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিন না।

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেছি আমি কখনোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার অন্তথা হইবে না। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ বাড়ি-ভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে। সহসা ব্যথার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির ?

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে ?

উপায় কি আছে সে জানে না এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যার কাছে এ-সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন ?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি ?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা হলে আস্থন, নমস্কার। বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট-দুই সেখানে শুকভাবে দাঁড়াইয়া রছিল। তার পরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবারুর বসিবার ঘরে শার্শিগুলা সারাদিনই বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতার গিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারার দিবানিজা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি ত বাবা, তা হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা দুটো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা মোটা বালাপোষ লুটাইতেছিল, আগস্তক সেইখানা তুলিয়া লইয়া তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্য্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবারু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাও গে, এখনো একটু বেলা আছে। কিন্তু বুঝবে বাবা কাল—

অর্থাৎ কাল তোমার চাকুরী যাইবেই। কোন সাড়া আসিল না, কারণ প্রভুর এবংবিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবারু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েকমুহূর্ত্ত অভিভূতের মত শুক থাকিয়া কহিলেন, তাই ত বলি, একি যেদোর হাত? এমন করে পা ঢেকে দিতে ত তার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

কমল বলিল, কিন্তু এ-দিকে যে হাত পুড়ে যাচ্ছে।

আশুবারু ব্যস্ত হইয়া জলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেন না, বলিলেন, ওখানে নয় মা, আমার খুব কাছে এসে ব'সো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্মিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এখন হঠাৎ যে কমল?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল কহিল, আজ ভারি ইচ্ছে হ'ল আপনাকে একবার দেখে আসি, তাই চলে এলাম।

আণ্ডাবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেচো। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্তান্ত সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী-সার্থী নাই, কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাণীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই—নিতান্ত নিঃস্ব জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—কমল, তোমার যখন খুশি স্বচ্ছন্দে আসিয়ো। আর যাহার কাছেই হোক, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই-তিন কেমন একপ্রকার অন্তমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলি নীচে ধসিয়া পড়িতে কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন করলাম।

আণ্ডাবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে। যেটুকু বাকি আছে তা না পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছাও নেই। একটুখানি খামিয়া বলিলেন, তা ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই ত হবে, তার চেয়ে বসে দুটো গল্প করো আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি ত আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর সকলে রাগ করবেন যে?

তাহার মুখের হাসি সঙ্গেও আণ্ডাবাবু ব্যথা পাইলেন; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু ঝাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী। তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন-দুই হ'ল তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন, মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন, ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্তে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন ঝাঁরা রাগ করবেন। একজন ত মমোরমা, কিন্তু বাকি কারা?

আণ্ডাবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হ'তো 'অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিষেবই' যেন সবচেয়ে বেশি, যেন অক্ষয়বাবুকেও হার মানিয়েচে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া' বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু হঠাৎ দিন দু-তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

শেষ প্রশ্ন

এবার কমল হাসিল, কহিল, অর্থাৎ কুশাভুরের উপর বজ্রাঘাত। কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরে তুচ্ছ একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্ত? আমি ত কারও বাড়িতে যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা যাও না সত্যি। সহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানে না, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা তুলতেও পারে না, মাপ করতেও পারে না। তোমার আলোচনা না করে, তোমার খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শাস্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলো তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জানো? অক্ষয়বাবুর রচনা। ইংরিজী না হলে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নাম-ধাম নেই, কিন্তু আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা; তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেরের বাড়িতে নাকি নারী-কল্যাণ সমিতির উদ্বোধন হবে; এ তারই মঙ্গল-অমুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলো দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নয়, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই—বিরোধ থাকতেও পারে না, কিন্তু এ ত সে নয়। ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এর আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ ত এক নয় কমল, একে ত আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি ত আর এ লেখা শুনতে যাবো না—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতাই নেই। তাই বোধ হয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেচে ভরাডুবির মুষ্টিলাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিল না, তবু তাহার ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু খামিয়া কহিল, আপনার দুর্বলতাটুকু তাঁরা ধরেছেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

তুমি কি পেরেচো মা?

বোধ হয় ওঁদের চেয়ে বেশি পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই জানে এই সদানন্দ বুড়োলোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিবয়-আশয়—

কিন্তু সে ত মিথ্যে নয়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আগুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে।
কিন্তু ও মাহুঘের কতটুকু কমল ?

কমল সহাস্তে কহিল, অনেকখানি আগুবাবু।

আগুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু
না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি।

বলুন।

আমি বুড়োমাহুঘ, আর তুমি আমার মণির সমবয়সী। তোমার মুখ থেকে আমার
নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে
ত আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকে।

কমলের বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। আগুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় বলে
নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া—বাতে
পন্থু। বাজারে আণ্ড বস্তির কেউ কানাকড়ি দাম দেবে না। এই বলিয়া তিনি
সহাস্ত কোঁতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, নাই দিলে মা,
কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। তার খোঁড়া-কাকাই
ভালো।

অশ্রু পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই দেয়
কমল, তাকে বিনয় করে ব'লো, এই আমার ঢের। ব'লো, গরীবের রাঙাই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রু-
নিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না। এই ছুজনের কোথাও
বিল নাই। শুধু অনাঙ্গীয়-পরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়—শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি,
সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ ? কোন সম্বন্ধই যেখানে
নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সঙ্ঘোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে
কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আগুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে ত বলতে ?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না ! না কেন ?

কমল এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না, অশ্রু কথা পাড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায় ?

আগুবাবু কণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি হয়ত বাড়িতেই আছে।
পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার
কাছে বড় একটা সে আসে না। হয়ত সে এখান থেকে নীতাই চলে যাবে।

শেষ প্রশ্ন

কোথায় যাবেন ?

আগুবাবু হাসিবার প্রশ্ন করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা ? বলে না। হরত প্রয়োজনও বোধ করে না। একটুখানি খামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধ হয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না।

কমল নীরব হইয়া রহিল। আগুবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরানো অভ্যাস হুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার যোগাড় করেছে। এই ত চলচে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরানো অভ্যাস ?

আগুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেকুরা পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভালবেসেচে, দেশের কাজে হাঙ্গতে গেছে, বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে, কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় সেটা একটু বদলেচে। আগে মাছ-মাংস খেতো না, তার পরে খাচ্ছিলো, আবার দেখিচি পরশু থেকে বন্ধ করেছে। যত্ন বলে, বাবু ঘণ্টা-খানেক ধরে ঘরে বসে নাক টিপে যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন ?

হাঁ। চাকরটাই বলছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্র-যাত্রার জন্তে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, সমুদ্র-যাত্রার জন্তে প্রায়শ্চিত্ত করবেন ? অজিতবাবু ?

আগুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর হ'ল সর্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ঝারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল এবং যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়া আসিয়াছে সে-ই আসিয়া মশরীরে দণ্ডায়মান হইল এবং সর্কাপেকা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাহার স্বভাব, সেই আগুবাবুর পর্যন্ত মুখ শুক হইয়া উঠিল। ক্রমেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তির ধরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির

এখানে এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বায়ে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। তিনি সোজা পথে সোজা মতলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষুে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ণনা করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাঁহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিলেন, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা কেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া অক্ষয় কাগজগুলি কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ওধারের সোফায় বসিয়া সেইদিনের খবরের কাগজটার চোখ বুলাইতে শুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েছি আশুবাবু। ওর অধিকাংশ সত্য এবং মূল্যবান। দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় ত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্তব্য। যুরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ক্রটি আমাদের চোখে পড়েছে মানি, কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অহুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি মোত বা মোহের বশে তাঁদের নষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আশুবাবুসাদের অনির্কচনীয় তৃপ্তিতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে বার-কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ-কথা বলে আসছেন এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করেন না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার যো নেই এবং এ-ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বলব।

শেষ প্রাণ

আগুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার ত আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি না যাই, কিন্তু এ তোমাদেরই ভাল-মন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার ত এ-প্রস্তাবে আপত্তি নেই ?

অল্প সময় হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু একে তার মন ধারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সম্ভবতঃ সদস্ত প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জলিয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্টা আগুবাবু? অমুকরণটা, না ভারতীয় বিশিষ্টতা ?

আগুবাবু বলিলেন, ধরো যদি বলি দুটোই ?

কমল কহিল, অমুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে মেলে না। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অমুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

আগুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বই কি কমল, আছে। ও-রকম সর্বদীর্ণ অমুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে ত কিসের মধ্যে আছে বসো ত ?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আগুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং যুরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্মই মানুষ নয়, মানুষের জন্মই তার আদর। আসল কথা, বর্তমানকালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি-না। এ-ছাড়া সমস্তই শুধু অন্ধ মোহ।

আগুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশি নয় ?

কমল বলিল, না, তার বেশি নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সে-ইচ্চে চলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই ? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন তুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেইখানেই সত্যিকার লজ্জা আগুবাবু।

আগুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা হলে ত সমস্ত একাকার হয়ে যাবে ? ভারতবর্ষীয় বলে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না ? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনার সাক্ষী আছে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ঠাঁহার কুণ্ঠিত বিষ্কৃত মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-
ঋষিদের বংশধর বলে হয়ত চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর
আপনারা যাকে ভগবান বলেন তিনিও চিনতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিলেন, ভগবান শুধু আমাদের?
আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিলেন, এ-শুধু শিবনাথের প্রতিক্রমি, শেখানো বুলি।

হরেন্দ্র কহিল, ক্রট্।

দেখুন হরেন্দ্রবাবু—

দেখেচি। বিষ্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোখিতের মায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, জাখে
কমল, অপরের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা
নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম, কত আদর্শ,
কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান,—শিল্প—কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে
আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে। এর কিছুই ত তা হলে থাকবে না?

কমল কহিল, থাকবার জন্মই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয় তা যাবে
না। মানুষের প্রয়োজনে আবার তার নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য্য, নতুন মূল্য নিয়ে
দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে বহুদিন ধরে কিছু একটা
আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয়বাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু
যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে
আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবহার পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু একটা
কথা ভুলো না কমল, বাইরে অনেক উৎপাত আমাদের সহিতে হয়েছে, তবু যে আজও
সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই।
জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতেই বা দুঃখ কিসের? 'চিরকাল ধরেই যে তাদের আয়ুসা জুড়ে
বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যিক কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অল্প কথা কমল।

শেষ প্রশ্ন

কমল কহিল, তা হোক। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্থীদের একটি শাখা ইউরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই। কিন্তু তাঁদের বদলে যারা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেমনি যদি এদেশেও ঘটতো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব-পিতামহদের জন্ত শোক করতে বসতাম না, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দস্ত করেও দিনপাত করতাম না। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিংবা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাও ত সত্য না হতে পারে। তখন আমরা বেঁচে যাবো কিসের জোরে বলুন ত ?

আণ্ডাবাবু এ-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো, আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের দানের মধ্যে, আমাদের পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয় সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাব। হিন্দু কখনও মরে না।

অজিত হাতের কাগজ ফেলিয়া তাহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল এবং মুহূর্তকালের জন্ত কমলও নির্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দস্তের সহিত পাঠ করিবে এবং এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কহিতেও আমার ইচ্ছে হয় না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আণ্ডাবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, কোন আদর্শ-ই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই—এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। অতিথৈয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে রচিত হয়েছে। অতিথিকে খুশি করতে দাতাকর্ণ নিজেই পুত্রহত্যা করেছিলেন। এই নিয়ে কত লোক কত চোখের জলই যে ফেলেচে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন ভুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে-কথা মাহুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নিজের জীবনের যে আদর্শ যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহের ঝাড়া-বাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নিশ্চয়তায় পলকের জন্ম আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ বলে নিচো কেন, এ যে আমার আনন্দ। এ যে আমার উত্তরাধিকারস্বত্রে পাওয়া বহুযুগের ধন।

কমল বলিল, হোক বহুযুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই চের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ঞায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিশ্বাসের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিশ্বিত হইনি। আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্তে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরি করবার সময় নেই, পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল তখন এইভাবে পুরুষের দল নিজের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশি আঘাত করেচ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয় মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মাতুষ কাকাবাবু। আগ্নি ত এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চললাম। বলিয়া সে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা ?

আঁর হয়ত আমি আসব না কাকাবাবু। বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া'রহিলেন।

আগ্রার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাহারই ঘরে এবং তাহারই গৃহে নারী-কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন একটু ঘটাই করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিসটা সুসম্পন্ন ত হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ মেয়েদের জন্মই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়ার নিষেধ ছিল না। বস্তুতঃ এ প্রয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল; লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই পরামর্শ-মত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোটশালী নীলিমা ঘরে ঘরে গিয়া ধনী-দরিদ্র-নির্ঝিংশে সহরের সমস্ত বাঙালী ভদ্রমহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কনকনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিল না, মালিনী নিজের গিয়া ধরিয়া আনিল। অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই-চারিটা মামুলি বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ-পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য বিষয় যেমন অরুচিকর তেমনি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালের সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারী-জাতির আদর্শ-বিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইহাদের 'তথাকথিত' শিক্ষার বিরুদ্ধে কটুক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ অক্ষয়ের গর্ভ ছিল এই যে, তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পান না। সুতরাং লেখার মধ্যে সত্য যাই থাক, অপ্রিয়-বচনের অভাব ছিল না। এবং এই 'তথাকথিত' শব্দটার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছেন। শেষের দিকে তিনি গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই সহরেই ঠিক এমন একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে যে ভদ্র-সমাজে নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে। যে স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ-অবস্থান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্বলতা। উপসংহারে অক্ষয়

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এ-কথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সেই শিক্ষিতা নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ-লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচবশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ক্রটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি, এই নব-প্রতিষ্ঠিত নারী-কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে এবং এ লইয়া নারী-মণ্ডলে, পর্দার ভিতরে ও বাহিরে কোতূহলের অবধি নাই। স্মৃতরাং রুচি ও নীতির সম্যক বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্নমালার প্রথরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধ করি বিলম্ব ঘটত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়বাবুর এই লেখায় আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচি বিষ্টলি এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হয়। নারী-কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধ-লেখককে দিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা খুশি তাই বলিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিষ্ট এবং ক্রটি বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এইপ্রকার বাক-বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িল এবং সেই উত্তেজনার মুখে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ-পাঠের গোড়া হইতে সেই যে মাথা হেঁট করিয়া ছিলেন সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিলেন না। আরও একটি মানুষ তর্ক-যুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না, ইনি হরেন্দ্র-অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনায় নিত্য অভ্যস্ত অবিলাস।

ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের ভালমন্দ নিরূপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয় এবং এ-প্রকার আলোচনায় নর-নারী কাহারও কল্যাণ হয় না, মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় রেশ বোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে নিজের আসন ছাড়িয়া এই প্রোচ ব্যক্তিটির পাশে আসিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিরর্থক আজ আপনার শাস্তি নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত আশুবাবু।

শেষ প্রশ্ন

আগুবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বাড়িতেও ত আমি একাই বসে থাকতাম, তবু সময়টা কাটল।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু খামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি ফিরে গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর সব মেয়েরা ?

তঁারাও আজ এখানেই থাকেন।

অবিনাশ অজিতকে সঙ্গে লইয়া আগুবার গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের পৌছাইয়া দিতে হইবে। রাজী হইতে হইল, সমস্ত পথটা আগুবার নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ করিয়া মেয়েদের মাঝখানে অক্ষয় তাঁকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিজের মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া বাসায় পৌছিল। নীচের বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়া ছিল, বোম্বাই-ওয়ালার মত তাহার পোষাক, কাছে আসিয়া আগুবাবুকে অভিবাদন করিল।

কি ?

জবাবে সে একটুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন, অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া দেখিয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের ? কি লিখেচে কমল ?

লিখেচেন পত্রবাহকের মুখে সমস্তই জানতে পারবেন।

আগুবার জিজ্ঞাসু-মুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র আর কারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আগুবার সহসা অত্যন্ত জ্বক হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তার আত্মীয় নই, বস্তুতঃ সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাব কিসের জন্ত ?

গাড়ীর উপর হইতে অক্ষয় কহিল, just like her !

কথাটা সকলেরই কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জামিন হলে—

আগুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল—বলিলেন, জামিন হওয়ার গরজ আমার নয়। তাঁর স্বামী আছেন, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ভঙ্গলোক অতিশয় বিস্মিত হইল, বলিল, তাঁর স্বামীর কথা ত শুনি নি !

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night, এসো অজিত, আর দেরি ক'রো না। বলিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরের গাড়ী-বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ডাইভারকে স্বরণ করাইয়া দিলেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কুঠিতে গাড়ী পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছিল আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বস। মজা দেখলে একবার ?

এ-কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুতঃ তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তিপ্রিয়তা ও চিরাত্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার এই মুহূর্তকাল পূর্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তরে সশ্রদ্ধ বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জন নিশীথ গৃহ-কক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী-জীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদ্ঘাটিত করিয়া দিল সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই আজ নারী-কল্যাণ সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শ-পন্থী অক্ষয় নারীস্বের আদর্শ নির্দেশের ছলনায় যত কটুক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাকে অজিত দুঃখবোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি অক্ষয়ের ক্রোধাক্ত বর্করতায় যত তীক্ষ্ণ শূলই থাকে, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল। কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভাল সে বলে না। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের স্তম্ভী নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাবই পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। সে বলে, ভঙ্গ-সমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করায় অপরাধ স্পর্শে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল ! হৃদ্যশাপন, ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্ত কয়টা টাকা ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যেন সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্তির সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেইসকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি—তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজারসাহেবের গৃহে জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অক্লচিকর। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল ? গোপন করিলেই বা

শেষ প্রশ্ন

কি ক্ষতি হইত ? কিন্তু ছনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা-খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদি বা পড়িয়াছে গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য্য। দৈবক্রমে তারই মুখে সে প্রথম সংবাদ পাইল যে শিবনাথ কোথাও যায় নাই, এই সহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চূপ করিয়া রহিল। মুখের পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাটমহিষী মমতাজের স্মৃতি-সৌধের তীরে বসিয়া যে-কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ঋণকালের জন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখলে ত অজিত ? আমি নিশ্চয় বলচি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল।

অজিত কহিল, না-ও হতে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ-ধর ত সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে ত চের বেশি অশ্রয়। স্বামীকে লুকানো ত ভাল কাজ নয়।

অজিত চূপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত তাঁর মতের বিরুদ্ধে পরের কাছে টাকা ধার করতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কত বড় অশ্রয় বল ত ? এ কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অজিত কহিল, তিনি টাকা ত চাননি, শুধু জামিন হতে অস্বরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ঋণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয়-পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্ত ? সত্যিই ত আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধ হয় কাউকেই ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না, কথাটা ঠিক ওভাবে আমি বলিনি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটাকে হঠাৎ ঝাঁকের উপর বিদায় করা পর্য্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারি একটা গ্লানি চলিতেছিল ; কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

সোজা নিজে এসে তা নিয়ে গেলেই হ'ত। ধামোকা একটা বাইরের লোককে সকলের সামনে পাঠান তার কি আবশ্যিকতা ছিল? আর যাই বল, মেয়েটার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেয়ারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিল্লী চেহারা—মনি-লেন্ডার কি না। ফিরে গিয়ে হয়ত নানান্থানা করে বানিয়ে বলবে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবে না আশুবাবু, সত্যি বললেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্ভত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন,—এ অক্ষয় লোকটা একেবারে মুইসেন্স। মানুষের সত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ কর না অজিত। যত্নে ডেকে ঐ দেওয়ালটা খুলে দেখ না কি আছে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো টাকা—আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধ হয় তাদের বাসটা চেনে—শিবনাথকে মাঝে মাঝে পৌঁছে দিয়ে এসেচে। এই বলিয়া তিনি নিজেই চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েই গেছে, আজ রাতে থাক, কাল সকালে বিবেচনা করে দেখলেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোর না অজিত, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সে রাতে কখন লোক পাঠাতো না।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ি নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন ফিরবে তারও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই গুনতে পাবেন। তার পরে আর টাকা পাঠান উচিত হবে না আশুবাবু। বোধ হয় আপনার হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেন না।

কিন্তু এ ত তোমার অহুমান মাত্র অজিত।

হাঁ, অহুমান বই আর কি।

কিন্তু বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন ত এর চেয়েও বড় হতে পারে?

তা পারে, কিন্তু আত্ম-মর্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-ও ত শুধু তোমার অহুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিল না। কণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অহুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেষ প্রাণ

আবু আবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন না, কেবল বেদনার ছই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সখকে এ-বিখাস অসম্ভবও নয়, অসম্ভবও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অল্পশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

১৩

নারী-কল্যাণ সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, মুখ্যোমশাই, কমলকে আমি একবার দেখব। আমার ভারি ইচ্ছে করে তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস ত কম নয় ছোটগিন্নী; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমন্তন্ন করা ?

অবিনাশ বলিলেন, বাধ-ভালুক এদেশে মেলে না, নহিলে তোমার হুকুমে তাঁদেরও নেমন্তন্ন করে আসতে পারি। কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করিনে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ করিয়া বলিল, না, সে হবে না। তুমি না যাও আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আহ্বান করে আসব।

কিন্তু আমি ত তাদের বাসাটা চিনি।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি জোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, জোমাদের মুখে যা শুনি তাতে শিবনাথবাবুরই দোষ—তাঁকে ত আমি নেমন্তন্ন করতে চাইনে। আমি চাই কমলকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ

৯১

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

করতে। কমল যদি আসতে রাজী হয়, ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্ত্রী—তিনিও বলেচেন আসবেন। বুঝলে ?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই—কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন না। অথচ বাধা দিতেও ভরসা পাইলেন না। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তাই নয়, মনে মনে ভয়ও করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ করে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ, ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান মলে দেবে। বাসায় ত থাকো শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে—তোমার ভয়টা কিসের ?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে, কিন্তু করতে হবে কি ?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখব, আলাপ করব, ঘরে এনে খাওয়াব। তুমি কি ওদের বাসা চেন—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তাকে নেমস্তন্ন করে আসতে হবে। কখন যেতে পারবে বল ত ?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা ? সেজদা ? ঠাণ্ডা অভিপ্রায়টা কি ? এই বলিয়া সে বারান্দার ওধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে গুইয়া পাইয়োনিয়ার পড়িতেছিলেন, গুনিতে পাইলেন সমস্তই—কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ঠাণ্ডা অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন—আমার কাজ নেই। আমি ঠাণ্ডা শালী, শালীর বোন নই যে পতি পরম গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন করবেন। আমার যাকে ইচ্ছে খাওয়াব। ম্যাজিষ্ট্রেটের বৌ বলেচেন খবর পেলে তিনিও আসবেন। ঠাণ্ডা ভাল না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হাতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবে না হরেন। কালকের ব্যাপারটা মনে আছে ত ? আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিল না এবং পাছে সেই লজ্জাকর কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং নীলিমার কানে যায় এই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুন না বৌদি, আমার বাসাতে তাকে নিমন্ত্রণ করে আনুন। আপনি হবেন গৃহকর্তী। লক্ষীছাড়ার গৃহে একদিন লক্ষীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলেগুলোও ছোটো ভালোমন্দ জিনিস মুখে দিবে বাঁচবে।

শেষ প্রশ্ন

নীলিমা অভিমানের স্বরে বলিল, বেশ—তাই হোক ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোঁটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাব।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ কেলেঙ্কারী তা হলে আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়তই দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরম্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান—এই চের ভাল শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে, কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ী করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল যে, কষ্ট করিয়া আর যাইবার প্রয়োজন নাই। কাল রাত্রে খাবার কথা তাহাকে বলা হইয়াছে—তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফেরবার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাস। জিজ্ঞেস করলাম, কি ওটা? কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, যাচ্ছি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয় দিয়ে বললাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমস্তন্ন করেছেন। নিতান্তই মেয়েদের ব্যাপার—যেতে হবে যে। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা। বললাম, কথা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি'নিজে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আসবেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে কি? একটুখানি হেসে বললেন, না। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু একলা ত যেতে পারবেন না, কাল কখন এসে আপনাকে নিয়ে যাব? শুনে তেমনি হাসতে লাগলেন। বললেন, একলাই যেতে পারব—অবিনাশবাবুর বাসা চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভাল। তারি নিরহঙ্কার।

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতোছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথায় মোটা বাসটা? তার ইতিহাস ত প্রকাশ করলে না ভায়া?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞেস করিনি।

করলে ভাল করতে। বোধ হয় বিক্রী কিংবা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, হতেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারী-কল্যাণ সমিতিতে অক্ষয়ের বক্তৃতা শুনেছেন ত? আমরা লোকটাকে ক্রট্ বলি। কিন্তু ও-বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বুড়ি থাকলে সমাজে অন্যায়সেই সাধু-সম্মান বলে চলে যেতে পারত—কি বলেন সেজদা? ঠিক না?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জন করিয়া উঠিলেন—হাঁ রে, নিত্যানন্দ শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু। এ-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও গে যাও। চেষ্টা করব। কিন্তু চললাম বৌদি, কাল আবার যথাসময়ে হাজির হব। বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উজোগ-আয়োজনের জট রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতেই কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে—সে কোনমতেই আসিবে না জানিয়া আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালিনীকে খবর পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া তিনি আসিলেন না।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যান-বাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্তী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ স্তম্ভে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামাকাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য হইলেন। দৈন্তের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল?

কমল বলিল, কারণ খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন এবং তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে বল। কাজটা ভাল হয়নি কিন্তু—ছোটগিন্নী, ইনিই কমল। আর একটা নাম শিবানী। এঁকে দেখবার জন্তই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। এসো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবে চল। যোগাড় বোধ হয় তোমার সমস্ত হয়ে গেছে? তা হলে অনর্থক দেরি করে লাভ হবে না—ঠিক সময়ে আবার গুর বাসায় কিরে যাওয়া চাই ত!

এ-সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাছল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয় না, প্রত্যাশাও থাকে না।

হঠাৎ আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময়ে জুটতে পারিনি বৌদি, জট হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন, তাঁকে বখোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হ'ল। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

শেষ প্রাণ

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মুহূর্তকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েছে, কিন্তু এ-সব আমি খাইনে।

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্কার বলেন—আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নীলিমা অবাক হইল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্কার খেতে যাবেন किसের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এ-সব খাইনে বলেই অভাবটাও আমার কম। আপনি কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু মনে না করিলে চলে না। নীলিমা ক্ষুধ হইয়া কহিল, না খেলে এত জিনিস যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিল, কহিল, যা হবার তা হয়েছে, সে আর কিরবে না। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্তও নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটিনাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না, কিন্তু তার দৃঢ়তা যে কত বড়—তাহা পৌঁছিল হরের কানে। শুধু সে-ই বুঝিল ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্তীর দিক হইতে অস্বস্তির পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক বৌদি, আর না। খাবার আপনার নষ্ট হবে না, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেষ্টে-পুঁচে খেয়ে যাব, কিন্তু শুঁকে আর নয়। বরঞ্চ যা খাবেন তার যোগাড় করে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর সাধনা দিতে হবে না ঠাকুরপো, তুমি খাম। এ ঘাস নয় যে তোমার একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় কেলে দেব—তবু তাদের খাওয়াব না।

হরের হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ किसের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্তই ত তোমার বত ছুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জন কম কর না। এতদিন বৌ এলে ত ছেলে-পুলের ঘর ভরে যেত। এ হতভাগা কাণ্ড ত ঘটত না। নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্তিক, দলটিও তৈরি হচ্ছে তারি উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতে খাওয়াব না—এই তোমাকে আমি বলে দিলুম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল কিছুই বুঝিতে পারিল না, আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে, এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিসটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটি-কয়েক ছাত্র আছে আমার—তারা আমার কাছে থেকে ইন্সুলে কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ঠাঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? কৈ এ ত এতদিন শুনিনি? হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মত কিছুই নয়। কিন্তু চরিত্রবান ভাল ছেলে তারা। তাদের আমি ভালবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখতে? দেখলে খুশি হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি—যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাণী বেড়াতে। তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তাদের দেখলে আপনি খুশিই হবেন।

অবিনাশ মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শুনিয়া চক্কু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, কতকগুলো লক্ষীছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠল? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস্ হরেন!

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্তায় মুখ্যোমশায়। ঠাকুরপো ত তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসেনি যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্ছ! নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বলে না। বরঞ্চ যারা বলে—তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করছিলেন—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে সেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা বলিল, আমি বলছিলাম রাগে। কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়? ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তার পরে যেন পরকে বলতে যান।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা ত সবাই ইন্সুল-কলেজে পড়েন?

হরেন্দ্র বলিল, হাঁ, প্রকাশে তাই বটে।

শেষ প্রশ্ন

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশে কি-সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চা করা হয়, সেটাও খুলে বল ?

শুনিয়া সদাই হাসিল। নীলিমা অমুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখ্যোমশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ঠুর বিচার করে নেবেন না। মাঝে মাঝে মাথা ঠুর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হ'তো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই নিম্ন পরিহাসটুকুর পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুনঠাকুর আসিয়া জানাইল, কমলের খাবার তৈরি হইয়া গেছে। অতএব এখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা-দুই পরে আহািরাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন—কমল তখন পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না করুক, কলেজের পড়া মুখস্থ করা ছাড়াও ত কিছু করে—সে কি ?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হতে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই। কিন্তু পায়ের ধুলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বলব, আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানের আতিশয্যে অবিনাশের গা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বলতেই বা বাধা কি ঠাকুরপো ? তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙলে, কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মত করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিচ্ছ এ-কথা জানাতে দোষ কি ? তোমার কাছে ত আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলুম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও ত বলচিনে বৌদি, বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল। কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহায়ভূতি নেই ?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কি না জানলে ত বলা যায় না হরেনবাবু। কিন্তু পুরাকালের ছাঁচে তৈরি করে তোলাটাই যে সত্যিকার মানুষের ছাঁচে তৈরি করে তোলা এও ত যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই যে আমাদের ভারতের আদর্শ ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শ যে চিরযুগের চরম আদর্শ—এই বা কে স্থির করে দিলে বলুন ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হতে পারে কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্বপিতামহগণের আদর্শ। ভারতবাসীর এই নিত্য-কালের লক্ষ্য—এই তাদের একটামাত্র চলবার পথ। হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু সে এই লক্ষ্যই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানিনে কেন মানুষের এ ভুল হয়! নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারতবাসীকে চোখে দেখতেই পায় না। আরও ত চের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন?

অবিনাশ কুণ্ডিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক তারা। আমাদের কাছে এ আবেদন নিফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শই স্পষ্ট করে দেখতে পেলো যথেষ্ট মনে করব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশবাবু। নইলে এতবড় অন্ধ ভাবতে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এমনি করেই ভাবে। সেদিন অজিতবাবুর স্মৃতিতেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাভাব্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী—আজও মনে হয় ত তাই আছেন—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতে উত্তত ছিলেন, কিন্তু কমল সেদিকে দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেছি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে! এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানব-জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা বলচ, নিজে তার অর্থ বোঝ না। এতে মানুষের সর্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবে না 'অবিনাশবাবু, যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিল, এ-সব নিছক শিবনাথের কথা।

শেষ প্রশ্ন

কমল কহিল, তা ত জানিনে—তিনিও এ-কথা বলেন।

এবার অবিনাশ আত্মবিশ্বাস হইলেন। বিক্রমে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জান! কথাগুলো মুখস্থ করেচ, আর জান না কার?

তঁহার এই কদর্যা দৃঢ়তার জবাব কমল দিল না, দিল নীলিমা। কহিল, কথা যারই হোক মুখ্যোমশায়, মাষ্টারিগিরি কাজে কড়া কথায় ধমক দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন করায় লজ্জা আছে। কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ী ডাকতে পাঠাও না ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে ত আর ভয় নেই। এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, মুখ্যোমশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠেচে—তাতে বিলম্ব করা আর সম্ভব হবে না।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ ত, তোমরা বসে গল্প কর না, আমি শুতে চললাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আনতে গেলে কিন্তু না বলতে পারবেন না।

কমল সহাস্তে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেনবাবু? নাই বা গেলাম?

না, সে হবে না। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নই। নিতান্তই শাদা-সিধে। গেরুয়াও পরিনে, জটা-বন্ধলও ধারণ করিনি। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গেই মিশে আছি।

কিন্তু সে ত ভাল নয়! অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা আর একরকমের অগ্রায় আচরণ। বোধ হয় অবিনাশবাবু একেই বলেছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরং জটা-বন্ধল গেরুয়া ঢের ভাল। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার যো নেই—হটতেই হবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভাল বলেন না? পারি আর না পারি, এই আদর্শ কত বড়!

কমল কহিল, তা বলতে পারব না হরেনবাবু। সমস্ত সংঘের মত যৌন-সংঘমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘট করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তুললে সে হয় আর এক-ধরণের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে। বেশ, আমি যাব আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে—না গেলে আমি ছাড়ব না। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই—ঘটা করে আমরা কিছু করিনে। সহসা নীলিমাকে কহিল, আমার আদর্শ উনি। গুর মতই আমরা সহজের পথিক। বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ গুতে নেই—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি গুর দুঃসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, গুর কঠোর আত্মশাসন।

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করে না; কিন্তু বলুন ত—নারীত্বের এতবড় মহিমা, এতবড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহেই উনি গৃহিণী, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর শ্রায়। এ-বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব গুর উপরে। অথচ কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে?

কমলের মুখ স্মিতহাস্তে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালটা কি আছে হরেনবাবু? অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভাল হয়ে উঠবে কিসের জোরে?

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং নীলিমা আশ্চর্য হইয়া, দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেঘে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায়, বিশেষণের চাতুর্যে লোকে একে যত গৌরবাঘিতই করে তুলুক, গৃহিণীপনার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই। এ গৌরব ছাড়াই ভাল।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ ত আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার ত গুর নিজের নয়—হলে এ উপদেশ দিতুম না। অথচ এমনি করেই কর্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানের হরিণবাবুর কথা মনে পড়ে। ষোল বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মারা গেল—তাকে বাড়িতে এনে নিজের একপাল ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বললেন, লক্ষ্মী, দিদি আমার, এখন এরাই তোমার ছেলে-মেয়ে। তোমার ভাবনা কি বোম, এদের মানুষ করে, এদের মায়ের মত করে,

শেষ প্রশ্ন

এ-বাড়ির সর্বস্বত্ব হলে আজ থেকে তুই সার্থক হ—এই আমার আশীর্বাদ। হরিশবাবু ভাল লোক, বাগানময় তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে গেল—সবাই বললে, লক্ষ্মীর কপাল ভাল। ভাল ত বটেই! শুধু মেয়েমানুষেই জানে এতবড় দুর্ভোগ, এত বড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র কহিল, তার পরে ?

কমল বলিল, পরের খবর জানিনে হরেনবাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারিনি—আগেই চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ী এসে দাঁড়াল। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব। নমস্কার। বলিয়া সে একমুহুর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অন্ধারের মত জলিতে লাগিল।

১৪

‘আশ্রম’ শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্তায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা-খরচায় স্কুলে পড়া-শুনা করিতে পায়—ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অতবড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিল না। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্যভাবে। কিন্তু এ-সকল জিনিসের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির বিরাম থাকে না। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয় না। হইলও তাই। এ বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাই-বোন ছিল না। পিতা ওকালতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেন্দ্রর বিধবা মা।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তিনিও পরলোকগমন করিলেন। ছেলের তখন লেখা-পড়া সাজ হইল। অতএব আপনার বলিতে এমন কেহই আর রহিল না যে তাহাকে বিবাহের জন্ত পীড়াপীড়ি করে, কিংবা উজোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। অতএব পড়া যখন সমাপ্ত হইল তখন নিতান্ত কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধু-সঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাক্তের জমানো সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতি গঠন করিল, বন্ধাপ্রাবনে আচার্য্যদেবের দলে ভিড়িল, সেবক-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা-খোঁড়া ছুলো-হাবা-বোবা ধরিয়া অনিয়া সেবা করিল—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভাল লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, টাকা দাও, পরোপকার করি। বাড়তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে হাত না দিলে আর চলে না—এমনি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হোক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকি আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এই ধর সেইদিন সে প্রথম পাইল। অবিনাশের কলেজে তখন মাষ্টারি একটা খালি ছিল; চেষ্টা করিয়া সেই কক্ষে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এ-দেশে আসিবার ইহাই তাহার ইতিহাস। পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন সহরগুলায় সাবেককালের অনেক বড় বড় বাড়ি এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র যোগাড় করিয়া লইল। এই তাহার আশ্রম।

কিন্তু এখানে আসিয়া যে-কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল— তাহারই অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। এই মেয়েটি অচেনা লোক বলিয়া একটাদিনের জন্তও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন কি চাই ঠাকুরপো, আমাকে জানাতে লজ্জা ক'রো না। আমি বাড়ির গিন্নী নই—অথচ গিন্নীপনার ভার পড়েচে আমার ওপর। তোমার দাদা বলছিলেন, ভায়ার অযত্ন হলে মাইনে কাটা যাবে। গরীবমানুষের লোকসান করে দিয়ো না ভাই, দরকারগুলো যেন জানতে পারি।

হরেন্দ্র কি জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জায় সে এমনি জড়সড় উঠিল যে, এই মিষ্ট কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতে পারিল না। কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন-দুয়ের বেশি লাগিল না। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই—এমনি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেমনই সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাঁহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নাই—

শেষ প্রশ্ন

তিনিও যে এ-বাড়িতে পর—এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজ-সজ্জায়, তাঁহার রহস্য-মধুর আলাপ-আলোচনার ধরিতার যো নাই— তেমনি এইগুলাই যে তাঁহার সবটুকু নহে এ-কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাভীর্ষ্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—এমনি হাকা তাঁহার হাসি-খুশির মেলা, অথচ একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাঁহাকে 'অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না, বাটীর মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আবহাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রের সপ্তাহ-দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্লম হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আটকাছিল ?

হরেন্দ্র সলজ্জ কহিল, একদিন যেতেই হ'ত বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হ'ত। কিন্তু দেশ-সেবার নেশার ঘোর তোমার এখানো চোখ থেকে কাটেনি ঠাকুরপো, আরও দিন-কতক না হয় বৌদির হেফাজতেই থাকতে !

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাকব বৌদি। এই ত মিনিট-দশেকের পথ—আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব কোথায় ?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন ; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নামে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাস্নে আর কোথাও, এইখানে থাক। কিন্তু সে কি হয় ! ইজ্জত বড়—না, দাদার কথা বড় ! যাও, নতুন আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও গে। ছোটগিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হ'ল চড়কের সন্ন্যাসী—পিট ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর বায়ুন রাখিয়া অতিশয় শাস্ত-শিষ্ট নিরীহ মাষ্টারের শ্রম কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়িতে অনেক ঘর। গোটা-দুই ঘর ছাড়া বাকি সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাস-খানেক পরেই এই শূন্য ঘরগুলো তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ কাজে লাগে না। অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। ষে ছিল তাহার ছুঁতুক-নিবারণী সমিতির সেক্রেটারী। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর-দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ-ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধুবান্ধবগণের সন্ধানে ফিরিতেছিল। হরেন্দ্রের চিঠি এবং ট্রেনের মাণ্ডল পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন্দ্র কহিল, দেখি যদি তোমার একটা চাকরি-

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বাকরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অস্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলায় কোন একটা গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার সাধুসঙ্কল্প মূলতুবি রাখিয়া আশ্রয় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং একাকী আসিল না, অল্পগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সতীশ এ-কথা যুক্তি ও শাস্ত্র-বচনের জোরে নির্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, ভারতবর্ষই ধর্ম-ভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এ-দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং বর্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অসংখ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় ত এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীশের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিল না; সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্ত সে মনে মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল এবং ইতিপূর্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ববাদিসম্মত ভাল ভাল কথা জানিত; কয়েকদিন ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্বপিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী। আর্ধ্যরক্তসম্বৃত কোন্ পাষাণ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারে না এবং পারিবার মত দুর্ন্যতিপরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিল না।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা তপস্বী-সাধনার বস্ত্র বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটা সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সে শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হরেন্দ্রের চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্তি হইল—এইরূপে অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরের লোক বিশেষ কিছু জানিতও না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। শুধু এইটুকুই সকলে ভাসা ভাসা রকমের শুনিতে পাইল যে, হরেন্দ্রের বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলে লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিত না, নীলিমাও না।

শেষ প্রশ্ন

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ-মাংস আসিবার যো নাই, ব্রাহ্ম-মুহুর্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয় ; পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিল না, সাধন-মার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল—অতএব এ কাজগুলোও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠে না ; ছেলেদের পড়া-শুনা গেল—ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাধা-নিয়মের শৈথিল্য ঘটিল না—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল—বাহিরে কোথাও আহারের নিমন্ত্রণ ছুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত-উদ্যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া বাহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোন মার্জনা ছিল না। ছেলেদের খালি পা, রুক্ষ মাথা—পাছে কোথাও কোন ছিদ্র-পথে বিলাসিতা অনধিকার প্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ পাহারা দিতে লাগিল। মোটামুটি এইভাবেই আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের ত কথাই নাই, হরেন্দ্রর মনের মধ্যেও শ্রদ্ধার অবধি রহিল না। বাহিরের কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ত এ-জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিত না, বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটা বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে, রাজেনের আচরণ পূর্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয় না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে ; জিজ্ঞাসা করিলে বলে, শরীর ভাল নাই। অথচ শরীর ভাল না-থাকার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কিন্তু তাহার নালিশ, কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া যায় না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসে না, রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে তখন এমনি তাহার চেহারা যে, কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয় না। অথচ এ-সকল একান্তই আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ ; একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার যো নাই—এ-কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করে না। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলারক্ষার তার তাহারই উপরে। এইসকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তাহা নয়, কিন্তু

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মাঝে মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সম্ভব হইতেছে না—ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন্দ্র নিজেও যে না বুঝিত তাহা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিল না। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই—সকালে যখন সে বাড়ি ফিরিল তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতেছিল। হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি—রাজেন! কাল ছিলে কোথায় ?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, একটা গাছতলায় পড়েছিলাম।

গাছতলায়! গাছতলায় কেন ?

অনেক রাত হয়ে গেল—আর ডাকাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙলাম না।

বেশ! অত রাত্রিই বা হ'ল কেন ?

এমনি ঘুরতে ঘুরতে। বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত ?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল—গ্রাহ্য করলে না, আর আমি জানব কি করে।

তাই ত হে, এতটা ভাল নয়।

সতীশ মুখ ভারি করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি ত একটা কথা জানেন, পুলিশে ওকে বছর-দুই জেলে রেখেছিল ?

হরেন্দ্র বলিল, জানি, কিন্তু সে ত মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর ত কোন সত্যিকার দোষ ছিল না।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সন্দেহ ওকে আজও ছাড়েনি।

হরেন্দ্র কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি, ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন্দ্র চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে, রাজেন ভগবান পর্যন্ত বিশ্বাস করে না ?

হরেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া বলিল, কই না!

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করে না। আশ্রমের কাজকর্ম, বিধিনিষেধের প্রতিও তার তিলান্বিত শ্রদ্ধা নেই। আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকরি-বাকরি করে দিন।

শেষ প্রশ্ন

হরেন্দ্র কহিল, চাকরি ত গাছের ফল নয় সতীশ, যে, ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেব। তার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা হলে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট ও আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্তব্য। আপনি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে এতদিন আমার প্রবৃত্তি যায়নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করি।

হরেন্দ্র মনে মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নিশ্চল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। এদিক দিয়ে অতি বড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারে না। রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ-কথা ভাববারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করিনি, সে অস্বাভাবিক রকমের নিশ্চল, কিন্তু—

হরেন্দ্র প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিছটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। ও তখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং বাসায় বি-এস্-সি পড়ত। সবাই জানত ও-ই ফার্স্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে হঠাৎ কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-কি ডাক্তারি পড়ত না-কি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন কলেজে খার্ড ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাষ্টারই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসিমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তার পরেই বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর-দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন পিসি তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ক্রাশে প্রত্যেক বিষয়েই ফার্স্ট হচ্ছিল, অথচ বছর তিনেক পড়ে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে। ওই এক ছুতো—ভারি শক্ত, ও আমি পেরে উঠবো না। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বললে, ছেলে পড়িয়ে বি-এস্-সি পাশ করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাষ্টারী করে কাটাব। আমি বললাম, বেশ তাই কর। তার পরে দিন-পোনের নাওয়া-খাওয়ার

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই—এমন পড়াই পড়লে সে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সবাই বললে, এ না হলে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে!

হরেন্দ্র এ-সব কিছুই জানিত না—রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, তার পরে?

সতীশ কহিল, তার পরে যা আরম্ভ করলে সেও এমনি অদ্ভুত। বই আর ছুঁলে না। কোথায় রইল তার খাতা পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট বুক—কোথায় যায়, কোথায় থাকে, পাত্তাই পাওয়া যায় না। যখন ফিরে আসে তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্যন্ত ছিল না।

তার পরে?

তার পরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়িময় যেন দক্ষ-যজ্ঞ শুরু করলে। এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, সেটা খোলে, একে ধমকায়, তাকে আটকায়—সে বস্তু চোখে না দেখলে অনুধাবন করবার যো নেই। বাসার সবাই কেরানী, ভয়ে সকলের সর্দি-গর্গী হয়ে গেল—সবাই ভাবলে আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ সবাইকে ধরে ফাঁসি দেবে।

তার পরে?

তার পরে বিকেল নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাদের ধরে নিয়ে তারা বিদেয় হ'ল। আমাদের দিলে দিন-চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আর পাওয়া গেল না। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান্ ট্রেপ্! ওন্লি ওয়ান্ ট্রেপ্! তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান্ ট্রেপ্। গো। গঙ্গান্নান করে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বললে, সতীশ, তুমি ভাগ্যবান। অফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দু'মাসের মাইনে হাতে দিয়ে বললেন, গো। গুনলাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ-তল্লাসিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র শুরু হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার বন্ধু।

হরেন্দ্র খুশি হইল না, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মত।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে, তারা আমাদের বিনা দোষে লাঞ্ছনা করেছে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েছে।

শেষ প্রণয়

হরেন্দ্র বলিল, বিনা দোষে লাঞ্ছনা করাটাও ত আইন নয়। যারা তা পারে, তারা এ-ই বা পারবে না কেন? এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারি অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে পাছে তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া যায়। হরেন্দ্র স্থির করিল, ব্যাপারটা সত্যই হোক, বা মিথ্যাই হোক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোনমতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে তখন কোথাও চাকরী করিয়া দিয়া হোক বা যে-কোন অজুহাতেই হোক, তাহাকে অন্তত সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিন-কয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্বোপলক্ষে দুদিন ছুটি ছিল। সতীশ কাশী যাইবার অমুমতি চাহিতে আসিল। আশ্রম আশ্রমের অমুরূপ আদর্শে ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রের মনের মধ্যে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল, হরেন্দ্র, ওর সঙ্গে আমিও দিন-কতক বেড়িয়ে আসি গে।

হরেন্দ্র বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্ছি। যাবার গাড়ীভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারিনি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বলবার প্রয়োজন নেই হরেন্দ্র, সে আমি জানি। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়ীতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন, এবং বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিন-দশেক পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিল। হরেন্দ্রকে নিভূতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্লমুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েছে হরেন্দ্র। কাশীতে আশ্রম-স্থাপনের জন্তে এ-কদিন রাজেন অমাসুখিক পরিশ্রম করেছে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হরেন্দ্র কহিল, পরিশ্রম করলেই ত সে অমাতৃষিক পরিশ্রমই করে সতীশ !

হাঁ, তাই সে করেছে। কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের এই নিজের আশ্রমটুকুর জন্ত করত !

হরেন্দ্র আশাঘ্রিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিসটি ধরতে পারেনি। আমি নিশ্চয় বলচি তুমি দেখতে পাবে এখন থেকে ওর কর্মের আর অবধি থাকবে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন্দ্র বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেচি জানো? আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখলে আর চলবে না। দেশের এবং দশের সহায়ভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এর বিশিষ্ট কর্ম-পদ্ধতি সাধারণে প্রচার আবশ্যিক।

সতীশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজ বাধা পাবে না?

হরেন্দ্র বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখতে আসবেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিপুলতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আসবেন?

হরেন্দ্র বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশদা, বোঁঠাকরুণ। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই—শুনলুম জয়পুরে গেছেন কার্খোপলক্ষে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেচ—তিনিও আসবেন; এবং শরীর সুস্থ থাকলে হস্ত আণ্ডবাবুকেও ধরে আনতে পারব। জান ত, কেউ এঁরা যে-সে লোক নন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে নত করিয়া কহিল, আশীর্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—আসিলেন না শুধু আণ্ডবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মে ব্যাপ্ত। কেহ আলো জালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন্দ্র অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্তে

শেষ প্রশ্ন

কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে। আপনি বাদের লক্ষীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্নাশালায়। আজ আমাদের পর্কদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারের ছেলে উনান জালিতেছিল এবং সেই বয়সের একটি ছেলে বাঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলোটিকে স্নেহের কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্লমুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর দম? ডাল কিংবা ঝোল, কিংবা আর কিছু—

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়াছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমে একটার বেশি হবার নিয়ম নেই।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, হবার যো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এই-ভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী-চাকরও নেই বুঝি?

হরেন্দ্র কহিল, না। তাদের আনলে আলুর দমকে বিদায় দিতে হবে। ছেলেরা সেটা পছন্দ করবে না।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিল না, ছেলে দুটির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই এ-কথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সহিতে পারবেন না। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত—শুধু আপনিই বুঝবেন এর সার্থকতা। তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আপনাকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হরেন্দ্রের গভীর ও গভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের কথা আলাদা, কিন্তু এইসব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

নিষ্ফল দারিদ্র্যচর্চার নাম কি মানুষ-গড়া হরেনবাবু? এরাই বৃষ্টি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন—মিথ্যে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে দেবেন না।

তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল। অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি হরেন।

কমল লজ্জা পাইল, কহিল, আমাকে সত্যিই কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে-কারও মধ্যে আমি নয় কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবে না। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে। দেখি, ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজী বার হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধ-হাস্তের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত। সাবেককালের কারুকার্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিজ্ঞমান। বসিবার জন্ত একখানা বেঞ্চ ও গোটা-চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ তাহাতে বসে না। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে শাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে; মাঝখানে তাঁহারই বাড়ির লতাপাতা-কাটা বারো ডালের শেজ এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ রঙের ফানুসে ঢাকা দেওয়াল-গিরি এক কোণে জলিতেছে; নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্য হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুশি হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ! বাঁচা গেল!

হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, এই ত মুঞ্চিলে ফেললি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েছেন, গুর সম্মুখে কোন-কিছুকে ভাল বলতে সাহস হয় না—হয়ত স্তম্ভিত প্রতিবাদের জোরে এখনি সপ্রমাণ করে দেবেন যে, এর ছাদের নক্সা থেকে মেঝের গালচে পর্য্যন্ত সবই মন্দ। এই বলিয়া তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর কোন সম্বল না থাক কমল, অন্ততঃ বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেছি এ তুমিও মানবে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা আজ বলে রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য

শেষ প্রাণ

মাত্রই সত্য নয় কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিবনাথ শিখিয়েচে, কেবল এইটি দেখি সে শেখাতে বাকি রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ক্রটি হয়েছে মুখ্যোমশাই, তাঁকে জরিমানা করে আমরা তার শোধ দেব। কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়। তাই প্রার্থনা করি তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু-একটা প্রিয় বাক্য বার কর—আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্মই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ণ ফলাটুকু লুকানো ছিল, তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি একপ্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়-কুটা ধূলা-বালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখে মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প একটুখানি নড়া দাঁতের মত, চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেক্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারিনে হরেন, তোমার বোদি নিতান্ত মিথ্যে বলেননি—আমাকে চিনতে ত তাঁর বাকি নেই—ঠিকই জানেন আমার পুঁজি-পাটা সেই সেকলে সোজা ধরণের, তাতে বস্তু থাকলেও রস-কস নেই।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ-কথার মানে সেজদা ?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝবে না। কিন্তু ছোটগিন্নী হঠাৎ যে-রকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন, তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ঠিক আপনার পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্ধায় আরও কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল। ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি। কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম, এ-কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।

নীলিমা বলিল, তা হলে আমার সম্বন্ধে দয়া করে ঠিক স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো, যে, কাউকে ছোটগিন্নী বলে ডাকতে থাকলেই সে সত্যিকার গৃহিণী হয়ে যায় না। তাকে শাসন করার মাত্রা-বোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখ্যোমশায়ের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার-ধরে এইটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক—ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হরেন্দ্র হাত-জোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকি রইল এখন থাক, বাড়ি ফিরে গিয়ে সমাধা করে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। বে ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলাম না, তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘটলো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, অজিতবাবু, শুনলাম কাল নাকি আপনি বাড়ি যাবেন?

কিন্তু আপনি শুনলেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আনতে গিয়েছিলাম, তিনিই বললেন, কাল বোধ হয় আপনি বাড়ি চলে যাচ্ছেন।

অজিত কহিল, বোধ হয়। কিন্তু সে কাল নয় পরশু। এবং বাড়ি কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত বিকেল নাগাদ ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হব—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে-কোন দিকের গাড়ী পাবো তাতেই এ-বারের যাত্রা শুরু করে দেব।

হরেন্দ্র সহাস্তে কহিল, অনেকটা বিবাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আসবার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দেশ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক। কিন্তু তল্লি বইবার লোকের দরকার হয় ত আমি একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেন না।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয় ত আমিও একজনকে দিতে পারি রাঁধতে যার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন, হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।

অবিনাশের কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল না; বলিলেন, হরেন, আর দেরি কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক না। কি বল?

হরেন্দ্র সবিনয়ে কহিল, ছেলেরদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেন না? ছটো উপদেশ তাদের দিবে যাবেন না সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, উপদেশ দিতে ত আমি আসিনি, এসেছিলাম শুধু তাঁদের সঙ্গী হিসাবে। তার বোধ হয় আর দরকার নেই।

শেষ প্রশ্ন

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। দশ-বারো বছরের বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্য্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা, কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই—জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এ-সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটা সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাহাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাভীর্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে পারে আজ এদের সেই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন করব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষ-ভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি কিছু শুনবো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত বক্তৃতা দিতে পারিনে হরেনবাবু!

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ; দেশের কাজে যা তাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে শুধু তাই।

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই তো দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা ত সকলের এক নয়। আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে আমার উপদেশ ত আপনাদের কাজে লাগবে না!

সতীশ মুস্থিলে পড়িল। এ-কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন্দ্র কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হ'ল দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ-সত্য স্বীকার করবে না?

কমল বলিল, না বলতে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বলতুম এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলাবার এবং ভোলাবার এতবড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভববন্ধন থেকে? কোন্টাকে

ধরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ-সেবার আদর্শ?

হরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এ-সব নয়, এ-সব নয়। এ আমাদের কাম্য নয়।

কমল বলিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার কি শিক্ষা ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতা নেই, পরণে জীর্ণ বস্ত্র, মাথায় কক্ক-কেশ, একবেলা অর্দ্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যেই বড় হয়ে উঠছে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্রাজুয়েট তৈরি করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্ম্মের সাধনা, ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্ধ-টা আগে পরিষ্কার হোক।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয় আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন-মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বলছেন। তা যদি হয় সতীশবাবু, আমি নিজে ত ধর্ম্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি, তবুও আমাকে ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলুম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব ত?

সতীশ কথা কহিল না, কেমন একপ্রকার যেন বিব্রত হইয়া উঠিল এবং তাহারই চঞ্চল দৃষ্টির অল্পসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্ত চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের স্থায় নিম্পলকচক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। রঙ অতিশয় ফর্সা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, স্তম্ভের দিকটার এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয় ক্ষুদ্র—অন্ধকার গর্ভ হইতে ইঁদুরের চোখের মত জলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট

শেষ প্রশ্ন

স্বমুখে বুঁকিয়া যেন অন্তরের স্ককঠোর সঙ্কল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয় এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলাই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু—শুধু বন্ধু নয়, ছোট ভাইয়ের মত, রাজেন। এতবড় কৰ্ম্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধু-চিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। বৌদি, এঁর প্রশ্নই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য্য মানুষ! অজিতবাবু, এঁকেই আপনার তল্লি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটা ছেলে আসিয়া খবর দিল, অক্ষয়বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, অক্ষয়বাবু!

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁহে হাঁ—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল, অ্যা! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলে। সামনে দিগ্বে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হ'ল হরি ঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাই না। তাই আসা, তা বেশ।

এ-সকল কথাই কেহ জবাব দিল না, কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই এ-বিখাসও কেহ করিল না। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেও না।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা ত চিনি—ভালই হ'ল যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসংবাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, না, গোপন করবার আর কি আছে। পথের মধ্যে আজ সেই সেলাইয়ের কল বিক্রী-আলা পার্শী বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ী থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া-টতুয়া শেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন—শিবনাথ ত দিব্যি গা-টাকা দিয়েছেন, কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই ত! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে—আশুবাবু আজ পুরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল কাল সকালে লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চলছিল না, আমাদের ত সে-কথা জানালেই হ'ত।

তাহার বলার বর্ষর নির্ভরতায় সকলেই মর্মান্বিত হইল। কমলের লাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্য্যন্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বললেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয়বাবু, আপনি যান এ-বাড়ি থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করিনি—ইচ্ছে করিনি যে আপনি আসেন, তবু এসেছেন। মানুষের ক্রটিগুলিটির কি কোথাও কোন সীমা থাকবে না!

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছল্ ছল্ করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ী সঙ্গে আছে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধ হয় শীঘ্র দেখা হবে না; আমি এখান থেকে যাচ্ছি।

কোথায় এ-কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

১৫

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্তমনস্ক হইয়া ছিল, গাড়ী থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ ত নয়।

অজিত উত্তর দিল, না, এ-পথ নয়।

নয়? তা হলে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরব।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্ত যতটা না হোক, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ঋণকাল মৌন থাকিয়া সে

শেষ প্রশ্ন

আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলার অনুরোধ ত আমি করিনি অজিতবাবু, যে, সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে! ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার—আমার কর্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস করে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণার যদি ভুল করে থাকি কমল?

যদির ওপর ত বিচার চলে না অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তার পরে এর বিচার করব।

অজিত অশ্রুট-স্বরে বলিল, তা হলে বিচারই করুন, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার? সেদিন ত ঠিক এমনি অন্ধকারই ছিল।

হাঁ, এমনি অন্ধকারই ছিল। বলিয়া সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণীহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু!

হঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়িতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে? সেদিন পর্য্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড় অংশ, তার সঙ্গে আপোষ করব আমি কি করে? পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, স্থবির্য যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে। কিন্তু—থাক্ কিন্তু। আমি আজ কি ভাবচি তুমি বুঝতে পার না?

কমল বলিল, মেয়েমানুষ হয়ে এর পরেও বুঝতে পারব না আমি কি এতই নির্বোধ? পথ যখন ভুলেচেন আমি তখনই বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্ছে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সামলাতে পারবো না।

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিশ্বয় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ শান্ত-কণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই অজিতবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আপনি ত শুধু কেবল পুরুষমানুষ নয়, স্ত্রীমানুষও পুরুষমানুষ । এর পর ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি করে ? ততখানি ছোট কাজ ত আপনি পেয়ে উঠবেন না !

অজিত গাঢ়-কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ-আশঙ্কা তুমি কেন করচ কমল ?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্ম করিনে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্ম । পারলে ভয় ছিল না, পারবেন না বলেই ভাবনা । শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এতবড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়ী হয় । আর না, চলুন ফিরে যাই ।

কথাগুলো অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না । চক্কের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল—বক্কের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুক্ত-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পার না কমল ?

মুহূর্তের তরে কমলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, পারি ।

তবে কিসের জন্ম ফিরতে চাও কমল, আমরা চলে যাই ।

চলুন ।

গাড়ী চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছু নেই ?

না । কিন্তু আপনার ?

অজিতকে ভাবিতে হইল । পকেটে হাত দিয়া কহিল, টাকাকড়ি কিছুই সঙ্গে নেই—তার ত দরকার ।

কমল কহিল, গাড়ীখানা বেচে ফেললেই অনায়াসে টাকা পাওয়া যাবে ।

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ী বেচবো ? কিন্তু এ ত আমার নয়—আণ্ডবাবুর ।

কমল কহিল, তাতে কি ? আণ্ডবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ীর নাম কখনও মুখেও আনবেন না । কোন চিন্তা নেই—চলুন ।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল । তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্থলিত হইয়া নীচে পড়িল । বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি আমাকে উপহাস করচ ?

না, সত্যি বলচি ।

সত্যিই বলচ এবং সত্যিই ভাবচ পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি ? এ-কাজ তুমি নিজে পার ?

শেষ প্রশ্ন

কমল বলিল, আমার পারা না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতুম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেছি। না নেই এবং সেজন্য লজ্জা বোধ করিনে। বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাকলেই লজ্জা বোধ করতাম। আর আমার বিশ্বাস সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এই কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশি নয়? শিক্ষিত ভদ্র-মন বলে কি কখনো কিছু দেখেনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন করব যদি সময় আসে, আজ নয়। বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিজ্ঞপ করে বলত যে, কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ত ভদ্র-মনের সঙ্কোচে বাধেনি? আমি কিন্তু তা বলতে পারব না, কারণ কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পার না?

এ ত ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু, আজ কি করে এর জবাব দেব?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবে না। মনে হয়, এই জন্মই শিবনাথের এতবড় নিস্বর্ততাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচ। বলিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ী। পাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমনভাবে গাড়ীগুলো রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক ত বুঝেছিলেন পথ ভুললেই আমাকে তুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এ ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিত-

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বাবু নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন। অমন করে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল ?

না, তা হয় না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার ত' কেবল আপনাকে নিয়েই নয়—তা হলে ত সব গোলই চুকে যেত। এখানে আর দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল বলে দিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা প্রকাশ আর কি আছে বলুন ত ?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয় ? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার অশুশোচনা হয়নি কমল ? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল ?

কমল এ-প্রশ্নের বোধ হয় ঠিকমত উত্তর দিল না, কহিল, বিশ্বাস করা না-করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাইনি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও। কিন্তু ভুলের জন্ত নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে দিক্কার দাওনি ?

না।

তা হলে এইটুকুমাত্র বলতে পারি, তুমি অদ্বুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পর অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এমনি ভুল যদি আবার কালও করে বসি তখনো কি তোমার দেখা পাব ?

কিন্তু যদি উত্তর ত যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু। অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ এ-মোহ আমার কাল পর্য্যন্ত টিকবে না, এই তোমার বিশ্বাস ?

অদ্বুতঃ অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশি করে জানি।

অজিত কহিল, জানলে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে, আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম ; এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিল না।

শেষ প্রশ্ন

কমল কহিল, মিথ্যের কথা ত হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। ও-
দুটো এক বস্তু নয়। আজ মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত
নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চাননি তা জানি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত ত তুমিই হতে কমল। আমার রাত্রে মোহ দিনের আলোতে
কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও ত সঙ্গে যেতে অসম্মত হওনি? একি শুধুই উপহাস?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই করে দেখলেন না কেন? পথ খোলা ছিল,
একবারও ত নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না করে থাকো তবে এই কথাই বলব যে,
তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর
ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন
করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি ত
জানতে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি করে একে
তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্বৃত হয়েছিলে! কমল, কুহেলিকা যত বড় ঘট করেই সূর্যালোক
ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্য্যই ঙ্গব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে শাস্ত-
কণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়, সত্যও নয়। কোন্ আদিম-
কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিচ্যমান আছে। সূর্য্যকে সে
বার বার আবৃত করেচে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য্য ঙ্গব কি-না জানিনে,
কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত ও দুটোই
নিত্যকালের। তেমনি হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়।
ক্ষণকালের সত্য নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতীফুলের আয়ু সূর্য্যমুখীর
মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির
মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলুম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু,
আয়ুক্ষালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এত বড় সত্য?

কথাগুলো যে অজিত বুঝিতে পারিল না তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার
কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি আপনাদের
ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেচি। যা পেয়েচি তার বেশি কেন
পাইনি, এ-নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এমনিই নির্বিচার করে তুলেচ। আচ্ছা,
সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে ।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল ?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে ?

অপরের কথা ! যাই হোক, তবু ত নিশ্চিত হতে পারব, অন্ততঃ আমার ওপর তোমার রাগ নেই ।

কমল কহিল, নিশ্চিত হলেই কি খুশি হবেন ? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েছি, গাড়ী থামান, আমি নেমে যাই ।

গাড়ী থামিল । অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, কাছে আসিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল । অজিত সতয়ে প্রশ্ন করিল, কে ?

আমি রাজেন । আজ হরেন্দার আশ্রমে দেখেচেন ।

ওঃ—রাজেন ? এত রাতে এখানে কেন ?

আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছি । আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ি থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে । বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল ।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু ?

লোকটি কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইন্ফুয়েঞ্জা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্ছে । শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত । হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেছে । আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন ।

রাত এখন কত ?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে ।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব ।

অজিত একটা কথাও কহিল না । কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ী চালাইয়া হরেন্দ্রর বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল । রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ । আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন ।

এ আমার কাজ । প্রয়োজন হলেই সংবাদ দেবেন । বলিয়া সে চলিয়া গেল । ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, শাদা কথায় জানাইয়া গেল এ তাহার কর্তব্যের অন্তর্গত । আজই সন্ধ্যাকালে হরেন্দ্রর মুখে এই ছেলোটের সম্বন্ধে যত-কিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই

শেষ প্রশ্ন

মনে পড়িল। একদিকে তাহার একজামিন পাশ করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তার ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সে অবধি নীরব হইয়াছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেছে শোনার পর কোন-কিছুতে মন দিবার শক্তি আর তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসম্বন্ধ প্রশ্নোত্তরমালার আঘাত অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আত্মোপাস্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশি ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীন মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এ-জগতে মিথ্যা বলার ইহার প্রয়োজন নাই। এ যেন পৃথিবী-স্বল্প সকলকে শুধু বিব্রত ও জঙ্ক করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারো উপস্থিত হইয়াছে সে জানে না। এই মেয়েটিকে তাহার প্রশ্ন করিতেছে মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কমলকে সে ঘৃণা করে। ইহারই লুক্ক আশ্রাসে সে যে আত্মবিশ্বত উন্মাদের গায় মুহূর্তের জগৎ ও জ্ঞান হারাইয়াছে ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয়, এই বলিয়া সে বার বার করিয়া আপনাকে আগনি অভিষাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় পাড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ীর শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হাঁ।

যহু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচ বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন; কহিলেন, এই ঋতু-পরিবর্তনের কালটা এমনিই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম-স্মারাম হঠাৎ যা সুরু হয়েছে, লোক মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভাল নয়, যেন জ্বরভাব করে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের ত অভাব নেই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কে আর আছে বল ? ডাক্তার এসে শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আসতে দেরি হতে লাগল—কমল, মাহুঘের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখতে আছে ? ঝগড়া-ঝগাটি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তিন-চারদিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে' যে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্য্যন্তও ত নাওনি ? ছি, এ-কাজ ভাল হয়নি, এখন একলা তোমাকেই ভুগতে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল এই সরল-চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেন না। সে চুপ করিয়া রহিল ; আশুবাবু তাহার অভিমান শাস্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ি নেই, তখনই বুঝেছি অজিত তোমায় ছাড়েনি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো তো অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে !

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষণ নামিয়া গেল। কোন-কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মাহুঘটির মধ্যে ঢুকিতেই চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। স্নেহে ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই ; জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন ?

আশুবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, হাসপাতালে ? তবেই ত তোমার রাগ এখনো পড়েনি !

রাগের জন্তে বলচিনে আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বলচি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে স্বীকার করি, এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না, উচিত ছিল না। মণি জানতেন চিকিৎসা করবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল, কেবল মনোরমাই নয়, শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারে না, ওষুধ-পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত ভালই হয়েছে যে, খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁছেচে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় স্নান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল—সেবাই সব। যত্নই সবচেয়ে বড় ওষুধ। নইলে ডাক্তার-বন্দি

শেষ প্রশ্ন

উপলক্ষ্যমাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়ায় বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগে ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে। আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহে পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তিতে রোগীর বুকের পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরম্পরসম্বন্ধ দুই হাত লুপ্ত রাখিয়া শিবনাথও স্তম্ভ। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। মুহূর্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

১৬

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্কাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অম্পষ্ট আলোকেও ম্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাখীয়া ভদ্রমহিলার উপযুক্ত সম্বন্ধের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ-বাড়িতে আর ত আপনার একমুহূর্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্তত চলে যাব।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল কহিল, সেই ভাল, আমিও তখনই যাব। আপাততঃ এই চেয়ারটায় বসে থাকি রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝগাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়ন-কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল—ইতিপূর্বেই তাহাকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভাল ছিল না। আজ মনে হচ্ছে যেন—আচ্ছা ব'স অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারিনে, বেশ, গুড বাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্বাস্তঃকরণে আমি আশীর্বাদ করেছি, যেন আমাদের ক্ষমা করে তুমি জীবনে সুখী হতে পার।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্বাক হইয়া গেল। নির্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক-ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এতবড় পরিবর্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখা-চোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারারাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেছে, কত-কি যে ভেবেছি সে আমি কাকে জানাব ?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটার কান দিইনি, ভেবেছিলাম এ তাঁর বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে

শেষ প্রশ্ন

ভালবেসেছিলাম কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে অাগ্রায় যদি আমরা না আসতাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার এক ফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর!

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু!

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু একটা তুমি উপায় করে দাও। আমার বাড়িতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বলে দিয়েছে।

কমল চাহিয়া দেখিল অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চান না, কিন্তু তিনি যে পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাসপাতালে পাঠান, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয় তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন ত চিকিৎসা করবার শক্তি নেই আমার; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করতেই পারি, তার বেশি পারিনি।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল, কেন জানিনে, কিন্তু এমনি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষণ্ড হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্তু ভয় ক'র না, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বলবার দরকার নেই কমল, সে আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি বেঁচে থাকতে এতবড় অত্যাচার তোমার উপরে ঘটতে দেব না।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না।

কি ভাবচ কমল?

ভাবছিলুম আপনাকে বলবার প্রয়োজন আছে কি-না। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রয়োজন আছে, নইলে পরিষ্কার কিছুই হবে না, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে। আপনার

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের জন্ত খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ-ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ করব না।

আগুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেননি, যেমন এখন করতে যাচ্ছেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো, আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আগুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এমনি রাগই হয় বটে কমল; এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অশ্রায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে চাচ্ছি, তোমাকে অনুগ্রহ করচিনে। এ হলে হবে ত?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবে না। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারব না আমার উপায় নেই। ঠুকে হাসপাতালে পাঠাতে না চান হরেনবাবুর আশ্রমে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনারা যা খরচ করবার তা সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। বলিয়া সে যথার্থ-ই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আগুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্ত যা করতে যাচ্ছি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখচ। একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং এ কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাকবে না সে আমি জানি, কিন্তু আমার কণ্ঠা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেইটুকুই আমি চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেমনি করেই আবার ফিরে পাও সেই কামনা করেই এ প্রস্তাব করেছি, নিছক স্বার্থপরতা-বশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, স্কন্ধ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িল না। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে যাচ্ছিলাম আগুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা-বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেছি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ঠুকে আমি

শেষ প্রশ্ন

চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারব না।

তাঁহার মধ্যে উন্মাদও নাই উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই শাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন শুরু করিয়া দিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে কহিলেন, এ কি কথা কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ-শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল।

আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ-শিক্ষা তোমাকে যে-ই কেন না দিয়ে থাক, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অত্মায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাংলাদেশেরই মেয়ে, এ-পথ তোমার আমার নয়, এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জান কমল, এক দেশের ধর্ম আর এক দেশের অধর্ম। আর স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল সে লেশমাত্র বিচলিত হইল না।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন-কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বার বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেচ কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্ত, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের পানে একবার ফিরে চাও। পূর্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখে এসেছি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্কবাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি হ'ত! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে ত— উঃ, শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা! এই বলিয়া তিনি স্বর্গতঃ মনীষিগণের উদ্দেশ্যে যুক্ত-করে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধ-চক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাঁহার সংজ্ঞা নাই—এমনি অবস্থা।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এইজন্মই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

শুধু কেবল এইজন্মই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এইজন্তই বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলে-
ছিলেন—তাই।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জলে, যদি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হয়,
তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাকতে হবে? সেই হবে
দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে
লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম, দেশের পুরাণ ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার,
রীতি-নীতি যা বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা
ফিরে এসেচে এ ত শুধু তাঁদেরই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ফল। জাতি হিসাবে আমরা
ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম, কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে
আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাব না, এ বোধশক্তি আমাদের
দিলে কে বল ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া কহিল, এ-সব চিন্তাও যে আপনার মনে
স্থান পেতে পারে এ কখনো আমি কল্পনাও করিনি। আমার ভারি দুঃখ যে এতকাল
আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে
আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া
জানাইল যে, হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন এবং পরক্ষণেই সে সতীশ
ও রাজেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। কহিল, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু
যুমোছেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়িটা অমনি ঘুরে এলাম; তাঁর বিশ্বাস
অল্পখ সিরিয়স্ নয়, শীঘ্রই সে উঠবেন। এই বলিয়া সে কমলকে একটা নমস্কার
করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিল।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি এবং
তাঁহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেচে এ
তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছ থেকে দেখা যায় না, যার
শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি শিক্ষিত-মনের পরিবর্তন।
এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছড়াবার আয়োজন, এ
কি শুধু এইজন্তই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। সেই ব্রহ্মচর্যা,
সেই সংযম-সাধনা, সেই পুরানো রীতি-নীতির প্রবর্তন—এ-সবই কি আমাদের সেই
অতীত দিনটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নয়? তাই যদি তুলি, তাহাই প্রতি যদি আস্থা
হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকি থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ

শেষ প্রশ্ন

কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে ধারা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে নতশিরে নিতে পারলেই হ'ল আমাদের চরম সার্থকতা। এই আমাদের কল্যাণের পথ কমল, এ-ছাড়া আর পথ নেই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রের বিশ্বয়ের পরিসীমা নাই—এই সাহেবী চাল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না, অকস্মাৎ কিসের জন্ম আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা! সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বস্তার নিজের বিশ্বয়ও কম ছিল না। শুধু বলিবার শক্তির জন্মই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার স্মযোগও তিনি কখনও পান নাই—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্কচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্ম ক্ষণকাল পূর্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখাননি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয়ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালই যে হবে প্রমাণ কি আশুবাবু? কই সে ত বলেননি?

বলিনি কি রকম?

না, বলেননি। যা বলছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবকমাত্রই ঠিক এমনি করে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধারমাত্রই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্মে কেউ শক্তি ক্ষয় করে না।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতনমাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাল মনে করে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলতে চেয়েছিলুম আশুবাবু, কিন্তু আপনি

কান দেননি। লৌকিক আচার-অমুঠানই হোক বা পারলৌকিক ধর্ম-কর্মই হোক, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্ৰীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশি করা যায় না; তিনি ক্ষুধা হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি বল কি কমল? দেশের ধর্ম, দেশের আচার-অমুঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকি থাকবে কি? জগতে মানুষ বলে দাবি জানাতে যাব কোন্ পরিচয়ে?

কমল কহিল, দাবি আপনি এসে ঘরে পৌঁছবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে ত বুঝতে পারলাম না কমল!

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এমনিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানব-চিত্তের পদে পদে যে সত্য নিত্য নূতনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিনতে পারা যাবে না। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে! কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়, এমনিভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝোড়ো-হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছে। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরন্তরে বিহ্বলের ছায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না। শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল, এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণধণ্ডের ছায় তাঁহার সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গেছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে করে এনেছিলেন, চলুন না পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেনের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু, তুমি চল না ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে কহিল, চলুন।

শেষ প্রশ্ন

ঘরের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ সৰ্ত্তে ইচ্ছে হয় পাঠিয়ে দেবেন, আমি যথাসাধ্য করে দেখব। বাঁচেন ভালই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে শুকু হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন—অসুস্থ গৃহস্থামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্য্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

অর্ধেক পথে রাজেন বিদায় হইল। বলিয়া গেল ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্তমনস্কতাবশতঃই বোধ করি আপত্তি করিল না, কিংবা হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ-জাতীয় দাসীটি তাহার কাজ-কর্ম করিয়া দিত সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদীর দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্মে নিযুক্ত হইল। একরকম কাল হইতেই সে অভুক্ত; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাখিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্বাসের তাহার একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয় না। চারিদিকে এত যে আবর্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল, সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল—ছাদের পুরানো চুণ-বালি খসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই; চড়াই পাখীর বাসা-তৈরির অতিরিক্ত মাল-মসলা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদর বদলানো প্রয়োজন; বালিসের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার; চেয়ার টেবিল স্থানভ্রষ্ট, দরজার পা-পোষটায় কাদা জমাট রাখিয়াছে, আয়নাটার এমনি অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে, দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলমগুলো খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলার চিহ্নমাত্র নাই—এমনিধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিল না। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলা-মাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবে বা কোথা

হইতে ? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই সে কেমন করিয়া ঘেন নাগাল পাইতেছিল না—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না ।

গৃহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্ত যে এত খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ কি ইহার প্রয়োজন হইল, এমনি একটা খোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্য-চক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যে ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল । এমনি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই শেষ হইয়াছে । কিন্তু বেলা ত রোজই শেষ হয়, শুধু এমনি করিয়াই হইতে পায় না । সন্ধ্যার পর সে আলো জালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্তই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উন্টাইতে বসিল । কিন্তু শান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিল না—কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না । যখন টের পাইল তখন ঘরের আলো নিবিয়াছে এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অরণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে । বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না । অতএব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল ।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন ? আসতে পারি ?

আসুন ।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র । চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিল, কোথাও বেরুচ্ছিলেন না-কি ?

হাঁ । যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অসুখের খবর পেয়েছি । তাকে দেখতে যাচ্ছিলুম ।

বেশ খবর । ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয় । আগ্রাতেও এপিডেমিক কর্মেই বোধ করি শুরু হ'ল । বস্তীগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেছে । মথুরা-বৃন্দাবনের মত শুরু হলে পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে । এ বুড়ী থাকে কোথায় ?

ঠিক জানিনে । শুনেছি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ করে নিতে হবে ।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন । এ-দিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয় ?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না ।

শেষ প্রশ্ন

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেননি, গুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আণ্ডবাবু বিছানা নিয়েছেন সে ত কাল দেখেই এসেছেন—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জর, বৌদির মুখটিও দেখলাম শুকনো শুকনো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ-সকল খবরে সে যেন ভাল করিয়া মন দিতেই পারিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এ-ছাড়া শিবনাথবাবু। ইন্ফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার—বলা কিছু যায় না। অথচ হাসপাতালে যেতেও চাইলে না। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হ'ল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে ?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জন-কয়েক পাঞ্জাবী আছে—ঠিকাদারী করে। গুনলাম তারা লোক ভাল।

কমল নিখাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেনবাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন ?

পারি, কিন্তু তাকে পাব কোথায় ? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐ-দিকের কোন্ একটা মুচীদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে ত খবর দেব।

তাঁকে রিমুভ করলে কে ? আপনি ?

না, রাজেন। তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্ছে। তবে তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েছে তখন সহজে ক্রটি হতে দেবে না—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা—ওকে রোগে ধরে না। পুলিশে না ধরলে ও একাই একশ। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জর, নইলে ওকে কাবু করে ছুনিয়ায় এমন ত কিছুই দেখলাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি ?

আশা ত করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তা হলে বাঁচে।

ওকে চলে যেতে বলে দেন না কেন ?

ঐটি শক্ত। বললে এমনি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবে না।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

কৃতি ? ওকে ত জানেন না, না জানলে সে কৃতির পরিমাণ বোঝা যায় না। আশ্রম না থাকে সেও সহবে, কিন্তু ও-কৃতি আমার সহবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিট-খানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদলাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেচে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনা করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম, ব্যাপার কি ? অসুখ বাড়ল নাকি ? না, সে-সব কিছু নয়, বাত্ম-বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রমবাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে—আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন এই তাঁর পণ, এর আর নড়-চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হ'ল ভেতরে কি একটা গোলমাল আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বললেন, সঙ্কল্প অতিশয় সাধু, কিন্তু ভারতে আশ্রমের ত অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ-বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিন-কতক টিকতে পারতাম। আমাকে দেখি তল্লি বাঁধতে হ'ল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আসি। ভাবি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বলব কি।

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত প্রকাশে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে যে সর্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার নাই। কিন্তু একটা কথাও সে উত্তর করিল না, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্মান্বিত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ি থেকে বিদেয় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ ইচ্ছা ছিল না, শিবনাথ তাঁর গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলে না। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শুনলেন কার কাছে ? রাজেন বললে ?

সে ? সে পাত্রই ও নয়। জানলেও বলবে না। এ আমার অহুমান। তাই ভাবি, মিটমাট ত হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি ? চুপচাপ থাকাই ভাল। যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ক্রটি হবে না।

শেষ প্রশ্ন

কমল কহিল, সেই ভাল।

হরেন কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজদার জগ্গেই ভাবনা, ভারি অগ্নে কাতর হন। সময় পাই ত কাল একবার আসব।

আসবেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেনকে পাঠাতে তুলবেন না। বলবেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিশ্বয়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলো তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে বলা যায় না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।

দেব, নিশ্চয় দেব, বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নবেলায় রাজেন আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা দেব। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও ধসল?

বেশ ত হালকা হয়ে গেল। না চাও ত বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয় না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারি করে তুলতে আমার লজ্জা করে। আপনি বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী। তা যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার স্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল, কহিল, অমন কথা বলতে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো ক'রো না।

কিন্তু এ অমুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিল না, সে স্মিতমুখে সহজভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্ম নয়, বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝিনে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু কি কাজে লাগবে তাই ভাবচি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমলের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী ও প্রথর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা ; তাহার দৃষ্ট তেজ অপরাঙ্ক, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভাগ করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে ভুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচ ?

রাজেন বলিল, গুরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন ?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমার স্মরণ-শক্তি বড় খারাপ, কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বলচ ?

সত্যিই বলচি।

কমল জেরা করিল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কোতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল। 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে কেন সে গ্রহণ করে নাই, 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজও নারী-মূর্তির ছায়া পড়ে নাই—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুক্কাত তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন জান ?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অন্তিম ঝাঁক ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ঝাঁক ছিল না। সবাই সন্দেহ করে নানা কথা কইলে, বললে, এ-বিবাহ পাকা হ'ল না। আমার কিন্তু ভয় হ'ল না, বললুম, হোক গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েচে তখন বাইরের গ্রহিতে ক'পাক পড়ল আমার দেখবার দরকার নেই। বরঞ্চ ভাবলুম এ ভালই হ'ল যে, স্বামী বলে যাকে নিলুম তাঁকে আঠে-পৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক না। মনই যদি দেউলে হয়,

শেষ প্রশ্ন

পুরুতের মস্তকে মহাজন খাড়া করে স্তূপটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল।
কিন্তু এ-সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝবে না।

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনি যে
তঁার টাঁকার লোভটা এত ছিল। জানলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতেও পারতুম।

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে ?

কমল সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক্ গে মানে। এ তোমার
শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বাহিরের সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল।
কমল আলো জালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া
কহিল, তা হোক, আমাকে ওর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি করবেন গিয়ে ?

নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাকব। না হয়, তোমার
ওপরে তঁার ভার রেখে আমি নিশ্চিত হব। এইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম।
তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তঁার প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই।
বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ, চলুন। আমি একটা গাড়ী ডেকে আনি গে। বলিয়া সে
বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ
করে আপনি নিশ্চিত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম। কিন্তু এখানে আমার
থাকা চলবে না, শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ
করেচে ?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে—সেজন্য নয়।

কমল হরেন্দ্রর কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এরা বুঝি তোমাকে
চলে যেতে বলচেন ? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যারা এমন আতঙ্কিত, ঘটনা করে তঁাদের
দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে
কেন ? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবে না।

রাজেন কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং ; কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে
ভুলব না। কিন্তু এ দৌরাণ্ডে ভয় পায় না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল।
থাকলে দেশের সমস্তা চের সহজ হয়ে যেত।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একটুখানি খামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সেজন্ত নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যাই হোক, আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আসবে না।

তবে যাবে কেন ?

যাব নিজেরই জন্ত। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবে না।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন ? মন যেখানে মিলেচে, থাক না সেখানে মতের অমিল। হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন ; কি যায় আসে তাতে ? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে এ কেন ? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল ত সে কিসের শিক্ষা ? মত এবং কর্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্ত কায়্যা ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

হাসলে যে ?

হাসলাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলনটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অল্পটানে গরমিলটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে ?

রাজেন বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য্য এবং মহত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়্যা, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।

একটুখানি খামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন ? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।

শেষ প্রণয়

কমল অতি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল। রাজেন বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারের সর্বনাশ করিনে—বন্ধুর হলেও না—তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বল ?

রাজেন কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে, মতের অমিলে বাধা যদি আমার কর্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই শিবানি—

কমল আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ ?

শুনেচি। কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুজনের মনের মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের শক্তিটাই রাজার শক্তি, হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছ্বলতারই নামান্তর।—গাড়োয়ান, রোকো রোকো—শিবানি, এই তাঁর বাসা।

সন্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্পালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

১৭

চাম্রিদিকে চাহিয়া কমল শুক্ক হইয়া রহিল। ঘরের এ কি চেহারা! এখানে যে মানুষ বাস করিয়া আছে সহজে প্রত্যয় হয় না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো-আঠারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল; রাজেন তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবানাথবাবুর চাকর। পথ্য তৈরি করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত এরই ডিউটি। সূর্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমোতে শুরু করেছিল, এখন উঠে আসচে।

১৪৭

রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে ত একেই দিন, বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাৎ বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে ?

ফাগুয়া।

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি ?

ছেলেটি বা হাতের দুটো আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া ?

হ—হুধ ভি পিলায়া।

বহুৎ আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবী বাবুরা কেউ এসেছিল ?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়ের দো পহরমে একঠো গাবু আয়া রহা।

শায়ের ? তখন তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে ?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফাগুয়া, তোর এখানে ঝাড়ুটাছু কিছু আছে ?

ফাগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল ; রাজেন কহিল, ঝাঁটা কি করবেন ? ওকে পিটবেন না কি ?

কমল গভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাসার সময় ? মায়ী-মমতা কি তোমার শরীরে নেই ?

আগে ছিল। ফ্লাড্ আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জন দিয়ে এসেছি।

ফাগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসি গে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটাকে নিয়ে যা পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব। ভয় পাবেন না, আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরব। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

সহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সংবাদ লইতে কেহ আসিল না। বাহিন্বে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝের কমল পাতিয়া ফাগুয়া বিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইক্লের ঘণ্টা শুনা গেল এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে

শেষ প্রশ্ন

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল, পরে হাতের ছোট পুটুলিটা পাশের টিপায়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অগ্ন্যাগ্ন মেয়েদের মত আপনাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনার পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন কহিল, ইতিমধ্যে দেখিচি বিছানাটা পর্যন্ত বদলে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জানলে শক্ত নয়।

কিন্তু জানলেন কি করে? জানবার ত কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই? ছেলেবেলায় চা-বাগানে আমি অনেক ঝগীর সেবা করেচি।

তাই ত বলি! এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আসবার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বসচি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা ত তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?

রাজেন বলিল, খেয়াল হঠাৎই হ'ল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হ'ল আপনারও হয়ত ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। আসবার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি করবেন না, বসে যান। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজোটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ-বাড়ির কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া একটুকরা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি ভাল টেলে দিচ্ছি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারও এমনি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারব না ভাই। তুমি হয়ত জান না যে আমি নিজে রন্ধে খাই, আর এইসব দামী ভাল ভাল খাবারও খাইনে। আমার জন্ম ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অগ্ন্যাগ্ন দিন যেমন হয়, তেমনি বাসায় ফিরে গিয়েই খাব।

তা হলে আর রাত না করে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে দিয়ে আসিগে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তুমি এখানেই আবার আসবে ?

আসব ।

কতক্ষণ থাকবে ?

অস্তুতঃ কাল সকাল পর্য্যন্ত । ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না করে নড়ব না । একটু ক্লান্ত, তা হোক । এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি । উঠুন, এদিকে গাড়ী পাওয়া যাবে না, হাঁটতে হবে । ফেরবার পথে মুচীদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার । ছ'ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে ?

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ-লোকটার অমুভূতি বলিয়া কোন বালাই নাই । অনেকটা যন্ত্রের মত । কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্শ্বে নিযুক্ত করে—কর্শ্ব করিয়া যায় । নিজের জন্ম নয়, হয়ত কোন-কিছু আশা করিয়াও নয় । কাজ ইহার রক্তের মধ্যে, সমস্ত দেহের মধ্যে জল-বায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে । অথচ অন্নের বিশ্বয়ের অবধি থাকে না, ভাবে, কেমন করিয়া এমন হয় । জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজে ত ডাক্তার ?

ডাক্তার ? না । ওদের ডাক্তারি-স্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবিশ করেছিলাম ।

তা হলে ওদের দেখে কে ?

যম ।

তবে তুমি কর কি ?

আমি করি তাঁর তদ্বির । তাঁর গুণমুগ্ধ পরম ভক্ত আমি । এই বলিয়া সে কমলের বিশ্বয়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ । বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন । রাজাই বটে । যেমন দয়া, তেমনি স্মবিবেচনা । বিশ্ব-ভুবনে সৃষ্টিকর্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা-সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বলতে পারি ।

কমল আশ্চর্যে আশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস করচ রাজেন ?

একেবারে না । শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে, বলেন আমাকে সিনিক্, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছতা, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতার অল্পশত্রু শানিয়ে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন । অতএব মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি । কিন্তু তা করিনে । ছুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যান না, গেলে আমার ধারণা—আমারই মত পরম রাজভক্ত হয়ে

শেষ প্রশ্ন

উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে মৃত্যু-রাজার গুণগান করতেন এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গালি দিয়ে আর বেড়াতেন না।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয় তোমাকে সিনিক্ বলাটা কি দোষের ?

দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায় ? গড়া গড়া পড়ে আছে—আজকের ইনফ্রুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হ'ল। ওষুধ নেই, পথ্য নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায় ? তখনি কুল দেখতে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি ভয় নেই, ওরে ভয় নেই—সমস্তা যতই গুরুতর হোক, সমাধান করবার ভার যার হাতে তিনি এলেন বলে। অন্ত্যস্ত দেশের অন্ত্যস্ত ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমির সমস্ত ভার নিয়েচেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা ঢের বেশি সৌভাগ্যবান। কিন্তু কোথা থেকে কি-সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

কিন্তু তোমাকে ত আবার এই পথটা হেঁটেই ফিরতে হবে ?

তা হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কত দূরে ?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা হলে তোমার পা-গাড়ী করে ঘুরে এসো গে—আমি বসচি।

রাজেন বিশ্বাসাপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা ! আপনার যে দুদিন ধাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ ধবর ?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু ধবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আসবার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুত, পাত্রটির চেহারা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ দিন-দুই চলেচে নিছক উপবাস। অতএব হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ ? কমল একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু আমার জন্ত তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

তা জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সংবাদ পেলে আপনাকে জানাব।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়৷ কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা ক'রো না । পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেচেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন । কিন্তু আমি তোমাকে চিনি । স্মৃতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার । অথচ তার জন্ম সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করে হবে না । একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতি দরিদ্রের যা আহাৰ—সেই একমুঠো ভাত-ডাল । কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতেও পারি । কিন্তু দিন-দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি করব না । তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলব না, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারব না রাজেন । তাই বলে রাগ ক'রো না যেন ।

না ।

কি ভাবচ বল ত ?

ভাবচি, পরিচয়-পাত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হ'ল না । আমি দেখচি সহজে ভুলতে পারব না ।

সহজে ভুলতেই বা আমি তোমাকে দেব কেন ? বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল । কহিল, কিন্তু আর দেরি ক'রো না, যাও । যত শীঘ্র পার ফিরে এস । ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কঞ্চল পেতে রাখব—দু-চার ঘণ্টা ঘুমোবোর পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাব, কেমন ?

রাজেন মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা । ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে । কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর গুশ্ৰমার ভার নিজের হাতেই নিলেন । ভালই । ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন ।

কমল বলিল, না । কিন্তু এই লোকটি যে আমার স্বামী এ-খবর তোমাকে দিলে কে ? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি ? যে-ই দিয়ে থাক, সে তামাসা করেছে । বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞাসা করলেই খবর পাবে ।

রাজেন কোন কথা কহিল না । নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল ।

শিবনাথ ঠিক যেন এইজন্মই অপেক্ষা করিয়া ছিল । পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে ?

শুনিয়া কমল চমকিত হইল । কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই । চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক ; অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন ভাব থাকে তাহার অধিক

শেষ প্রশ্ন

নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানি? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেচেন?

হাঁ। আমাকেও এনেচেন এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েচেন, তিনি।

নাম?

রাজেন।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়িতে থাকো?

সেই চেষ্টাই ত করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হঁ। ওকে এখানে এনেচ কেন?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিল না। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই এ-কথা তুমি কার মুখে শুনলে? আমি বলেচি, এই কি লোকেরা বলে নাকি?

কমল ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি তুমি ত করতে? চলে আসবার সময় এ-কথাটা বলে এলে না কেন? তোমাকে আটকাতে পারি, কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি, এই কি তুমি ভেবেছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয় সে ত ভাল করেই জানতে; তবে কেন করনি তা?

শিবনাথ কয়েকমুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের ঝগাটে, ব্যবসার খাতিরে দিন-কতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি ত ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্ থাক্, ও আমি জানতে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শাস্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যিই অসুখ করেছিল?

সত্যি না ত কি?

সত্যি যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়িতে গেলে কিসের জন্ত? তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েচে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের এক-শেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

জানাটাই আমার সাধনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সহজে পারলুম, নইলে পারতুম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জান তুমি, আমার সব সহিল কিন্তু তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সহিল না। তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জগু আমি কৃতজ্ঞ শিবানি।

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকো না, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়, তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটাই সবচেয়ে ভালবাসতে! বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও তাহার কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেমনিই নির্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাবচ বল ত শিবানি?

কি ভাবচি জান? ভাবচি, মানুষ কত বড় পাষণ্ড হলে তবে এ-কথা মনে করে দিতে পারে!

শিবনাথের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানি। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জানতে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাকবে না। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেচি—

কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়া করার কারণ ত আমি একবারও জিজ্ঞেসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলুম, এ-কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসনি কেন? তোমাকে একদিনের জগুও আমি ধরে রাখতুম না।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানি।

কেন?

শিবনাথ আমার হাতায় চোখ মুছিয়া; বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হতে লাগল—পাথর কিনতে, চালান দিতে ষ্টেশনের কাছে একটা কিছু—

শেষ প্রশ্ন

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্ম আর দুঃখ হয় না, হয় আর একজনের জন্ম। কিন্তু আজ তোমার জন্মও দুঃখ হইতে শিবনাথবাবু।

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, জ্ঞান, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন করে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা হবার তা ত হয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা ক'রো, হয়ত সুখী হতেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলো না। তোমার ভাল হোক, ভূমি ভাল থাকো, এ আমি আজও সত্যি-সত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।

বাহিরে পা-গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্বার পাশ ফিরিয়া গুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন চাপা-গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি! রুগী কেমন? ওষুধ-টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়ানিনি।

রাজেন অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কহিল, চুপ। ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সেটা ভাল না।

না। কিন্তু তোমার মুচীরী করলে কি?

তারা লোক ভাল, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যমরাজের মহিষ এসে আত্মা দুটো নিয়ে গেছে, সকালে ধড় দুটো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের হাবালা করে দিতে পারলেই ধালাস। আরও গোটা-আষ্টেক গুণচে, কাল একবার দেখিয়ে আনব। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কবলের বিছানা কই? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচলাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন গুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটো-ছুটিতে ঘেমে গেছি—একটা পাখা-টাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তাহার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস করচি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্ম দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সবদিকেই সুখবর। বলিয়া সে চোখ বুজিল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা' অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে শুরু করিল; আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না; রোগে গুঞ্জনা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। সহর ও পল্লী সর্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্তথা ঘটিল না—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রাচীন নগরীর মূর্ত্তি যেন দিন-কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদীতীর শূন্যপ্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব-বাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোনদিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর-দ্বারের চেহারা পর্য্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন সহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়—যেন আপনি হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয়; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই 'জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যে মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই—কখনও কথা হইয়াছে, কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ-কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচীদের পাড়ার লোক আর বেশি নাই। যত বা মরিয়াছে তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্ত রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিতেছিল। ছেলেবয়সে চা-বাগানে সে পীড়িত কুলীদের সেবা করিয়াছিল সেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু দিন দুই-তিনেই বুঝিল সে-সম্বল এখানে চলে না। মুচীদের সে কি অবস্থা! ভাষায়

শেষ প্রশ্ন

বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্বাঙ্গে কাঁটা উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই এবং আবর্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্বে কমল জানিত না। অথচ এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিল না। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও নূন নয়, জগতে কোন-কিছুকেই সে ভয় করে না, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল ইহারও সীমা আছে। দিন-কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাকালে রাজেন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বার বার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সামলে দিয়ে গেলেন! কিন্তু আর আবশ্যক নেই—আপনি দিনকতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধতে পারবে না।

আর তুমি ?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমিও পালাব। নইলে কি মরব বলতে চান ?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ-কয়দিন একেবারেই বাসায় আসিতে পারে নাই। রাখিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতে হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক জায়গায় ফিরিতে হবে না মনে করিয়া কমল একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। আসিবার সময়ে সে রাজেনের খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতেই হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্যাশ্রমও বন্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন্দ্র নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অমুখের জন্ত। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ-ছ দিন রোজ আসচি, আপনাকে ধরতে পারিনে। কোথায় ছিলেন ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল মুচীদেব পন্নীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, সেখানে ? সেখানে ত ভয়ানক লোক মরচে শুনতে পাই। এ মতলব আপনাকে দিলে কে ? যে-ই দিয়ে থাক্ কাজটা ভাল করেনি।

কেন ?

কেন কি ? সেখানে যাওয়া মানে ত প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ আমরা ত ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্ত্র গেছেন। অবশ্য দিন-কয়েকের জন্ত—নইলে বাসাটা রেখে যেতেন না—আচ্ছা রাজেনের খবর কিছু জানেন ? সে কি সহরে আছে, না আর কোথাও চলে গেছে ? হঠাৎ এমন ডুব মেরেচে যে কোন সন্ধান পাবার যো নেই।

তঁাকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন ?

না, প্রয়োজন বলতে সচরাচর লোক যা বোঝে তা নেই। তবু প্রয়োজন বটে। কারণ আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি ত একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকে না। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ি থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরিয়ে গিয়ে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু অন্ত্রায় কৌতুহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ি নয়, আমাদের আশ্রম। সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয় না। বেশ, আমি চললাম। তাকে পূর্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেছি, এবারও বার করতে পারব, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল, তঁাকে ঢেকে যে রাখব হরেনবাবু, রাখতে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচে আপনি মনে করেন ?

হরেন্দ্র নিজেও হাসিল, কিন্তু সে-হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ-প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেক আছেন। তাঁরা কি বলবেন জানেন ? বলবেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহু প্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা, ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আলোচনার দ্বারা একটা মোকবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্কর্ষ করতে আমি আসিনি, কারণ, সংসারে যত লোক আপনাকে বথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

শেষ প্রশ্ন

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই ত আপনার মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য্য কথাটাই আমি নিজেকে নিজে বারংবার জিজ্ঞেস করি।

কোন উত্তর পান না?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাব। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি, কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি—ভালো কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সংবাদ ত আগেই দিয়েছেন।

হরেন্দ্র বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায় স্মৃষ্টি এসে দাঁড়াল যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়। এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচি, আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মামলা রুজু করেছে। এর বিচারক কোথায় মিলবে, কবে মিলবে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন করে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই সে অনুভব করলে না, তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা বড় কাজ নাকি? দু-কান-কাটার গল্প শোনেননি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেননি, কিন্তু আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলা-ধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই; কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু?

হরেন্দ্র এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি করে জানলেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাবত। অথচ আমি জানি তা সত্য নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার পরেই নির্ভর করে না—জগতের কাছে তার প্রমাণ কই?

হরেন্দ্র এ-প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবই শুনেছেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে-বিষয়ে আপনি নির্ঝাঁক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

লোকের চোখের স্মৃথে সকলকে উপেক্ষা করে ঘটে চলেচে এই হয়েছে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা আমি এত বেশি পাইনি যে, অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন অনেক জেনেছেন, তেমনি এটাও জেনে রাখুন যে, অক্ষয়বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার নয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত-কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। ধানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয় না এ ত আমি বলিনি হরেনবাবু; আমি বলেছি, এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয়বাবুর সম্বন্ধে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহু স্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রুঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক, ও শ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। শুধু আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াইনে আমার এই সাহসটুকুই আপনাদের সমাদর লাভ করেছে। এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে, এর জন্তই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আসছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, বাহবা যদি দিয়েই থাকি সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ-কথা ত বলিনি। আমি বলছিলুম এ-বস্তু সংসারে দুর্লভ এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখতে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পারলাম না। আপনার অনেক কথাই অনেক সময়ে হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন তাদেরও ডিঙিয়ে গেল। মনে হচ্ছে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কার জবাব কাঁকে দিয়ে যাচ্ছেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতুম না। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলুম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেন না, কিন্তু তার সম্বন্ধে তুলনা

শেষ প্রশ্ন

করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রথর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং সমস্ত মুখের পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে, কমলের সে মূর্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না যে, অল্পদৃষ্টি আর কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কমল এইসকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ এবং এইজন্তই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্শ্বদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন—ভাল কথা, শুনেচেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন ?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা সর্ভ ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে বেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। না না, চুক্তি-পত্রে লেখাপড়া করে নয়, এমনিই।

হরেন্দ্র কহিল, ক্রুট।

কমল কহিল, সে ত আপনার বন্ধু অক্ষয়বাবু। শিবনাথ গুণী মাহুদ, তার বিরুদ্ধে আমার কিন্তু নিজের খুব বেশি নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি ? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার ত আর আপীল কোর্ট মেলে না।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেন না ?

কমল কহিল, একে ত আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিল না, আর থাকলেই বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি ? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশি বাজে। এই বলিয়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবচেন সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আনতে পারচি, হলে পারতুম না। হলেও পারতুম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতুম না। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ-দেহে সংলগ্ন হয়ে থাকত এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরা তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ-জীবন কাটত। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এমনিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখতে চাইত, জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্য্যন্ত উপড়ে ফেলতে

হ'ত। তার ভয়ঙ্কর মূর্তি কল্পনায় আঁকতে পারে এমন কেউ নেই? এ সম্ভাবনা ভাবাও যায় না।

কমল বলিল, যায় এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। একদিনের একটা অমুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুল-চুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনিই অধিক, আর সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে তাকে জাল বলে মানি কি করে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দশায় হরেন্দ্রের মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল; বিরুদ্ধ-আলোচনায় সহজে যোগ দিত না এবং বিপক্ষ দল যখন নানাবিধ সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে তাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ আচরণ ও তেমনি নিলজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন দিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথায় একটা নিগূঢ় রহস্য আছে একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিক্রম করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী-সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই। আপনারা নিতেও পারেন না, ফেলতেও চান না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতি চোখা চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূতগ্রস্ত করে রেখেছে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা নয় হে অক্ষয়, পূর্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান-হুই-তিন ইংরাজি তর্জমার বই পড়লে জানা যায়। বুলির জৌলস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জৌলস? কমলের রূপের? অবিনাশবাবু, হরেন অবিবাহিত ছোকরা—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েছে এই আশ্চর্য্য। এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলোয়ার আলো অবিনাশ-বাবু, পচা পাকের মধ্যে এর জন্ম। পাকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ-সব ভোলাতে পারে না—সে আসল-নকল চেনে।

শেষ প্রশ্ন

আগুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয়বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাব, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করব না।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনি হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতে চাইনে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করে বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধুলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা কর গে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্ত ভাবতে হবে না। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতেন এবং নির্মল চাপা-হাসিতে আগুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাঁহারও আস্থা ছিল না, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যন্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি-তর্ক চলে না, তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায় না। এই বলিয়া সে অপর দুজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্ন দেন কি বলে? এতবড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিতও যেন ভারি একটা পরিহাসের ব্যাপার।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিতেন, না না, প্রশ্ন দেব কেন, কিন্তু জানই ত অক্ষয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ডজ্ঞান ওর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা ত দেখতে পাওয়া যায় না সেজদা, নইলে হাসি-তামাসা কম লোকের মুখেই শোভা পেত। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েচেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওয়ার লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাকে লোক-চক্ষে ছোট করতে চাননি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? শিবনাথ তার ভালবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইল না। এই ত আপনাদের স্বণার মূলধন! একে ভাঙ্গিয়ে যতকাল চালানো যায় চালান, আমি বিদায় নিলুম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় স্মৃষ্টি ছিল যে, কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ-কথা ব্যক্ত হইবে যে, শৈব-

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারণিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায় সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র, অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী-নির্বিশেষে সকলের পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল—এইজন্তেই দেশের ও দেশের কল্যাণে সকল প্রকার মঙ্গল অমুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, এই যে তাহার অকুপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া, এ-সকলের মূলেই ছিল ঐ একটিমাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি প্রদীপিত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে আজ তাহার মুখের পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম, নীতি, আচার, ইহার স্বাভাব্য ও বৈশিষ্ট্য, সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ স্মর্দীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতায় ইহার ব্যক্তিক্রম-গুলাকেও সে অস্বীকার করিত না; কিন্তু এমন স্পর্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলমন্ত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিল না, এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, একথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রের মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, শুধু স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেজন্তে এসেছিলেন তার ত কিছু করলেন না।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে ?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয় ? সত্যি বলবেন ?

হরেন্দ্র বলিল, যদিও হয় আমি কখনও যোগ দিইনে। সে পুলিশের জিন্মায় না থাকলেই আমার যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে ?

কিন্তু আপনি ত সে-সব কিছু মানেন না।

অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ মানতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। কিন্তু বন্ধকে শুধু জানলে হয় না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

শেষ প্রশ্ন

বাহুল্য মনে করি। বহুদিনের বহু কাজে-কর্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেচি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিক্রটি সে থাক, আমি নিশ্চিত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্রণকাল চূপ করিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্তদিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে না। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে রাখতে নেই, ঠকতে হয়।

কথাগুলো যে শুধু তব্ব হিসাবেই কমল বলে নাই, কি একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন্দ্র তাহা অনুমান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকেও স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইল না। রাজেনের প্রশ্নটা বন্ধ করিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেচি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যিই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা ?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক তার আমি একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত ?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্বেই মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চূপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবে না, এই জোরে সে তার মৃত বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেছে, নিজের রুখা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্বনাশ করেছে। আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানে না যে ছুনিয়ায় এই-ই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে।

কমল সহাস্ত কৌতুকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেছেন ? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন ? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

প্রস্তাবটা হরেন্দ্রর কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিল না। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল-মত নির্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও ত হতে পারে না। আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও ত মানে নেই ?

কমল কহিল, তা হলে হবে কি এনে ? আমাকেও পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন ? প্রথমতঃ,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

টাকা আমি নেবো না, দ্বিতীয়তঃ সে বস্তু তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি !

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবে না ? আর কিছু না হোক বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবরটা তাঁকে ত জানান দরকার ?

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না না, সে করবেন না। ওতে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সহিতে পারব না। কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জলে মরেছিলুম যে, এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল, স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতুম ? তখন এই লুকোচুরির অসম্মানটাই যেন পৰ্ব্বতপ্রমাণ হয়ে দেখা দিত। তার পরে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এল। সেখানে কত মরণই চোখে দেখলুম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ দিয়ে নেমে এসেছে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিল না সেই ত আমার সম্মান। লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েছে। আর আমার নালিশ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভাল করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিল না, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয় হরেনবাবু ! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু আমার কথা আর নয়। ছনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচজন বাস করে, তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এই বলিয়া সে নিশ্চল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প একমুহূর্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছেন খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন ?

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ গুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন ?

হাঁ, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভাল। তাঁর এক জাঁটুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্যলাভের জন্ত ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দু-এক মাস দেরি হবে।

আর নীলিমা ? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন ?

না, তিনি এখানেই আছেন।

শেষ প্রশ্ন

কমল আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে ? একলা ঐ খালি বাসায় ?

হরেন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্তাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেচেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্তে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার স্বেযোগ হয়েছে।

এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, শুধু বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশে নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্হা বিধবা শালী নিয়ে ত জাটুতুতো ভায়ের বাড়ি ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও ত আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের—কিন্তু তাঁরা কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্তত গেছে, আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরচে তারি-দিকে, দাদার বাড়ি থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ!

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ি ত আছে শুনেচি ?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। একটা বড় রকম খণ্ডরবাড়ীও আছে শুনেচি, কিন্তু সে-সকলের কোন উল্লেখই হ'ল না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপণার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্রেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সং চরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দিনে ছেড়ে যেতে পারেননি, এই থাকার জন্তই হয়ত ওদিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ-দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হরেন্দ্র কহিল, এই-সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসছেন, না ?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না ।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে ; ওঁরা দুজনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন । বৌদির ত আগ্রহের সীমা নেই—একদিন যাবেন ওখানে ?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুন না হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি ।

আজই যাবেন ? চলুন । আমি একটা গাড়ী নিয়ে আসি । অবশ্য যদি পাই । এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়ীতে দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন । হেঁটেই যাই চলুন ।

হরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে ?

মানে নেই—এমনি । চলুন যাই ।

১৯

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্নপ্রায় । শয্যার উপরে অর্ধশায়িতভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্থানী সেইদিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন । দিনকয়েক হইতে আর জ্বর ছিল না, অন্তান্ত উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্বলতা যায় নাই । ইহার ঘরে প্রবেশ করিতে কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুশি হইলেন সে তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল । তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আসিবে না । তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস, আমার কাছে এসে ব'স । এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন ; বলিলেন, কেমন আছ বল ত কমল ?

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, ভালই ত আছি ।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্বাদ । নইলে যে দুর্দিন পড়েচে তাতে কেউ যে ভাল আছে তা ভাবতেই পারা যায় না । এতদিন কোথায় ছিলে

শেষ প্রশ্ন

বল ত ? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয়, বাসায় ভালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হরত বা তুমি দিন-কয়েকের ভরে কোথাও চলে গেছ।

• হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না—এই আশ্রাতেই মুচীদেব পাড়ায় সেবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয়ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিলেন, মুচীদেব পাড়ায় ? কিন্তু কাগজে লিখচে যে পাড়াটা উজোর হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে ? একা ?

কমল ষাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিল না। তার তাৎপর্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ সুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবে না এ আমি জানিব না ত জানিবে কে ?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু-তিনদিনের বেশি দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু যনে হয় কি যে এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরী ! তাকে নিয়ে এলে না কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞেস করতাম। খবরের কাগজ থেকে ত সব বোঝা যায় না।

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরি আছে।

কেন ?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন না, এই তাঁর পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হলে তোমার বা কি করে ছুটি হ'লো ? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে ? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্ম নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই ? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে নিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন। এক-একজনের দেহ-যন্ত্রেও প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন যে, সে না হয় কখন শেষ, না যায় কখন বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হ'তো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি করে ? ক'দিনই বা বাঁচবে ! সেখান থেকে একলা যখন চলে এলুম কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

না, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন করে, যেন নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি, প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটীরে বজ্রার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন তার ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকবে কে? আজই হরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলুম—

আগুবাবু এ-বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল? শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্তই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে।

কমল কহিল, লজ্জা সেজন্ত নয় আগুবাবু। যখন দেখতে পেলুম তাঁর কোন অসুখই নেই—সমস্তই ভাণ—কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পারিনি, আপনি বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন—তখন কি যে আমার হ'লো সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। যে সঙ্গ ছিল তাকেও এ-কথা জানাতে পারিনি—শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম। পথের মধ্যে বার বার করে কেবল এই একটা কথাই মনে হতে লাগল, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ার না আছে ধর্ম, না আছে সম্মান।

আগুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্য নয়?

কিন্তু জবাব দিবার পূর্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতিনমস্কার করিল এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আগুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ যে দুর্বলতা কমল! এ জিনিস ত তোমার স্বভাবের সঙ্গ মেলেনা। আমি বরাবর ভাবতাম, যা অজ্ঞান, যা মিথ্যাচার, তাকে তুমি মাপ করো না।

হরেন্দ্র কহিল, গুর স্বভাবের খবর জানিনে, কিন্তু মুচীদেব পাড়ায় মরণ দেখে গুর ধারণা বদলেচে, এ সংবাদ গুর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আগুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

শেষ প্রায়

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সে-ই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশি একটা কথাও কহিত না। কহিল, এ-প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে। যা নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়; যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশি পারলেন না বলে রাগারাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনার কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি করবেন না। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরে নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন ত খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আনতে বলব?

আগুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাকলে চলবে না—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙতে আমি দেবো না।

আগুবাবু অবসরের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ-কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়।

আমি ভুলিনে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়সের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বই কি! দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনও আপনার অনেক—অনেক বাকি। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করি গে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন? যাই?

আগুবাবুর এ ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না, তথাপি সম্মতি দিতে হইল; কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেও না, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গিটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটিকয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল, ধরা পড়িল রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা গুপ্তা করিতে আসিয়াছিল, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতার আশ্রয়ের কিছু নাই, সাধারণের কাছে এ-কথা বলা চলে, কিন্তু সাধারণের একজন কমল নয়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নীলিমার এই একান্ত সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিশ্বয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিশ্বয় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিশ্বয় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাই দিতে পারিল না। নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন'ও রূপের প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে লাগিল। এ-ছাড়া আরও একটা দিক আছে। সেদিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিন্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোনদিনের কোন প্রলোভনেই তাহাতে দাগ ফেলিতে পারে নাই ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশি ছিল না—তখনও যৌবন অতিক্রম করে নাই; কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মূলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উত্তম-আয়োজনের ক্রটি রাখে নাই, কিন্তু দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ-সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ-ঘরে আসিয়া অশ্রুমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে, দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি অত্যাচার্য্য ধর্মের জায় একাগ্র সতর্কতার তিনি আজীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, আসক্তির এই নবজাগৃত চেতনায় সে ধর্ম লেশমাত্র বিস্কৃত হইয়াছে কি না।

চাকর চা কুটি ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেইসমস্ত আগাইয়া 'দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর জায় সরলতার ছোট-খাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে—এমনি অনেক-কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র জীলোকের লোভের বস্তু এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাকশক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না যে, যে-বৌদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কি না! এই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাভীর্য্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সুপরিচিত সমস্ত-কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতার বালিকার জায় সে প্রগল্ভ হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই এ-ই কি না।

শেষ প্রশ্ন

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটীতে দু-একবার চুমুক দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুধায় সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্তে কহিল, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন ?

ভুলে গেলাম ? তার মানে ?

তার মানে এই যে, আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি ত কিছু খাইনে।

এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই—এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ এ একগুঁয়েমির পরিবর্তন নেই। কিন্তু অত দর্প করিনে হরেনবাবু, তবে সাধারণতঃ এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেচেন বলুন ত ?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই আপনার বাড়ির মধ্যে চুকবো না, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্ডায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক-চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ অতি-ঘনিষ্ঠের স্থায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। স্থায়-অস্থায়ের বিচারবোধ আপনার কত স্থূন দাঁড়িয়েচে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভাল হইল না, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। ব্যাপারটা বিলম্বী ঠেকিল এবং এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই সে তাহার বাসার দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের ? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া ত কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়ীতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে থাকবেন কি ? আশ্রমে পাচক রাধবাবু ত ব্যবস্থা নেই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ আপনি আর অজিতবাবু ?

হাঁ। কিন্তু হাসচেন যে ? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা জানি, এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিতবাবু নেই, স্ত্রীরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রন্ধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন ত আমার ভারি ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে ?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অশ্রায়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি ? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ক্রটি করিনি যে, যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাঁদেরই একজন। আমার আপত্তি—শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাবো না তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা দেখে এসেছি তাকেও প্রচুর বলা চলে না। স্ত্রীরাং এখানে খাবার কষ্ট যদি বা হয়, অন্তের মত অসহ্য হবে না এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুশি হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা দেখে এসেছেন তাই বটে। সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন ? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অস্বচ্ছল নয়—কষ্ট পাওয়ার ত কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাকে প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধে এমনি ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। অথচ বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু দিতে পারেন ?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি ভিতরের লোককে দিতে পারব। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশি চলে না। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেননি কিছুই, কিন্তু পরের অমুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজ-মন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জগুই নয়—সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিল না যে, এতবড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহে না—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূল তাহাকেও

শেষ প্রশ্ন

দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই এবং বোধ করি সাহস ও সাধনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচিনে কমল, কিন্তু এ-ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারিনে যে, আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ—দুঃখের অভিনয় বলে। সকল অভিনয়ের মধ্যেই ধানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নেই। বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারি একটা বেসুরা বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন্দ্র ক্রমকাল মৌন থাকিয়া জবাব দিল, কিন্তু এটা তো মানেন যে, প্রাচুর্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ দুঃখ-দৈন্তের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে?

কমল ঠোঁড়ের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্ত ওদিকেও ধানিকটা সত্য থাকা চাই হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম-অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েচেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্ত-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু ধানিকটা দস্ত আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ-বস্তু দেখতে পাবেন—দৃষ্টান্তের জন্ত ভারত পর্যটন করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তর্ক থাক, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুন্সিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে স্নেহ-রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর আদর্শ ও-চোখে তামাসা বলেই ঠেকবে। দিন্, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন্।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিল না।

হরেন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, ধরুন কেউ যদি বখার্ব-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্তের মাঝেই নেমে আসে তখন ত অভিনয় বলে তাকে তামাসা করা চলবে না? তখন ত—

কমল বাধা দিয়া কহিল, না, তখন আর তামাসা নয়, তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেন্দ্রবাবু, কিছুকাল পূর্বে আমিও কতকটা আপনার মত করেই ভেবেছি, উপবাসের নেশার মত আমাকেও তা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন

করেচে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্ত এবং অভাব ইচ্ছাতেই আত্মক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আত্মক, ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ—অভাব যে মানুষকে কৃত হীন, কত ছোট করে আনে, সে আমি দেখে এসেছি মহামারীর মধ্যে—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আর একজন দেখেচেন তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তার কাছ থেকে ত কিছু পাওয়া যাবে না, আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে—মণি ফেলে অঞ্চলে কাচখণ্ড গেরো দেওয়া—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেন না? আশ্চর্য্য!

হরেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রের বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল; নারীত্বের শাস্ত মার্ধ্য ও শুচিতার আদর্শে ইহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না। মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে প্রভেদ ইহাদের মধ্যে যত বেশিই থাক, সেবা ও মমতায় উহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ় অন্তর্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখে জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রের ক্ষুধা ছিল না, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারী ভাল লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এমনি করেই জন্ম করেছি কমল।

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জন্ম হতেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেন না।

কমল হাসিয়া কহিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষমানুষেরই এমনি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেছি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে-দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদির খাওয়া হ'তো না—উপবাস করে কাটাতে, তবু হার মানতে চাইতেন না।

শেষ প্রশ্ন

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্বাদে মোটা-বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাকে—
এতেই লাভ বেশি। আপনাদের স্বল্প-বুদ্ধির অভিমানে উপোস করে মরতে
আমরা নারাজ।

কমল এ-কথার জবাব দিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার স্বল্প-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে
দেখব।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটা অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন এ-কথার
জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন? মনে হয় যেন রাজরাণী হওয়াই যাকে সাজে,
কাঙালপনা তাকে মানায় না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত
বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল,
আপনার থাকওয়া হয়ে গেছে এবার উঠুন। ও-ঘরে গিয়ে সারারাত গল্প শুনবো,
এ-ঘরের কাজটা ততক্ষণ সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বলিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির
সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বো না, তা যত রাত্রিই হোক। বলুন।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌদিদির সমস্ত কথা ত আমি জানিনে। তাঁর
সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আশ্রয়, অবিনাশদার বাসায়। বস্তুতঃ তাঁর সম্বন্ধে
কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে, আমিও ততটুকু জানি।
কেবল একটা কথা বোধ করি সংসারের সকলের চেয়ে বেশি জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক
শুভ্রতা। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ঠাঁর উনিশ-কুড়ি—ঠাঁকে সমস্ত হৃদয়
দিয়েই পেয়েছিলেন। সে স্মৃতি মোছেনি, মোছবার নয়—জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত
সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরুষ-মহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে, তাঁর নিষ্ঠাও
অনন্তসাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো এখন ত আর বাসায় যাওয়া চলে না—এই ঘরেই
একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানে শোব। আর ত ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল।

কমল হাসিয়া বলিল, আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনার ভয়ের কারণ আছে না কি ?

হরেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতে পারিল না। স্বীলোক হইয়া এ-কথা এ উচ্চারণ করিল কি করিয়া !

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকে ধাক্কা দিল। সে কয়েকমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েছে হরেনবাবু, আপনি বাসায় যান। তাতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রয়ে ঠাই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ি। নির্জন গৃহে অনাখ্যায় নর-নারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন—পুরুষের কাছে যে মেয়েমানুষ সে শুধু মেয়েমানুষ, এর বেশি খবর আপনার কাছে আজো পৌঁছোয়নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান, আর দেরি করবেন না, আশ্রমে যান। বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মুচের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

২০

প্রায় মাসাধিককাল গত হইয়াছে। আগ্রায় ইন্ফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্তিটি শান্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে দুই-একটা নূতন আক্রমণের কথা শুনা যায় বটে, তবে মারাত্মক নয়। কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি, নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যে-রকম খাটচেন তাতে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এমনি ক্লেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবে, হ'লো ? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে, ঢের দেরি। জরুরি থাকে ত না হয় বলুন, কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরি জিনিস যে একবার ব্যবহার করেছে সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই দেখুন মা লালাদের বাড়ি থেকে আবার এক ধান গরদ, আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন ?

শেষ প্রাণ

নিই সাথে? বললাম, ছ'মাসের আগে হবে না—তাতেই রাজি। বললে ছ'মাসের পর ত হবে, তাতেই চলবে। এই দেখুন না মজুরির টাকা পর্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশি আসতে থাকলে দেখিচি আমাকে লোক রাখতে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরানো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রীর তৈরী—আমাকে দিয়ে এরকম হবে না। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার চেয়ে বড় গরিগর এখানে কেউ আছে নাকি?

এখানে না থাকে কলকাতায় আছে। সেইখানেই পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

না না, সে হবে না। আপনি যা পারেন তাই করে দেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড়লোক, সৌখিন মানুষ, যা-তা তৈরি করে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট করে লাভ নেই, আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর?

কমল কহিল, আমি হাত গুণতে পারি। গরদের কাপড়, অগ্রিম মূল্য অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলে চলে—হিন্দুস্থানী লালাজিরা অত নিরীক্ষণ নয় হরেনবাবু। তাঁকে জানাবেন—তাঁর জামা তৈরি করার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের সস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। এ পারিনে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারি ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জানতে পারেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করেচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করিনি। তাকে বলেছিলাম অল্পমূল্যে সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজি হ'লো না। বললে, এ ত আমার নিত্য-ব্যবহারের মেয়াজই নয়, এ কমলের হাতে তৈরী জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষে পর্কদিনে পরবার। এ আমার তোলা থাকবে। এ-জগতে তার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।

কমল বলিল, কিছুকাল পূর্বে ঠিক তার উল্টো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধ করি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রর সমস্তই মনে ছিল ; একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয় ; কিন্তু এ ধারণা ত একদিন অনেকেরই ছিল। বোধ হয় ছিল না শুধু আশুবাবুর ; কিন্তু তাঁকেও একদিন বিচলিত হতে দেখেছি। আমার নিজের কথাটাই ধরুন না—আজ ত আর প্রমাণ দিতে হবে না, কিন্তু সেদিনের কষ্টি-পাথরে ঘবে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায় ?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন ?

হরেন্দ্র বুঝিল, এইসকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, না এখনো পাইনি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাইনি, পুলিশের জিম্মায় গিয়ে পড়েচে কি না এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, নিশ্চয়। আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু স্বস্তি বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন, মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায় না ? হরেন্দ্রবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ-সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ-ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে, আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুল-চক্ষে চাহিল যে, হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এইসময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কোতূহলের সীমা নাই—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে সীমলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কি দাঁড়িয়ে আছেন যে ! একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসতেও পারেননি ?

বসতে ত আপনি বলেননি।

বেশ যা হোক ! বলিনি বলে বসবেন না !

না। না বললে বসা উচিত নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও ত বলিনি—দাঁড়িয়েই বা আছেন কেন ?

এ যদি বলেন ত আমার না-দাঁড়ানই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার করি।

শেষ প্রশ্ন

শুনিয়ে কমল হাসিল। বলিল, তা হলে আমিও দোষ স্বীকার করছি। এতক্ষণ অশ্রুমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, দেখুন হরেন্দ্রবাবু, আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি, আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বসতে বলতে ভুলেছি, যে আদরটুকু অতিরিক্তে করা উচিত ছিল করিনি—হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ক্রটি আপনার চোখে গড়েচে। না না রাগ করছেন বলিনি, তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ-সংসারে মাহুষের গিয়েও যেতে চায় না—কোথায় একটুখানি থেকেই যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য বুঝিল না, একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ এইটাই লোকে সবচেয়ে বেশি ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব আমাকে বলছেন, না আপনাকে আপনি বলছেন? যদি আমার জন্ম হয় ত আর একটু খোলসা করে বলুন। এ হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকচে না।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয় না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হেঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখন কেবল চৈতন্য জাগে—আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে হাঁ। অস্তুতঃ আগ্রার রাস্তায় একটু হাঁস করে চলা ভাল—ও দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায় ঘটে। কিন্তু হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেল, মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হ'ল না।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেন্দ্রবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম্ম বোঝা যায় না। এই দেখুন, আমাকে ত কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু অর্থ বুঝতেও বাধেনি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগ্য। হয় সাধারণ মাহুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্ছি খুলতে—তত যাচ্ছে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কুল-কিনারা পাচ্চিনে। এ-সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলছেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারব। নইলে এভাবে যুমস্ত মাহুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

৭৭-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল হাসি-মুখে বলিল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

হুজনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকেই মনে পড়েছে। আশুবাবু, মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ— এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল, ও চলবে না। আপনি আবার গম্ভীর হয়ে উঠছেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টানাটানি আমার সহবে না। বরঞ্চ যারা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা, আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন—তাই বলুন আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালবাসি—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি, আর যাই করি আপনাকে ঠকাবো না, সংসারে আরও পাঁচজনের মত ভালবাসার গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুনতেই ভালবাসেন? তার বেশিতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা—অক্ষয়ের দল শুনতে পেলে আমার খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া বলিল, না তারা খাবে না আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ষাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। আশ্রম ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেচে, যেখানেই যাই সংপথে সে আমাকে রাখবেই। বরঞ্চ আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারবে না—আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি করে সেই লক্ষীছাড়া ছোঁড়াকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়।

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পান না?

না।

পাবার কথাও নয় এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয় না।

কেন বিশ্বাস হয় না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেচি। কিন্তু আরও ভাল ক্যানডিডেট আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করবার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর দিয়ে দেখবেন। এইটুকু নিবেদন।

শেষ প্রশ্ন

কিন্তু কেস্ ত অনুমানে ভর করে বিচার করা যায় না হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে ?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির হয়।

কমল জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজগুলো একে একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুকরিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েছে হরেনবাবু, একটুখানি চা তৈরী করে আনি, আপনি বসুন।

হরেন কহিল, বসেই ত আছি। কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই, কারণ পেলেই খাই, না পেলে খাইনে। ওর জন্তু কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যাননি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেচেন ?

কমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, না। আমার মনেও হয়নি।

তা হলে চলুন না আজ আশুবারুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যিই খুব খুশি হবেন। সেই অসুখের মধ্যেই একবার গিয়েছিলেন, এখন তিনি ভাল আছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্জাটে যেতে পারিনি। অন্তায় হয়ে গেছে।

তা হলে আজই চলুন না ?

চলুন। কিন্তু সন্কেটা হোক। আপনি বসুন, চট করে একবাটি চা নিয়ে আসি। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্কার প্রায়াক্কারে উভয়ে পথে বাহির হইলে হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাকতে গেলেই ভাল হ'তো।

কমল কহিল, হ'তো না। চেনা লোক, কেউ হয়ত দেখে ফেলতো।

দেখলেই বা। ওসব আমি আর এখন গ্রাহ্য করিনে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল পরিহাস, কহিল, কিন্তু এই চেনা-লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হতে আজকাল সন্কেচ-বোধ করেন, কি তারা ভাবে ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অল্প কিছু ভাবতে পারে? বলুন? এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, সমস্তই দুর্কৌধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভাল। রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে—এ সবচেয়ে বেশি টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হ'লো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলুম। আমার ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলো না। হাওয়া আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো—পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখবার সময় পাইনি—হয়ত বুঝতে দেরি হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সাধনা।

সাধনা? কেন?

তা জানিনে।

কেহই আর কথা কহিল না—উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই বোধ করি একটু ঘুর-পথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। ধবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারে নাই বলিয়া বেয়ারাকে স্নমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ভাল আছেন?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হাঁ, ভালই আছেন।

তার ঘরেই আছেন?

না, উপরের সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করছেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি।

পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনেই একটু আশ্চর্য হইল। এসেস ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই, আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা হুঁড়াইয়া দিয়া চুরুট টানিতেছেন, এবং অদূরে সোকার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আবহাওয়ার মতই কড়া ভাব—বাঙালীর মেয়ে, কিন্তু বাঙলা বলায় রুচি নাই। হয়ত

শেষ প্রশ্ন

অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন।

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই সমস্ত মুখ তাঁর আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেন না। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেচেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারব।

একটু ধামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয় উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আর আমি ?

ওহো—তাও ত বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসার অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকি পরিচয় যথাসময়ে হবে—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে ধানিকঙ্কণ চূপ করে বসি। এইজন্তে প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছটফট করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা ভারি হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু স্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে এসেচো ত ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি ? এ-বাড়িতে খাওয়াতে পারবো না ত।

কমল চূপ করিয়া রহিল।

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন, বর্ণনা আমার মিললো তো? বুড়োবয়সের extravagance বলে উপহাস করা হয়নি, মানলে ত?

মহিলাটি নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার-কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়ের বাইরেটা দেখেও মাহুষের যেমন আশ্চর্য লাগে, ভেতরটা দেখতে পেলে তেমনি অবাক হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র, ঠিক নয়?

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল; কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কি না তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাসা করে থাকেন, তিনি যে বেঠিক নন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রাজ্ঞানটা আপনার এ-সংসারে অচল।

ইস, তাই বই কি? বলিয়াই আশুবাবু গভীর সন্দেহের সুরে কহিলেন, এ-বাড়িতে থাকিয়া তোমাকে কিছুতেই পারবো না জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বল ত?

রোজ যা খাই, তাই।

তবু কি শুনিই না? বেলা ভাবছিলেন, এও আমি বাড়িয়ে বলেছি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলোচনাই হয়ে গেছে?

তা হয়েছে—অস্বীকার করবো না।

রৌপ্য-পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল এবং সকলেই আশ্চর্য হইলেন। এ-গৃহে অজিত একদিন বাড়ির ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না-আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের পরে ভারি একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিলেন, তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

ধানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

শেষ প্রশ্ন

আগুবাবু কহিলেন, ব'সো অজিত। ভাল আছ ?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে ? ভাল মনে হচ্ছে ত ?

আগুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলেই ভরসা পাচ্ছি।

পরম্পর কুশল প্রণোত্তর এইখানেই থামিল। কমল না থাকিলে হয়ত আরও দুই-একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখাচোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিল না। মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকেই এখন আসছেন ?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। বলিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারিনি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আসতে হয়েছে।

আমার সন্ধানে ? প্রয়োজন ?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে ছপুর থেকে বোধ করি বার-চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বসতে বলেছিলাম। রাজি হলেন না। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত খাতে নয় না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি কে ? দেখতে কেমন ? বললেন না কেন সে এখানে নেই।

অজিত কহিল, সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছি। বোধ হয় বিশ্বাস করলেন না।

হরেন্দ্র উদ্ভিন্ন-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কমলকে বাসায় পৌছাইয়া দিবার ভার আগুবাবুর 'পরে দিয়া গ্রহণ করিল। সে চলিয়া গেলে আগুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটিকে আমি দু-তিনবারের বেশি দেখিনি—বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলে না, কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কি যেন একটা মহামূল্য জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ হরেন্দ্রর মুখে শুনি সে ভারি wild—পুলিশে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে—ভয় হয় কোথায় কি একটা বিভ্রাট ঘটিলে বসবে, হয়ত খবরও একটা পাবো না—এই দেখ না হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বিপদে পড়েচে কি করেন ?

আগুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায়—এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেন্দ্রর কাছ থেকে শুনেছি। পরার্থে আপনাকে সত্যি করে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি—শুনতে শুনতে যেন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তার ছবি দেখতে পেতাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তার কোন বিপদ না ঘটে।

প্রকাশে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে সকলে বোধ হয় এ-প্রার্থনায় যোগ দিল।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাকে আজ ত দেখতে পেলুম না? বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক, দিন-রাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েছেন। শরীরটা বোধ হয় একটু বেশি রকমই ধারাপ হয়েছে, নইলে এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই—কতটুকুই বা পরিচয়, অথচ আজ ভাবি সংসারে আপন-পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন। দুনিয়ার আপন-পর কেউ নেই কমল, শ্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায়—তার কোন হিসাব কেউ জানে না।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু সেই অপরিচিতা রমণী বেলা ব্যতীত অপর দুজনেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্যন্ত সংসারে অনেক জিনিসই যেন আর একরকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জঞ্জাই বা এত টানাটানি এত বাঁধাবাধি, এত ভাল-মন্দর বাদানুবাদ—মানুষের অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আনন্দ ত নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমল বিশ্বয়ে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়—যেন কুয়াসার মধ্যে আগন্তকের মুখ দেখা। কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধ হয় কমলের বিশ্বিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

শেষ প্রশ্ন

আসবো। আজ যাই।

এসো। গাড়ীটা নীচেই আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিইনি। অজিত, তুমিও কেন সঙ্গে যাও না, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে ?

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হ'লো না, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদলায়।

গাড়ীর মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসিল। রাস্তার মোড় ফিরিলে কমল কহিল, সেদিনের রাতটাও এমনি অন্ধকার ছিল—মনে পড়ে ?

পড়ে।

সেদিনের পাগলামি ?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজি হয়েছিলুম সে মনে আছে ?

অজিত হাসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনি যে বিক্রপ করেছিলেন সে মনে আছে ?

কমল বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিক্রপ করেছিলুম ? কই না !

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল কহিল, তা হলে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক, আজ ত আরু করচিনে—চলুন না, আজই দুজনে চলে যাই ?

হ্যাঁ। আপনি ভারি দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের ? আমার মত এমন শাস্ত সুবোধ কে আছে বলুন ত ? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল, চল যাই, তখুনি রাজি হয়ে বললুম, চলুন।

কিন্তু সে ত শুধু পরিহাস।

কমল বলিল, বেশ, তা না হয় পরিহাসই হ'লো, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেচি বলুন ত ? ডাকতেন তুমি বলে, আরম্ভ করেচেন আপনি বলতে। কত দুঃখে কষ্টে দিন চলে—আপনাদেরই জামা-কাপড় সেলাই করে কোনমতে হয়ত ছুটি খেতে পাই,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অথচ আপনার টাকার অবধি নেই—একটাদিনও কি খবর নিয়েছেন? মনোরমা এ-দুঃখে পড়লে কি আপনি সহিতেন? দিন-রাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্কশরীর শিহরিয়া উঠিল। অক্ষুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কমল সহসা হাত টানিয়া লইয়া চোঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার, রোকো রোকো—এ যে পাগলা-গারদের সামনে এসে পড়েছি। গাড়ী ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাণ্ডর করতে পারা যায়নি।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সাধুনা এই বে, হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার যো নেই। সে অধিকারে ও বঞ্চিত। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। শুনিয়া কমল হাসিল, কহিল, তা বটে। কিন্তু বিচার জিনিসটাই ত সংসারের সব নয়, এখানে অবিচারেরও স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চলচে, নইলে কোন্‌কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতেই কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ি যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরি হবে।

সে কি কথা! এত রাত্রে এ-অঞ্চলে আমি গাড়ী পাব কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেব।

গাড়ী চলিয়া গেল। অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবে না জানি, অন্ধকারে তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেন না। কারণ আপনাকে না ধাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতুম না। আসুন।

বাসায় দাসী আজ আলো জালিয়া অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই ষার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া অজিতকে রান্নাঘরে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, ঠোঁড় জালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে?

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাৎ বলতে পারেন? বলুন ত দেখি?

শেষ প্রশ্ন

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্‌খানে কি ছিল এবং নাই—মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, ওদিকে সারারাত খুঁজলেও পাবেন না। আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোন্‌দিকে বলুন তো ?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আশু আশু বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে আমি খুব বেশি করে চেয়ে দেখিনি। অন্য সবাই পেরেচে, শুধু আমিই কি জানি কেন পেরে উঠিনি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ ওইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্মম-বোধ ছিল না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলুম, যেমন করে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবোই। আশুবাবুর বাড়িতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আনবোই। খাওয়ানো একটা ছোট উপলক্ষ—তাই ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেন না—আজ রাতে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না—এই বাড়িতেই বন্ধ করে রাখবো।

কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি ?

কমল কহিল, লাভের কথা পরে বলবো, কিন্তু আমাকে ‘আপনি’ বললে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন ‘তুমি’ বলে ডাকতেন, সেদিনও বলতে আমি সাধিনি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদলে দেবার মত কোনও অপরাধও করিনি। অভিমান করে সাড়া যদি না দিই, আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্ত। কিন্তু সে যখন অমন করে চলে গেল, তখন সবাই ভাবলে আর একদণ্ডও আপনি এখানে থাকবেন না। কেবল আমি জানতুম আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে আপনাকে ভালবাসি এ-কথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

না, করিনে।

নিশ্চয় করেন। তাই আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতূহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ ? একটা শুনি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল বলিল, শোনাবো বলেই ত বেতে দিইনি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী-গরীবদের কাপড় সেলাই করে নিজের খাওয়া-পরা চালাই—এ আমার সয়। কিন্তু দায়ে পড়েছি বলে আপনারও জামা-সেলাই করার দায় নেবো—এও কি সয়?

কিন্তু তুমি ত কারও দান নাও না।

না, দান আমি কারও নিইনে, এমন কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, কমল, এ-কাজ তোমাকে আমি করতে দেবো না। আমি তার কি জবাব দিতুম? আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যার, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবো?

কথাটার ব্যথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল। অজিত বলিল, এমন হতেই পারে না কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটাদিনও এমন করে ভেবে দেখিনি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, যে-কমলকে আমরা সবাই জানি সে-ই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশি নয়?

এ-প্রশ্নের উত্তর আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই; এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দুজনেই বেশি করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহায়ে বসিয়া অজিত গভীর হইয়া বলিল, অথচ মজা এই যে, যার যত টাকাকড়িই থাকুক—তোমার উপার্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিজ্ঞান নেই। অথচ নিজে তুমি কারও নেবে না, কারও খাবে না। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান কেন? তা ছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন?

অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বরাবরই হয়েছে। আর তোমার খাই শুধু তোমার জ্বরদস্তির সঙ্গে পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি, কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, এ উৎসৃষ্টি আর ক'রো না, তুমি তখনি হয়ত এমনি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বার হবে না।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ-কথা বলেছিলেন কোমদিন?

শেষ প্রশ্ন

মনে হয় যেন বলেছিলাম ।

আর আমি তুমি সে-কথা ?

না ।

তা হলে শোনবার মত করে বলেননি । হয়ত মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হয়েই ছিল—
মুখ দিয়ে তা প্রকাশ পায়নি ।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি ।

তা হলে আমিও যদি বলি, না ।

অজিত হাতের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই ত ! তোমাকে একটাদিনও
আমরা বুঝতে পারলাম না । যেদিন তাজের স্নমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন
তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে
গেলে । এইমাত্র নিজেই বললে আমার ভার নিন—আবার তখন বললে, না ।

কমল হাসিয়া কহিল, এমনিধারা একটা 'না' আপনি বলুন ত দেখি ? বলুন ত
যা খেয়েচেন আর কোনদিন খাবেন না—কেমন আপনার কথা থাকে !

অজিত কহিল, থাকবে কি করে ? না খাইয়ে তুমি ত ছেড়ে দেবে না ।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিল না । শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার
সময় আজও আপনার আসেনি । যেদিন আসবে সেদিন আমার মুখ দিয়েও 'না'
বেরাবে না । রাত হয়ে যাচ্ছে আপনি খেয়ে নিন ।

নিই । সেদিন কখনো আসবে কি-না বলে দিতে পার ?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিনে । জবাব আপনাকে নিজেই
একদিন খুঁজে নিতে হবে ।

সে শক্তি আমার নেই । একদিন অনেক খুঁজেচি কিন্তু পাইনি । জবাব
তোমার কাছে পাবো, এই আশা করে আজ থেকে আমি হাত পেতে থাকব । বলিয়া
অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল ।

ধানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেরের
আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন ?

অজিত কহিল, কোথাও ত থাকা চাই । তুমি নিজেই ত জানো আশ্রা ছেড়ে
আমার যাবার যো ছিল না ।

জানি তা হলে ?

হাঁ, জানো বই কি ।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা আমার কাছে চলে এলেন না কেন ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

যদি আসতাম, সত্যিই কি স্থান দিতে ?

সত্যি ত আর আসেননি ? সে যাক, কিন্তু হরেরের আশ্রমে ত কষ্টের সীমা নেই—সেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত কষ্ট আপনার সইল কি করে ?

জানিনে কি করে সইল, কিন্তু আজ আমার ও-কথা মনেও হয় না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত এই আমার সমস্ত ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ করেও ছিলাম না। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছি—তিন-চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েছি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বার হব।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে ? হরের বোধ হয় ?

অজিত কহিল, যদি দিয়েও থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েছেন। দেশের সর্বনাশ যারা চোখে দেখেছে—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্ভাগ্যের একান্ত ভীকৃত্য—

কমল বাধা দিয়া বলিল, হরের এ-সব দেখেছেন অস্বীকার ক'রেন, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন-কিছু দেখবার ত আজও সুযোগ পাননি ?
কিন্তু এ-সবই ত সত্যি ?

সত্যি নয় তা বলিনে, কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় কি এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা ?

নয় কেন ? ভারতবর্ষ বলতে ত শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয় ? এর প্রাচীন সভ্যতা, এর ধর্মের বিশিষ্টতা, এর নীতির পবিত্রতা, এর ঋষি-নিষ্ঠার মহিমা—এই ত ভারত, তাই ত এর নাম দেবভূমি—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাঁচাবার তপস্বী ছাড়া আর কি কোন পথ আছে ? ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের—জীবনে সার্থক হবার—ধন্য হবার—

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার খাওয়া হয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে ও-ঘরে চলুন—আর মা।

তুমি খাবে না ?

আমি কি ছুবেলা খাই যে আজ খাব ? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে ত ফিরে যেতে হবে।

মা হবে না, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো। কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রমবাসীদের, আপনার জন্ম নয়।

কিন্তু লোকে বলবে কি ?

শেষ প্রশ্ন

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য্য থাকে না, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষা করতে পারবে না। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকেছিলেন—কিন্তু পারিনি, আজ আর না পারলে আমার চলবে না। চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা—আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ-ঘরে আসিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যা-বস্ত্র দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং নিজের জন্ত মেঝের উপর যেমন-তেমন গোছের আর একটা বিছানা পাতিয়া রাখিয়া বলিল, আসচি। মিনিট-দশেকের বেশি দেরি হবে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

না।

তা হলে ঠেলে তুলে দেব।

তার দরকার হবে না কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে, বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া—দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গেছে, নীচে সিঁড়ির কপাট বন্ধ করা—গৃহস্থালীর এমনি সব ছোট-খাটো কাজ তখনো বাকি, সে-সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সম্বন্ধ-রচিত শুভ্র সুন্দর শয্যাটির পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু যে ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভালো-লাগার তৃপ্তি। হয়ত একটু কোতূহল মিশানো, কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নাই—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সম্ভান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত; কিন্তু হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হওয়া অবধি দৈন্ত ও আত্ম-নিগ্রহের সুহৃৎ পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্নোপলব্ধির একান্ত সাধনা এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সূতা দিয়া তৈরি বালিশের অড়ের চারিধারে ছোট গুটা-কয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে-কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে শাদা রেশম দিয়া বোনা কোন্ একটা অজানা লতার একটুখানি ছবি। এইটুকু শিল্প-কর্ম—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই তা আছে। অবসরকালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সেইটি নাড়া-চাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ ত !

কমল একটু আশ্চর্য্য হইল—কি বেশ ? ঐ লতাটুকু ?

হাঁ, আর এই হলদে রঙের ফুলগুলি । তুমি নিজে করেচ, না ?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন । নিজে নয় ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েচি ? আপনার চাই ঐ-রকম ?

না না না—আমার চাইনে । আমি কি করব ?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন । কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলবেন, কমল রাত জেগে তৈরি করে দিয়েচে ।

হ্যাৎ !

হ্যাৎ কেন ? নিজের জন্ত এ-সব জিনিস কেউ তৈরি করে না, করে আর একজনের জন্ত । কষ্ট করে ঐ ফুলগুলি যে শেলাই করেছিলুম সে কি আপনি শোবো বলে ? একদিন একজন আসবেই—শুধু তারই জন্ত এ-সব তোলা ছিল । সকালে যখন চলে যাবেন, সমস্ত আপনার সঙ্গে দেব ।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা ?

কেন ?

তুমি আমাকেই মনে করে এ-সব তৈরি করেছিলে এও বিশ্বাস করব ?

কেন করবেন না ?

করব না সত্যি নয় বলে ।

কিন্তু সত্যি বললে বিশ্বাস করবেন বলুন ?

নিশ্চয় করব । তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই—কোথাও বাধে না । সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হলে আমার লজ্জার অবধি থাকে না । সে আলাদা । কিন্তু যা পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন-কিছুর জন্তই মিথ্যে বলতে পারো না এ আমি জানি ।

তা হলে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করিনি, সত্যি কথাই বলচি, বিশ্বাস করবেন ?

নিশ্চয় করব ।

কমল কহিল, তা যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথাই বলব । তখনো রাজেন আসেনি । অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয়

শেষ প্রশ্ন

নেয়নি। আমাদের ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘণায় দূর করে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইল না—সেই গভীর হুঃখের দিনের ঐ শিল্প-কাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ করে যে করেছিলুম আমি কোনদিন হয়ত জানতে পারতুম না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিছানা পাততে এসে হঠাৎ মনে হ'লো, না না, ওতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েচে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে ওতে দিতে পারিনে।

কেন পারো না ?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হ'লো ঐগুলি বাস্তবে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাততে গিয়ে আজ প্রথম টের পেলুম সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলুম সে আপনি।

অজিত কথা কহিল না। শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমেষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চূপ করে কি ভাবচেন বলুন ত ?

অজিত কহিল, শুধু চূপ করেই আছি, ভাবতে পারচিনে।

তার কারণ ?

কারণ ? তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভেতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়—না এলো আনন্দ, না এলো আশা।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমল, একটা গল্প বলি শোনো। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ জিউ পূজোর ঘরে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে স্নমুখে বসে খেয়েছিলেন—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবুও বাড়ির কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। সবাই বুঝলে এ তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু এই অবিশ্বাসের হুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত যায়নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাসা করোনি জানি, কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায়, নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমারও তেমনি। একদিন পৃথিবীর কত অসংখ্য ত ঘুরেচি, শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমার

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা, বাবার দেওয়া। এ-ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালবাসতে পার।

কমল কহিল, টাকার জন্ত ভাবনা নেই, আশ্রমবাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েচে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃশ্ব এ-খবর কি ছাই আগে পেয়েচি! তা হলে কি কখনো ভালবাসতে যেতুম? তা ছাড়া আপনার স্বভাবের ভাল-মন্দটুকু বুঝে দেখবার সময় পেলুম কই? মনের মধ্যে ছিল শুধু একটা সন্দেহ, তার ঠিকানা পেতুম না, কেবল এই ত মিনিট-দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার স্তম্ভে দাঁড়িয়ে, অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিষ্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বলচ মাত্র মিনিট-দশেক? কিন্তু সত্যি হলে এতো পাগলামি।

কমল বলিল, পাগলামিই ত! তাই ত আপনাকে বলেছিলুম আমাকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ করে ঘর-সংসার করুন এ-ভিক্ষে ত চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, কহিল, ভিক্ষে বলচ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালবাসার অধিকার। কিন্তু অধিকারের দাবি তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদ্ধদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও ত পারে এর পরমাণু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে হবে কেন? আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাদের কেউ নয়।

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক্। কিন্তু গাছের ফুল শুকাবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুল-দানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলুম যে, কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় সে আত্মহত্যা করে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহার কাছে পূর্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। শিবনাথ তাহাকে বিবাহ করেন নাই, ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটাদিনের জন্তও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথমদিনের জন্ত অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল এই ফাঁকির

শেষ প্রশ্ন

মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিকারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব করা আমার সাজে না। কিন্তু তোমার কাছে আর কিছুই গোপন করব না। এরা বলেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ-বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালবাসার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না, মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্যন্ত জয় করতে পারবো না। অদৃষ্টে তাই যদি কখনো ঘটে, আশ্রম ত্যাগ করে আমি চলে যাবো। কিন্তু তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে। ও-ডাকে সাড়া দিতে আমি পারবো না।

একে মিথ্যে বলচেন কেন ?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যই কখনো আমাকে ভালবাসেনি, তার আচরণে বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালবাসা ত আমি নিজের চোখেই দেখেছি। সেদিন তার যেন সীমা ছিল না, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল কহিল, আজ যদি তা গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল ?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারী-জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বৃদ্ধি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রথর হইয়া উঠিল, কহিল, নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর পরেই থাকে। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই—মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন শ্রায়-বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলো না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অজিতবাবু, দুপক্ষের সর্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন ছনিয়ার কম পুরুষের ভাগ্যেই জোটে, কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে, মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের কথাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক তত বড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেছি বলে পুরুষের বিচারে এই হৃদয়

নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই স্মৃতিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কী? যা এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশি সম্মান মানুষ দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবে না জানি। আমার উঠানের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন একবেলার বেশি নয়। তার চেয়ে ওই মশলা-পেশা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী। সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায়?

কমল, এ যুক্তি নয়, এ শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু? কেবল স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেননি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখণ্ড লিখে যে বন্ধন নেবে না তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, আয়ু একটা বেলার নয় ও নিত্য-কালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে মশলা পিশে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে! ও না থাকলে সংসার বিশ্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিজ্ঞপ কিসের কমল?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেল না, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, মানুষে বোঝে না যে হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরি নয়। অমন নিশ্চিত নির্ভয়ে তাতে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য। অঞ্চ এ-কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় ছুঁতুটি সংসারে আর আছে কি? তাই ত কেউ ভেবেই পেল না শিবনাথকে কি করে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনের যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তিতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নূতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হ'লো মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো পাতা মরে গিয়েও গাছের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হ'লো সত্য?

অজিত একমনে গুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত, তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত

শেষ প্রশ্ন

তুমি কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারো না। এবং এইখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হ'লো কমল, এ নিয়ম কমল বন্ধ করো—এ আদর্শ তোমার জন্ত নয়।

কোন্ আদর্শ? আপনার ব্রহ্মচর্য আশ্রমের?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই। কিন্তু এ গুচতম্ব বিদেশীদের জন্ত নয়। এ তুমি বুঝবে না।

আপনার সাগরেদি করলেও পারব না?

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল। যেন সে-মাহুষ আর নয়। কহিল, আচ্ছা বলুন ত কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি? বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েছে যেন আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেনকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে—তোমার কিছুই বোধ হয় মনে হ'লো না, না?

কি আবার মনে হবে?

এ-সব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই করো না?

কি গ্রাহ্য করিনে, আপনাদের মতামত? না।

নিজের সম্বন্ধেও বোধ করি কখনো ভয় করো না?

কমল বলিল, কখনো করিনে তা বলতে পারিনে, কিন্তু ব্রহ্মচারীকে ভয় কিসের? হ', বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে নেই—তাকে গিলে খাবার মুখ হাঁ করে আছে। লুকানো ছাড়া আশ্রয়কার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মাহুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমাহুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্ব্বম্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মতো তোমাকে অক্ষুণ্ণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু বারা, তাদের জাত তুমি নও। আজ রাতে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হয়ে আসচে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিকে অবজ্ঞা করার সাহস, যে তুমি কোথায় পাও, তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিষয়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা জ্ঞানবানের মত শোনাচ্ছে?

অজিত কহিল, আচ্ছা কমল, সত্যি বলা আমার মতামতও কি অল্প সকলের মতো তোমার কাছে এমনি তুচ্ছ?

কিন্তু এ-কথা জেনে আপনার হবে কি?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন অহঙ্কার করিনি। বাস্তবিক ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছু জোর করে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার নিজের চেয়েও ঢের বেশি জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানও তেমনি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই ত। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি করে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শাস্ত-কণ্ঠে কহিল, কিছুই হবে না, সেদিন হারানও ঠিক এমনি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিত্তেই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেছি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ভ করে কিসের?

কমল কহিল, অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন, হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নর-নারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। তার পর ধীরে ধীরে অন্তরিকে মুখ ফিরিয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সাধনার একটা কথাও উচ্চারণ করিল না।

শেষ প্রণয়

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূর্বের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে ।
অজিতবাবু, যুমোবার বোধ করি আর সময় নেই ।
না, এইবার উঠি । বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল ।

২২

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র, এর বেশি দাবি আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টি-
কর্তার কাছে একদিনও করেন নাই । পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত
আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষ্ণিকিক বাত-ব্যাধিটাও
তেমনি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন । জগতের সুখ-দুঃখ যে
বিধাতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব স্ব নিয়মেই চলে—এ সত্য শুধু
বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্বী করিতে হয় নাই, সহজাত
সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন । একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত
পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন ভাগ্য-দেবতাকে
অজস্র দিকারে লাঞ্চিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার
সমস্ত আশা-ভরসায় আশ্রয় ধরাইয়া দিল সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে
বসেন নাই । ক্ষোভ ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন
অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া বলিতে থাকিত যে, এমনি হয় । এমনি দুঃখ
বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এমনি করিয়াই সংসার চলে । ইহার কোথাও
নূতনত্ব নাই—ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন । উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকেই
নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ, না আছে প্রয়োজন । তাই
সর্ববিধ দুঃখই তাঁহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি বিশ্বপ্রচ্ছন্নতার
বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে
লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত ।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে । আশ্রয় আসিয়াও নানা বিপর্যয়ের
মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে পড়িতে লাগিল আজকাল

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অনেকেই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্যের অভাব বহুশ্বেই যেন চাপা পড়িতে চাহে না, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রক্ততার ধার বেসিয়া আসে, মন্তব্য-প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত গুনায়—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়াবাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাঁহাতে অবিশ্বাস্ত মনে হইত, তখন ত তিনি সারিয়া আসিতেছেন। কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার নিভৃত চিত্ত-তলে যেন একটা দাহ চলিতেছে; তাহারই অগ্নিস্থলিক মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে, আগ্রা-বাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত আর একটুখানি স্থস্থ হওয়ার বিলম্ব। তার পরে হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকেলবেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব, রায়বাহাদুর, সদরআলা, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী—নানা কারণে স্থানত্যাগের স্বেযোগ যাহারা পান নাই তাঁহারা—হরেন্দ্র, অজিত এবং বাঙালী-পাড়ার যাহারা আনন্দের দিনে—বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন তাঁহাদের কেহ কেহ। আসে না শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া; মহামারীর সূচনাতেই সত্নীক বাড়ি গিয়াছে, বোধ হয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সংবাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসে না কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আগুবাবু মজলিশি লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিশে আর যোগ দিতে পারেন না, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন—তাঁহার স্বাস্থ্যহীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে-সকল কর্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া এখন বেলাকে তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও ক্রটি ঘটে না, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা, সভাশেবে পরিতৃপ্ত-চিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্থামীকে মনে মনে ধন্তবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে, অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

সম্ভব কি করিয়া যে হয়—এই ইতিহাসটুকুই গোপনে থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইত না, অভ্যাগণ ছিল না, ভালও বাসিত না। কিন্তু অন্তরাল হইতে তাহার আগ্রত দৃষ্টি সর্বক্ষণ এই গৃহের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিশ্চয়,

শেষ প্রশ্ন

তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার জ্বায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধ করি কেহ অনুভবও করে না।

হিম-ঝড়ুর প্রথমার্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতেই টিপ টিপ বৃষ্টি নামিয়াছিল—বিকেলের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। ঘরের শার্শিঙলা অসময়েই বন্ধ হইয়াছে, আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেমনি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি একখানা বই পড়িতেছেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্মই বলিয়া বসিল, এ পোড়াদেশের সবই উণ্টো। কিছুকাল আগে এ-অঞ্চলে একবার এসেছিলুম—জুন কিংবা জুলাই হয়ত হবে—এই জলের জন্ম যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে, না এলে এ কখনো আমি ভাবতেও পারতুম না। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায় ?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়াই সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এর কারণ কি সকলে টের পায় ? পায় না।

বেলা সরল-চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন ?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারের মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে !

জবাবটা এমনি অভাবিতরূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন, সে তেমনি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন এ-কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহপ্রিয় রমণী নয় এবং মোটের উপর সে স্মৃশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই—অকস্মাৎ মনে হয় বৃষ্টি বা তেমনিই আছে। রঙ উজ্জল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় ঋদ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হান্ত-কৌতুকে চপল, চঞ্চল—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ-উৎসবেই তাহাকে মানায় ; ছুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্থানীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বেলার ইতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে কণিকের জন্ত মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে, সে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চা বলেই নয়, হাহাকার করে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক সে আমি পায়িনে এবং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্মসম্মান-বোধ বজায় থাক, তার বড় আমি চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিল না।

আণ্ডাবাবু অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না, না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারে না—কখন পারে না তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভাল। এতদিন একসঙ্গে আছি এ ত আমি ভাবতেই পারতুম না।

নীলিমা হাঁ-না একটা উত্তরও দিল না, যেন ঘরে কেহ নাই এমনভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যিক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্মমত কি ছিল কেহ জানে না, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেন না। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। বেলা নামটি সখ করিয়া তাহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইল না। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাশ করিয়া আসিয়াছিলেন, দিন-কতক দেখা-শুনা ও মন জানা-জানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেষ্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অমুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যয়ন, একত্রে দেশ-ভ্রমণ, আলাদা বাবু-পরিবর্তন, এমনি অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশ খেটুকু তাহা অচিরে একাংশ হইয়া পড়িল। বর-পক্ষ হাতে হাতে ধরা পড়িলেন এবং কণ্ঠা-পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিতে চাইলেন। বন্ধু-মহলে

শেষ প্রশ্ন

আপোষের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্তা বেলা নর-নারীর সমানাধিকারত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিল না। স্বামী-বেচার চরিত্রের দিক দিয়া বাহাই হোক, মানুষ হিসাবে মন লোক ছিল না, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্যমত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিল না। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিমলা, মুসোরি, নইনি প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপারে তাহার সম্মতি ত ছিলই না, বরঞ্চ অতিশয় মর্শ্বপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পরলোকগত পত্নীর সহিত তাহার কি একটা দূরসম্পর্ক ছিল; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ-উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটবার তাহার সুযোগ হইয়াছিল। এইরূপে নানা আত্মীয়তা-স্বন্ধে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল; নিতান্ত পরের মত আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়িতে ঢুকে নাই। এ-তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল একেবারে অন্তরূপ। এ-গৃহে তাহার স্থান যে কোথায় এ-বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলান্দ্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্তৃত্বও ছিল তেমনি অবিসংখ্যিত।

বহুকণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিকার দেবার জন্তই যে ও-কথা নীলিমা বলেচেন, এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিশ্বাসের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিকার? ধিকার কিসের জন্ত বেলা?

বেলা কহিল, আপনি ত সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবে না। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও করব না। নিজের মর্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গানি প্রচার করেছিল বেয়েরাই সবচেয়ে বেশি, আজ তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু অজ্ঞান করিনি বলে সেদিনও যেমন জয় পাইনি, আজও তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেক-বুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিল না, কিন্তু আশ্বে আশ্বে কহিল, একদিন কমল বলেছিলেন যে, বিবেক-বুদ্ধিটাই সংসারের মস্ত বড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ঞায়-অন্মায়ের মীমাংসা হয় না।

আশুবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি ?

নীলিমা কহিল, হাঁ। বলেন, ওটা শুধু নির্বোধের হাতের অস্ত্র। সামনে পিছনে ছুদিকেই কাটে—ওর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও-কথা তুমি মুখে এনো না নীলিমা।

আশুবাবু মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, হুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অস্ত্র নেই। আপন নিয়মে চলে; তার সব কথা সবসময়ে বোঝাও যায় না, মানাও চলে না।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই বাবার নিষেধও মানতে পারিনি—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুম না।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারিনি।

বেলা কহিল, Thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই, কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনই ঞায় বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিসটা শোভনও নয়, কিন্তু সুখেরও নয়, সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জন করতে চায়, তাকে অন্মায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবো না।

নীলিমা অকৃত্রিম বিশ্বাসে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন ?

সত্যি বই কি।

নীলিমা নিস্তর হইয়া রহিল।

সেই স্তরতার সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই নীলিমা, বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্মায় হ'তো।

শেষ প্রশ্ন

একটুখানি খামিয়া কহিলেন, তুমি ত কমলের একজন বড় ভক্ত ; বল ত সে নিজে এ-ক্ষেত্রে কি করত ? কি জবাব দিত ? তাইত সেদিন যখন ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত করে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেছি, সে এই বেলা ।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারী ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন ?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয় নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া ।

নীলিমা কহিল, ওই ত টানাটানি । এইমাত্র বলছিলেন তার সকল কথা বোঝাও যায় না, মানাও চলে না । চলে না কিছুই, চলে কি শুধু উদাহরণ দেওয়া ?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন না । ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, যেজন্যই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে । এ-সময়ে আলোচনা করা ভাল নয় ।

নীলিমা এ-কথা কানে তুলিল না, বলিল, সেদিন আপনি ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন এবং আজ অসকোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন । ওঁর অবস্থায় কমল কি করত তা সে-ই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলী-মজুরের জামা সেলাই করে আহার সংগ্রহ করতে হ'তো—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না । কমল আর যাই করুক, যে স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে স্বণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অম্মের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে বাঁচতে চাইত না । নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরতো ।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ঞ্চার নিশ্চল হইয়া রহিল । নীলিমার হাসি-তামাসা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যে তাহার কাজ, সে যে সহসা এমন নিশ্চয় হইয়া উঠিতে পারে দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না ।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিশে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে-সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে সে আমার কানে আসে । নইলে কোন কথা হয়ত আমি বলতুম না । কমল একটাদিনের জন্তও শিবনাথের নিন্দা করেনি, একটা লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায়নি—কেন জানেন ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আগুবাবু বিমূঢ়ের স্তায় শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন ?

নীলিমা কহিল, কেন তা বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটু খামিয়া বলিল, আগুবাবু, স্বামী-স্ত্রীর তুল্য অধিকার—এ একটা অত্যন্ত নূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে, মেয়েমানুষ আমি মেয়েদের দাবির প্রতিবাদ করছি। প্রতিবাদ আমি করিনে, আমি জানি এ সত্য, কিন্তু এ-কথাও জানি সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে মুখে, আন্দোলনে আন্দোলনে এ সত্য এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে, আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চা করবেন না।

আগুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্বেই সে সেলাইয়ের জিনিস-পত্রগুলি তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুণ্ণ বিশ্বয়ে নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেচে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে কিছুক্ষণের জন্ত বৃষ্টি খামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃষ্ণব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই অর্ধেক ভিজিয়াছে। বলিল, বৌদি কই ?

আগুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে এ ভরসা তাঁহার ছিল না; সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এসো অজিত, ব'সো হরেন্দ্র।

বসি। বৌদি কোথায় ?

ইস্! দুজনেই যে ভারি ভিজ্জে গেছো দেখচি।

আজ্ঞে হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন ?

ডেকে পাঠাচ্ছি, বলিয়া আগুবাবু একটা ছকার ছাড়িবার উত্তোগ করিতেই ভিতরের দিকে পর্দা সরাইয়া নীলিমা আপনি প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

হরেন্দ্র কহিল, এ কি ? আপনি হাত শুণতে জানেন না কি ?

শেষ প্রণয়

নীলিমা বলিল, গোণা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলুম। একটি ভাঙা ছাত্তির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশ-স্বত্ব লোকের চোখে পড়েছে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাত্তার মধ্যে দুজনে? তাইতে দুজনকেই ভিজতে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ঠাণ্ডা বোধ হয় সমানাধিকারতবে বিশ্বাসী, অস্তায় করেন না, তাই চুল-চিরে ছাত্তি ভাগ করে পথে হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো। বলিয়া সে জামা-কাপড় হরেরের হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরের কহিল, কাপড় দিলেন ছুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গস্তীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরের বলিল, জামাটা আশুবাবুর, স্তত্রাং দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চলবে না।

বেলা এতক্ষণ শুধু বিষয়-মুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল এবং নীলিমাও জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গান্তীর্থের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি হরেন, আর খুঁড়ে না। দেখচো না মেয়েদের কি-রকম ব্যথা লাগলো। একজন সহিতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরের কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্তন করেচি। গৌড়াখুঁড়ির দুস্ত্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারে না। অতএব চিরসুয়মান হিমাচলের স্থায়ী ও-দেহ বক্ষয় হোক, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন এবং জল-বৃষ্টির ছুঁতা-নাতায় ইতর-জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টায়ের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তত্রিবাদ ত আবহমানকাল চলে আসচে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দিষ্ট ধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু আজ একটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোষামোদ না করলে ইতর-জনের ভাগ্যে মিষ্টায়ের অর্ধে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি ?

গভীর মেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টি কথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুনতে একটু লোভ হয়।

তবে আরম্ভ করব না কি ?

আচ্ছা এখন থাক্। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড় গে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে ? তার পরে ?

নীলিমা সহাস্তে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখি গে ইতর-জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেইখানেই অন্নের ভাঁড়ার উত্থলে যাবে। চলো অজিত, আর ভাবনা নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজ্ঞে কাপড় ছেড়ে আসি গে, বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

২৩

অজিত কহিল, জল থামবার ত কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব আবার দুজনে সেই ভাঙা-ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকারত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছানো। অবশ্য তার পরের ভাবনাটা নেই, এখানে তা চুকিয়ে নেওয়া গেছে, স্তূতরাং আর একবার ভিজ্ঞে কাপড় ছাড়া ও গুরে পড়া।

আগুবাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তা হলে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভরেই খেয়ে নিলে না কেন ?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না, থাক্, তাতে আর কি হয়েছে, আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না আগুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অহুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগামাহুষের উৎকর্ষা বাড়াও। আগুবাবুকে কহিল, উনি

শেষ প্রায়

সন্ন্যাসীমাতৃ, বৈরাগ্যগিরিতে পেকে গেছেন, স্তরাং খাবার দিক থেকে ঔর ক্রটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্ত। এমন সংসর্গেও যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক হয়ে উঠতে পারচেন না, সে ঔর আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে, তাই ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ঔর মনের মধ্যে একটুখানি পাপ থাক, উনি ধরাই পড়ুন একদিন—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা করে পূজা দেব।

তা হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বকচেন হরেনবাবু, ভারি বিস্ত্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কোঁতুহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারি রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বোধি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব নাকি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়, আর একটুখানি বেড়েচে এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তার অত্যন্ত অমুরাগ। ব্রহ্মচর্য্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনা-মাত্রই অহেতুক ভক্তি ও শ্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে উঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মুচ-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কোঁতুক বোধ করতেও অপারগ হন না। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই গুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বর ঔর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করেছিলেন, আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকেই চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার ক্ষুণ্ণ স্বর ইহাদের কানে গেল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল—অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নিঃসন্দেহ সংঘম, নীরব মিলাচার ও নির্বিশেষ তিতিক্স আছে যে দেখে বিশ্বাস লাগে। আপনার শিবনাথের

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ব্যাপারটা মনে আছে আণ্ডাবু? সে আমাদের কে, তবুও এতবড় অশ্রায় সহ হ'লো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যে আগুন ধরে গেল। কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে না-র মধ্যে বিদ্রোহ নেই, জালা নেই, উপরে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্রাণা নেই, ক্ষমার দস্ত নেই— দাক্ষিণ্য যেন অধিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অশ্রায়ই করে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল চমকে উঠে শুধু বললে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন থাকে সে ভালবেসেছিল তার প্রতি নিঃস্বমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলের চোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছন্ন হা-হতাশ নয়—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেল।

আণ্ডাবু নিখাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে রাগ হয় ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক অমুশাসন সব-কিছুকেই উপহাস করে উঠিয়ে দিতে চায়। বৃষ্টি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পরধর্মের ভাব বয়ে যাচ্ছে; তবুও ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা স্মৃনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অমুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থ-টাকে সোজা দেখতে পাচ্ছে।

আণ্ডাবু খুশি হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। তাই ওর যেমন কথা তেমনি কাজ। ও যদি মিথ্যে বুঝে থাকে, তবু সে মিথ্যের গৌরব আছে। একটু ধামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে, পাষাণ চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে থাকলে স্রায়ের মর্যাদা থাকত না। শুরোরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হ'তো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এমনি মায়ী-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবার যেন লক্ষী! হস্ত পুরুষের চেয়ে অনেকদিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কাছে এমনি সামান্ত করে রাখে যে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মন গলে গিরে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্তে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্বজন্মে কোন রাজরাণীর স্ততিপাঠক ছিলে, এ-জন্মে তার সংস্কার বোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে ও ব্যবসা ধরলে যে চের সুরাহা হ'তো।

শেষ প্রহ্ন

হরেন্দ্রও হাসিল, কহিল, কি করব বৌদি, আমি সরল সোজা মানুষ, যা ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করুন দিকি অজিতবাবুকে, একুণি উনি হাতের আঙ্গিন গুটিয়ে মারতে উত্তত হবেন। তা হোক, কিন্তু বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ, কি করেন হরেনবাবু। আপনার আশ্রম থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যেই দিন ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা হলে বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা ছাই তুলেই দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচতে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই। অন্ততঃ অক্ষয়টা বেঁচে থাকতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ি রওনা করে দিয়ে ছাড়বে।

আণ্ডবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখচি তোমরা তা হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিটকিরি হজম করা অসাধ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল কিন্তু সে ত মরল না। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্তে বার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জলে-পুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে।

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনারা সব জালা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আণ্ডন শুধু আমাদের জন্তেই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা নয় ত কি!

বেলা কহিল, সত্যই ত তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে একটি চমৎকার গল্প পড়েছি। আণ্ডবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েননি?

কই, মনে ত হয় না।

যে মাসিকপত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, জীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নিজের পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন।

ঐ ত স্নমুখের শেলুফেই রয়েছে ; এই বলিয়া সে বইখানা পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি ?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত—“একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম”।

বেলা কহিল, তার মানে ? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেলেন নাকি ?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারীদেহের ক্রমশঃ বিবর্তনের যে ছবি দিয়েছেন তা স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক।

অজিত কহিল, থাক। কিন্তু অস্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হলেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কোঁড়ুহলী হইয়া উঠিলেন—বেশ ত অজিত, বাদ-সাদ দিয়ে পড়া না শুনি। জলও খামেনি, রাতও তেমন হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ-সাদ দিয়েই পড়া চলে। গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুন না শুনি। অস্ততঃ সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া বাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সন্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভূমিকা আছে, তা সংক্ষেপে বলা আবশ্যিক। এ যার আত্মকাহিনী তিনি স্মৃশিক্ষিতা, স্মরণী এবং বড়বরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কি না গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদি বা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে—সে বহুদিন পূর্বে।

সেদিন তাঁকে ভালবেসেছিল অনেকে—একজন সমস্তার মীমাংসা করলে অস্বাভাব্য করে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেল বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলে না। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেছে যে, জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাব পায়ওনি। তার পরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠলো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে—থাক

শেষ প্রশ্ন

পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েছে এ ধারণাই যেন তার ছিল না। কুশল প্রশ্ন অনেক হ'লো, অভিযোগ-অনুযোগও কম হ'লো না; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার চোখের কোণ দিয়ে ঝাঁপন ঠিকরে বার হ'তো, উন্মত্ত-কামনার ঝঙ্কার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ দ্বার ভেঙে বাইরে আসতে চাইত, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, এ যায় না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন, না না, ইংরিজি নয়, অজিত ইংরিজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাঙলায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগল, তুমি এমনি করেই বাকিটুকু বলে যাও।

আমি পারব কেন?

পারবে, পারবে। যেমন করে বলে গেলে তেমনি করেই বল।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মত আমার ভাবার জ্ঞান নেই; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

“মেয়েটি বাড়ি ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ একান্তমনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন, এই নিষ্ফল প্রার্থনের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুক্ক-আশ্বাসে আর যেন না সে যত্ননা পায়। দেখা গেল, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হ'লো না, তবু নিঃসন্দেহে বুঝা গেল, সে ক্যানাডায় ফিরে যাক বা না যাক, সফাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও দুঃখ পাবে না, তাকেও দুঃখ দেবে না। দুঃসাধ্য সমস্যার আজ শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। চিরদিন ‘না’ বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ ‘না’ এলো আজ একেবারে উল্টো দিক থেকে। ছয়ের মধ্যে যে এতবড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও জ্ঞাবেনি। মানবের লোলুপ-দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে; আজ ঠিক সেইদিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে, শরীরধর্ম-বশে অবসিতপ্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তির আজ প্রতিরোধ করে থাকে—অভিযোগের কি আছে? অথচ বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট মূর্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালবাসা নয়,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়—এ-সব অল্প কথা। বড় কথা। কিন্তু যা বড় নয়—যা রূপজ, যা অশুভ, যা অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী—সেই কুৎসিতের জগৎও যে নারীর অভিজাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তাকে এমন নির্দম অপমানে আহত করতে পারে আজকের পূর্বে সে তার কি জানত ?

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ ত বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। তার পরে অজিত ?

অজিত বলিতে লাগিল, মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, কেবল ঐ মাহুষটিই ত নয়, বহু লোক বহুদিন ধরে তাকে ভালবেসেচে, প্রার্থনা করেছে, সেদিন তার একটুখানি হাসিমুখের একটিমাত্র কথাই জগৎ তাদের আকুলতার শেষ ছিল না। প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই যে তারা কোন মাটি ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিলতো না। তারাই আজ গেল কোথায় ? কোথাও ত যায়নি, এখনো ত মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগড়ে ? তার হাসির রূপ বদলে ? এই ত সেদিন, দশ-পনেরো বছর, কতদিনই বা, এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো ?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুই অজিত, হয়ত শুধু গেছে তার যৌবন—তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক কথা। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন ?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জানলেন কি করে ?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তার পরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের বড় আরশীর স্মৃখে আলো জ্বলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোষাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদলে গেল। এমন করে ধাক্কা না খেলে হয়ত এখনো চোখে পড়তো না যে, নারীর যা সবচেয়ে বড় সম্পদ—আপনি যাকে বলছিলেন তার মা হবার শক্তি—সে শক্তি আজ নিশ্চেষ্ট, ম্লান ; সে আজ সূনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েচে ; এ-জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার স্রাব সে-সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে ; কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য্য যে এমন স্বপ্নায়, এ-বার্তা পৌঁছিল তার কাছে আজ শেষ বেলায় !

শেষ প্রশ্ন

আগুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমনিই হয় অজিত, এমনিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে ?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আরশীর স্রমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনাস্ত দেহের স্মৃতি-স্মরণ বিশ্লেষণ আছে। একদিন কি ছিল এবং আজ কি হতে বসেচে ! কিন্তু সে বিবরণ আমি বলতেও পারবো না, পড়তেও পারবো না।

নীলিমা পূর্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, না না না, অজিতবাবু, ও থাক। ঐ জায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেচেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এই বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আগুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্য।

আগুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা বয়স তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলে না নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ ও তো কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসাব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ-কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুললে চলবে না।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুশি হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটি তিনি নিজেকে দিয়েচেন। বলেচেন—আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা করে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটি-মাত্র সত্য। এতে সাধনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো। ঐশ্বর্যের ভগ্নস্বরূপ হয়ত আজও কোন দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে-মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেমনি মিথ্যে। যে-রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে ‘শেষ হয়নি’ বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।

আর কেহ কিছু কহিল না, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারি সুন্দর লাগলো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেক্রমও একমনে গুনিতোছিল ; সেই মন্তব্যে খুশি হইল না, কহিল, এ আপনার ভাবাতিশ্যের উচ্ছ্বাস বোধি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুল-ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছায় না। রমণীর দেহ কি এমনি ভুচ্ছ জিনিস যে, এ-ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজনই নেই ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নীলিমা কহিল, নেই, এ-কথা তো লেখিকা বলেননি। হর্ভাগা মাহুসগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেলে না এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বলছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাকলে বুঝতেন ওর আতিশয্যাটা আজকাল কোন্‌দিকে চেপেচে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাকলেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন।

কিছু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ-কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেন না করুন, মাহুসের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মাহুসের প্রয়োজন জীব-জগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অভিক্রম করে বহুদূর চলে গেছে—তাই তো সমস্তা তার এমন বিচিত্র, এত দুর্লভ। একে চালুনিতে হেঁকে বেছে ফেলা যায় না বলেই তো তার মর্যাদা আশুবাবু।

তাও বটে! গল্পের বাকিটা শুনি অজিত।

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবে না আশুবাবু। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে উদ্ভয়টা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না, হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার তুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মাহুস, আপনার এই অনির্দিষ্ট টিলে-ঢালা কথার ঝাঁক দিলে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে আমার সহাবে না। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মাহুস, রূপের বিচারে হারলে তো তোমার লজ্জা নেই হরেন্দ্র।

না, সে আমি শুনবো না।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভাল হরেন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আবার বহুকাল পূর্বের একটা হৃৎখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুলভা; ছাড়াবের

শেষ প্রশ্ন

পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা-নির্ভর করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবন্তী, আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা করতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘটলো কিসে ?

আগুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়স তখন পরতাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়ে সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়স লুকিয়েছিলেন ?

আগুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁর নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কথা কারও মনে উদয় হয়নি। এমনি তাঁর দেহের গঠন, এমনি মুখের স্নকুমার স্ত্রী, এমনি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশি হতে পারে।

বেলা কছিল, আশ্চর্য্য! আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না ?

ছিল বই কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্য্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না। এ তাঁরই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত ?

তিনি আমারই সম-বয়সী—তখন বোধ করি আটাশ-উনত্রিশের বেশি ছিল না।

তার পরে ?

আগুবাবু বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক নিমিষেই যেন এই শ্রোতা রমণীর বিরুদ্ধে পাবাণ হয়ে গেল। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধা-সাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু-পরিমাণও নড়ানো গেল না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতেই পারলে না।

কণকাল সকলেই নীরব হইয়া রছিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো হলে বোধ করি অসম্ভব হ'তো না ?

বোধ হয় না।

কিন্তু ও-রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয় না ? তেমন পুরুষ কি সেদেশে নেই ?

শরৎ-সাহিত্যগ্রন্থ

আগুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ করি ছুর্ভাগ্য বিশেষণটা বিশেষ করে সেই পুরুষদের স্মরণ করে লিখেছেন। কিন্তু রাত্রি তো অনেক হয়ে গেল অজিত, এর শেষটা কি ?

‘অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। অত ভালবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলে না, এতবড় সত্য বস্তুটা কোথা দিয়ে যে এক নিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেচেন—একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম! নারীদের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারেই কবে ঘটে এর পূর্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবন নারী চিন্তাও করেননি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা ?

অজিত শান্তভাবে কহিল, আজ থাক। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অল্পদিন বলব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্ত থাক।

আগুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পরছিদ্রাশ্বেষী, এমন কি নির্ভুর হয়—তাই বোধ হয় সকল দেশেই মানুষে এদের—এই অবিবাহিত প্রৌঢ়া নারীদের—এড়িয়ে চলতে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আগুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত পতি-পুত্রহীনা ছুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চায়।

আগুবাবু ইহার জবাব দিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যারা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এতবড় সঙ্কটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবাহিত হয়ে যায় টেরও পান না।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যদেবতাদের ঈর্ষা করিনে আগুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌঁছায়নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে যারা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁদের পথের নির্দেশ কোন্‌দিকে আমাদের বলে দিতে পারেন ?

আগুবাবু কিছুক্ষণ শুকভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনিমাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশি শক্তি নেই।

শেষ প্রশ্ন

তারা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারের দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসম্ভাব নেই। এসব আমিও জানি, কিন্তু এর মাঝে নারীর নিরবরুদ্ধ কল্যাণময় সত্যকার আনন্দ আছে কি না আজও আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল ?

আগুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু খামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন দিন দুই-তিন হ'লো মনোরমা চলে গেছে, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ করে পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর করে ডেকে কাছে বসালুম। আমার ব্যথার জায়গাটা সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলে না। কথায় কথায় এই ধরনের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়ল, তখন আর তার হ'স রইলো না। তোমরা জানোই তো তাকে, প্রাচীন যা-কিছু তার পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণ। নাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলাই যেন তার passion। মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঁঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলুম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও-প্রবৃত্তি তো তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ও-তো স্বভাব না—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গে আমি কাণা-কড়ি বিশ্বাস করিনে আগুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, তবু বললাম, কমল, হিন্দু-সত্যতার মর্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতুম যে, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা এবং এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বললে, করতে দেখেচেন ? একটা নাম করুন তো ? সে এ-রকম প্রশ্ন করবে ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত মেনে নেবে। কেমনধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ ! আপনি আমার নামটা করে দিলেন না কেন ? মনে পড়েনি বুঝি ?

কি কঠোর পরিহাস। হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

শ্রী-সাহিত্য-সংগ্রহ

আগুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেন না, কহিলেন, না, মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—তেমনি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হ'তো, কিন্তু সে যখন মনে এলো না, তখন কমল বললে, আমাকে যে শিক্ষার খোঁটা দিলেন আগুবাবু, আপনাদের নিজের সম্বন্ধেও কি তাই যোলো আনায় খাটে না? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ বুলিই তো তারা সদর্পে আবৃত্তি করে ভাবে এই বুলি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বললে, সহমরণের কথা তো আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরত এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিত ছ'পক্ষের দস্তই তো সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকত যে, বৈধব্য-জীবনের এতবড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলুম না। কিন্তু সে অপেক্ষাও করলে না, নিজেই বললে, উত্তর তো নেই, দেবেন কি? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, প্রায় সকল দেশেই এ আত্মোৎসর্গ কথাটার একটা বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য অবস্থা ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নরনারী কারও জীবনেরই শ্রেয়: আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই—কিন্তু আর না, আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বললাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ-শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েচে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বললে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বললাম, তোমার মুখেই শুনেচি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ-কথা কি তিনি কখনো শেখাননি যে, নিঃশেষে দান করেই তবে মানুষে সত্য করে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

কমল বললে, তিনি বলতেন, মানুষকে নিঃশেষে শুধে নেবার ছরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্ভুক্তি যোগায়। দুঃখের উপলক্ষি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লভ্য শাসনের দুঃখ তো ও নয়—ওকে যেন স্বেচ্ছায় বেচে ধরে ডেকে আনা। অর্থহীন সৌখীন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা, তার বড় নয়।

শেষ প্রশ্ন

বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বললুম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন, এবং জগতের যা-কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে ?

কমল এ অহুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করছেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বললুম, তুমি যা বলচো, সত্যিই এ-শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাঁকে স্মৃতিচারণ করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্ত কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালবাসতে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে এ চিন্তের অক্ষমতা, এবং অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলে না। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ বলে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংঘমের কোন অর্থ-ই সেদিন দেখতে পাওনি।

কমল বললে, আজও পাইনে আশুবাবু, সংঘম সেখানে উদ্ধত আফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। ও তো কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংঘম—শক্তির স্পর্ধায় সংঘমের সীমাকেও ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংঘম যে আর এক ধরনের অসংঘম, এ-কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেননি আশুবাবু ?

ভেবে দেখিনি সত্য। তাই চিরদিনের ভেবে-আসা কথাটাই ধপ করে মনে পড়ল। বললুম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস করে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা তো মেটে না—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও-পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেছেন, ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ষে'ব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে। আশুনে ঘি দিলে যেমন বেশি জলে উঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বলতে গেলেন কেন ? তার পরে ?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বললে, শাস্ত্রে ঐ-রকম আছে নাকি ? থাকবেই তো। তাঁরা জানতেন জ্ঞানের চর্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্মের সাধনার ধর্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অহুশীলনে পুণ্যলোভ ক্রমশঃ

উগ্র হয়ে উঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকি—এও ঠিক ভেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ-ক্ষেত্রেও তাঁরা আক্ষেপ করে যাননি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার উপহাস ও বিক্রমে যেন হতবাক হয়ে গেলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই, কামনার নিবৃত্তি হতে পারে না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি খেমে বললে, কি জানি, এমন বাহ্যিক ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে—আর না। এর আসল সত্তা তো বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূল্য, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের বোগান দেয়। শাস্ত্রের ধিকার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।

বললুম, তা হতে পারে, কিন্তু যে রিপু, ওকে তো মানুষের জয় করা চাই ?

কমল বললে, কিন্তু রিপু বলে গাল দিলেই তো সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাঁদের কোন্ সত্তাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেচে ? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই তো দুঃখকে জয় করা নয় ? অথচ ঐ-ধরনের যুক্তির জোরেই মানুষ অকল্যাণের সিংহদ্বারে শক্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়। শাস্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হ'লো ও-বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হ'লো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মত কিছুই তো তার নেই—কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য হ'লো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না, শাস্ত্রমুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু। দুঃখ যে পাইনি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা ছিল তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েছি—আনন্দের সেই ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিন্তা-ছাচে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলিনি, শুকনো ঝরণার নীচে গিয়ে ভিক্কে-দাও বলে নৃগু হ'হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালবাসার আবু বধন ফুরালো, তাকে শাস্ত্রমানেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে

শেষ প্রশ্ন

তুলতে আমার প্রবৃত্তি হ'লো না। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাববেন এতবড় অপরাধ কমল মাগ করলে কি করে? কিন্তু অপরাধের কথাই চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হ'লো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিলে। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠল—এর সম্বন্ধে আমার প্রভেদ কতটুকু! বললাম, কমল, এমনি মণি-মাণিক্যের সম্বন্ধে আমরা আছে—সেই তো সাতরাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো তো?

কমল চুপ করে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ-জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে কমল? এমনিধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিতকণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য্য অন্ত গেছে বলে সেই অন্ধ-কারটাই হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতের আলোয় আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বলব এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করেই কি সাক্ষ করে দেবো?

বললাম, রাত্রি তো কেবল একটিমাত্রই নয় কমল, প্রভাতের আলো শেষ করে সে তো আবার ফিরে আসতে পারে?

সে বললে, আশুক না। তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন করব। বিন্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম, কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বৃষ্টি গিয়ে একস্রোতে মিশেচে। দেখলাম, না না, তা নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র—আমাদের সম্বন্ধে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্টও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর স্মৃতির পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তাই—যা আজও এসে পৌঁছায়নি। তাই ওর আশাও যেমন দুর্কার, আনন্দও তেমনি অপরাধের। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েচে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্যত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য্য মেয়ে! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলো না, কিন্তু এ-কথাও তো মনে মনে স্বীকার না

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

করে পারলাম না যে, এ তো কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা শিখেচে একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেচে। কতটুকুই বা বয়স, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়েসেই সম্যক উপলব্ধি করে নিয়েচে।

একটু খামিয়া বলিলেন, সত্যিই তো। জীবনটা সত্যিই তো আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান তো সেজন্য আসেনি। আর-একজন কেউ আর-একজনের জীবনে বিফল হ'লো বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বলব কি বলে ?

বেলা আশ্বে আশ্বে বলিল, সুন্দর কথাটা।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হ'লো, বৃষ্টিও কমেচে— আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিল না—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোট-খাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকি ছিল, কিন্তু আজ সে-সকল তেমনই অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়নকক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—এত কথা ও আলোচনার সমস্তটাই যেন নির্জন নিঃসঙ্গ গৃহের মাঝে আসিয়া তাহাদের কাছে বাপ্সা হইয়া গেল ; অথচ পরমার্শব্য এই যে, কাপড় ছাড়িবার পূর্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যেদিন নারী ছিলাম।

দশ-বারোদিন কমল আশ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কম-বেশি সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাঁধিল হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র অজিত উৎকর্ষার পাল্লা দিয়া এমনি শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাহাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইত না। অবশেষে তাহারাই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিন্দী সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরী লইয়া সম্প্রতি টুন্ডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর-দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে; অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর-সংসার শুছাইয়া দিতে তাহার এত-বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে, অপরাহ্নে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটিতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে-ও গাড়ীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারোদিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ-কথার তাৎপর্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেন না।

নীলিমা যেন আপন-মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে ভেজা, না-ভেজার প্রশ্নই ওঠে না; খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙাবার সমাজ নেই—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেমনি অক্ষুরস্ত। সেই রাজেন ছেলোটর সঙ্গে ক'দিনের বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাই হ'লো না, ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তার নিজের কর্তব্যে বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না ও তাই অনায়াসে পারলে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শুনে মনে হ'লো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে, অথচ মেয়েদের কত কথাই ত ভাবতে হয় !

আণ্ডবাবু বলিলেন, ভাবাই ত উচিত নীলিমা ?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বে-পরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে তো আমরাও পারি।

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আমিও পারিনে, আপনিও না ; কারণ জগৎ-সংসার যে-কালি গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও-ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেকদিন থেকেই এ-কথা ভেবে দেখেছি। পুরুষের তৈরী সমাজের অবিচারে জলে জলে মরেচি—কত যে জলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জলুনিই সার হয়েছে—; কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা তো আজকাল নরনারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশি আর এক-পা এগোয় না। কেন জানেন ? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তব্ব-বিচারে মেলে না, শ্রায়-ধর্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কৌদল করে মেলে না—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না—দেনা-পাওনার বস্তাই এ নয় ; কমলকে দেখলেই দেখা যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে দশ-বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইল না, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হ'লো না যে, এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে তার মর্যাদা হানি হয়। বলুন তো, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায় ? এ গৌরব আমাদের দিত কে ? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আণ্ডবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্য নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি করত ?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা করতো, রান্না-বাড়তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ করতো ; বস্ততঃ একলা-মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতো না।

শেষ প্রশ্ন

বেলা কহিল, তবে ?

নীলিমা বলিল, তবে কি ? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজ-কর্ম করব না, খোক-ছুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম্ ঘুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি ? স্বয়ং বিধাতার তো কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি ? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য ?

আগুবাবু গভীর বিন্ময়ে মুগ্ধ-চক্ষুে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন । বস্তুতঃ এই ধরণের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই ।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাকতে তো জানে না, তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো—আনন্দের ধারার মত সংসার তার উপর দিয়ে বয়ে যেতো ও টেরও পেতো না । কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড় চেপেচে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কেউ একটাদিনও সে-সংসারে তাকে ধরে রাখতে পারত না ।

আগুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই মনে হয় ।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্নের আওয়াজ পাওয়া গেল । বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদের গাড়ী ।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন-সংবাদ দিল ।

কয়দিন যাবৎ আগুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ খবর পাওয়ারাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গভীর হইয়া উঠিল । এইমাত্র আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া গুইয়া পড়িলেন ।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল এবং আগুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলুম আমার জন্ম তারি ব্যস্ত হয়েছেন । কে জানতো আমাকে আপনারা এত ভালবাসবেন, তা হলে বাবার আগে নিশ্চয় একটা খবর দিয়ে যেতুম । এই বলিয়া সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি স্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল ।

আগুবাবুর মুখ অন্তদিকে ছিল, ঠিক তেমনিই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেন না ।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ স্তম্ভ হইবার পূর্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ হয় নাই—তাই অভিমান । তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলছি আমার দোষ হয়েছে, আমি ষাট মানচি ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেন না, তখন সে সত্যই ভারি আশ্চর্য হইল এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-বচনে কহিল, আপনি আসবেন জানলে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতুম না, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারি হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে ?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের স্ত্রী, নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, সত্যই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবে না—তবে ভারি ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চারজনকে আহ্বান করেচেন। আচ্ছা, আজ তা হলে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েছে যে আজ গুর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা খুলে বলতে বাধত। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বলতুম, না তুমি বলে ডাকতুম ?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্কাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটু খটকা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে যাক। সাত-আটদিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম। আমরা কিন্তু ঠিক খোঁজা নয় পাবার জন্য যেন মনে মনে তপস্বী করছিলাম।

কিন্তু তপস্বীর গুরু গান্ধীর্ষ্য তাহার মুখে নাই, তাই অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্টি একটুখানি পরিহাস করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু ? আমি তো সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্রসমাজের কেউ তো আমাকে চায় না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আগুবাবু থাকিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয় তৌ এ অস্থবোধের জবাব তুমিই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে মজি করে চেয়ে থাকে তৌ এই নীলিমা। এতখানি ভাববাসা হয়ত তুমি কারও কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

শেষ প্রশ্ন

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও ষাইবার জন্ত নহে, এই ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত। বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এমনিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ তো, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই, আমিই ভার নিয়েচি বলবার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দুজনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, তাতে ঔর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ঔর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন, আগ্রায় এত লোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেন না কেন? জ্ঞানতঃ কোনদিন কোন অন্টার করেননি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ঔর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ঔর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বলতে পারেননি এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেচেন। বোধ হয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পার।

কমল উকি দিয়া দেখিল আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে; হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও শুক হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর তো এই, আর একটা?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখ্যোপশায়ের স্বাস্থ্যের জন্ত সকলেরই হুশিস্তা ছিল, তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন এবং পরে দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এইমাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার

জন্মে স্থির হয়ে আছে। আমাকে খুঁজছিলেন কেন? এর কোনটাই তো আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়মনে ভগবানকে ডাকছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাংলাদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবো না; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ি স্বশুরবাড়ি দুটোই তো খুঁয়েচি, এর ওপর উপরি-লোকসান যা ভাগ্যে ঘটেচে সে বিবরণ দিতে পারবো না—এখন ভগ্নীপতির আশ্রয়টাও ঘুচল। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই, যে-কটা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাইনে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাই দিতে বলব, না পাই মরব। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে শ্রোতের আবর্জনার মত আর ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারি হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ বলে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও, সেই তো আমার ভয়।

কমল কহিল, হলুম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবে না দিদি, আমি পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হোন।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এমনি করে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ঠুর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন আমি কি করতে পারি?

তোমাকে কিছুই করতে হবে না কমল, যা করবার আমি নিজেই করব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্তব্যে অপরাধ না করি। এ-বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেন না কি করে?

শেষ প্রশ্ন

আণ্ডবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেন না, কারণ অস্বীকার করার যো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশি পাক খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায় না। শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আণ্ডবাবুর দুর্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে—সেটা লোকে ভুলেচে।

কমল তাঁহার মুগ্ধের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে-দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আণ্ডবাবু। কিন্তু তাও যদি না হয়, পরিচয়টা কি সর্কাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই ?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ একমাত্র সন্তান, কি করে যে মানুষ করেচি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃহৃদয় সৃষ্টি করেচেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি তাঁকে পর্যাস্ত উপহাস করবে। তা ছাড়া তুমি বুঝবেই বা কি করে? কিন্তু পিতার স্নেহই তো শুধু নয় কমল, তার কর্তব্যও তো আছে? শিবনাথকে আমি চিনতে পেরেচি। তার সর্বনেশে গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে পারি এ-ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ে না। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দকও আশা করে।

কিন্তু এ-চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশি-দিন থাকবে না, সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন, তা হলে ?

তা হলে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, বিশ্বাস করার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যই স্থির করেচেন ?

হাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় আণ্ডবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ করে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না ?

কই, প্রশ্ন তো কিছুই করেননি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে যে শক্তিমান সে দুর্বলকে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসচে। এতে বলবার কি আছে ?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহিল না, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল ? সন্তানের সঙ্গে পিতার তো শক্তি-পরীক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি ? কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে, তবুও যে এতবড় কঠোর সঙ্কল্প করেচি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই তো ? সত্যিই কি এ তুমি বুঝতে পারোনি ?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেচি । কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে । কিন্তু দুঃখ নিবারণ করতে পারলেন না বলে কি রাগ করে তার দুঃখের বোঝা সহস্র-গুণে বাড়িয়ে দেবেন ?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয় । যে-লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেচেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় করে বিসর্জন দেবেন, ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেন না ?

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁহার মুখে আসিল না— শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল ।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই । স্বামী ত্যাগ করে যে-কেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখতে হয় ।

কমল কহিল, এ অন্তায় । বরঞ্চ আমি কামনা করি ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেম না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে । এমনি করেই মানুষে আপনাকে শোধরাতে শোধরাতে আজ মানুষ হতে পেরেচে । ভুলকে তো ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্তরিকে পথ খোলা থাকে । সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেকচে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই ।

মনোরমা কত্কা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দেহ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিমতির স্বরে কহিলেন; না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়ে না । কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারো না ?

আমি ? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল এবং ইহা স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার মিন্ধ কণ্ঠ মুহূর্তের জন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্তই । মীলিমার ক্রান্তি

শেষ প্রশ্ন

চোখ পড়িতেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, না, এ-ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবো না। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কিনা জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বলবো যে, খাইয়ে পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজের বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেচেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেননি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হস্তারক হতে যাব কিসের জন্তে ?

কথাটা আশুবাবুর ভাল লাগিল না, কহিলেন, তুমি কি তা হলে বলতে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য নয় ?

কমল কহিল, অস্তুতঃ ভয় দেখিয়ে নয় এইটুকু বলতে পারি। আমি আপনার মেয়ে হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ-জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে এইভাবেই গড়ে গিয়েছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এইদিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু আমি পিতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালবাসা দিতে পারে না—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এ ঋণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের অন্ত থাকবে না। কিন্তু তখন তাঁকে বাঁচাবে কিসে ?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাবনা ছিল, কিন্তু সে-ঘোর কেটে গিরে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষা করবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এ-সব কথার মার-প্যাচ কমল, বুদ্ধি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় করেই পেতে হবে, ওকালতির জোরে তার অব্যাহতি মিলবে না।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করছি না আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই—মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি, ভুল-ভেঙে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আসতে হবে না এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু তো ভরসা পাইনে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙবেই, কিন্তু তার পরেও যে তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে, তখন সে থাকবে কি নিরে ? বাঁচবে কোন্ অবলম্বনে ?

অমন কথা আপনি বলবেন না। মাহুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হ'ল, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ করে তোলে, নইলে আমিই বা আজ বেঁচে থাকতুম কি করে ? বরঞ্চ আপনি

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

আশীর্বাদ করুন, তুল যদি ভাঙে তখন যেন সে তাকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত করে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও চের বেশি বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ-জীবন অঙ্ককার দেখতে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্তব্য?

আমি মা হলে মেনে নিতুম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতুম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন করতুম না। মনে মনে বলতুম, এ-জীবনে যে-রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েচে, সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলুম না কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ-বাড়িতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, সে ত যথার্থ ভালবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ; এ মিথ্যে যেমন করে হোক নিবারণ করাই পিতার কর্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতি-গত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারেই সম্পূর্ণ বিফল হইল। যদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিতবোধ, সেই ভাল-মন্দ স্মৃৎ-দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা। অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিত, তথাপি আজও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই—সংসারে ইহার তুলনা বিরল, এ-সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন-জাতীয়।

• ইহার ভাল-মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটাদিনের জন্তও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্দ স্পর্শ করে নাই। নির্বিঘ্ন শান্ত ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধচিত্তে ইহার শুদগান করিয়াছে, এমনি দুর্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয়

শেষ প্রশ্ন

জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্ধি মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন্ স্পর্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জন দিতে সে উদ্ধত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিণাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষন্ন, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ-বিবাহে সম্মান নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার পরে ইহার ভিত্তি, এ স্বল্পকালব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাধিবার ঠাই রহিবে না—হয়ত সবই সত্য, কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে-বস্তু বাকি থাকিবে সে যে পিতার শান্তি-সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড় এ-কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একমাত্র ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কণ্ঠার চিত্তাকাশে মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাও হয়ত পিতার অনির্বাণিত দীপ-শিখাকে দীপ্তি ও পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরন্তর নতমুখে তেমনি বসিয়া আছে; বেশ বুঝা গেল এ লইয়া সে আর বাদামুবাদ করিতে চাহে না। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজন মৌনাবলম্বন করিলে তো অপরের মন শান্তি মানে না। বস্তুতঃ এই প্রোঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার, মুখে যাই কেন না বলুন, জোর আছে বলি। উদ্ধত স্পর্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা। কমলকে তিনি সব বুঝিয়াছেন ততই তাঁহার বিশ্বয় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হয়, অনিন্দিত; ভদ্র-সমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটে না, অথচ এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচে না।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা যুরোপিয়ান, তবু তুমি কখনো সেদেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেছি। অনেক ভালবাসার বিবাহ-উৎসবে যখন ডাক পড়েছে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে-বিবাহ যখন অনাদরে উপেক্ষায় অনাচারে অত্যাচারে ভেঙেছে তখনও চোখ মুছেছি। তুমি গেলেও ঠিক এমনি দেখতে পেতে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখতে পাই আশুবাবু। ভাঙার নজির সেদেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠচে, ওঠবারই কথা, এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝতে যাওয়াও তেমনি ভুল ; ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না ; বলিলেন, সে যাক, কিন্তু আমার এই দেশটার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি। যে-প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসচে তার সৃষ্টিকর্তাদের দূরদর্শিতা। এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের 'পরে নেই, আছে বাপ-মা গুরুজনদের 'পরে। তাই বিচার-বুদ্ধি এখানে আকুল-অসংঘমে ঘুলিয়ে ওঠে না, একটা শাস্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি তো মঙ্গলের হিসেব করতে বসেনি আশুবাবু, সে চেয়েচে ভালবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের স্মৃতি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তর্ক করে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্তর করচি ; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্যের প্রত্যুষের আবির্ভাব দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান। কিন্তু সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাকলে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসার পৌছবে না। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই, এখন করিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্তঃস্থ জানালাগুলো খুলে দেওয়া চাই। এ তো চোখের দোষ নয়, দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে যে-দিকটা খোলা আছে সেদিকে দাঁড়িয়ে আ-^১ চেয়ে থাকলেও এ-ছাড়া কোন-কিছুই কোনদিন চোখে পড়বে না।
১৩ হিস

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না কমল, আর একটুখানি ব'সো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই, অবিশ্রাম বৃকের ভেতরটায় যে কি করচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝতে পারি। তুমি কি যথার্থ-ই বলচ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুলী ব্যাপারটা হয়ে যাক ?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকে আমি তা কুলী বলতে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশোবার বোঝাতে চাচ্ছি কমল, এ মোহ, এ ভালবাসা নয়, এ-ভুল তার ভাঙবেই।

শেষ প্রশ্ন

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙে তা নয় আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙে পড়ে। তাই অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্রণস্থায়ী। এই জন্মেই ও-দেশের এত দুর্নাম, এত বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার মাঘলা।

শুনিয়ে আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বল কমল, তাই বল। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখেছি।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ-দেশের বিবাহ-প্রথা? তাকে তুমি কি বলো—সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙে না কমল?

কমল কহিল, ভাঙবার কথাও নয় আশুবাবু। সে ত অনভিজ্ঞ-যৌবনের ক্ষাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়—চোখ চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই-করা ঠাট্টা জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ না থাকলে তাতে সহজে ফাটল ধরে না। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারি মজবুত, সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইল না।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যিই হয়, সত্যিকার ভালবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকি থাকবে কি?

কমল বলিল, যে-স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরালো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শাস্তি ও সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু তার বেশি গুঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য ঠাকে ঐটুকুমাত্র দিয়েই বিদায় করতে আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ছুঁ বৃষ্টি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চ. ^{বৃষ্টি} বৃষ্টি জানে তার হিসেবের বাইরে বৃষ্টি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব ^{বৃষ্টি} বৃষ্টি যা হাতে থাকে মাণিকের মত তা হাতের মুঠোর মধ্যেই ধরে। বস্ত-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে, বলে ঐ ত সর্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলার হেতু আছে কমল। মণিমাণিক্য সকলের জন্ত নয়, সাধারণের জন্তও নয়। আপাদ-মস্তক সোনা-রূপার গয়না না পেলে যাদের মন ওঠে না, তারা তোমার ঐ একফোঁটা হীরে-মাণিকের কদর বুঝবে না। যাদের অনেক

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

চাই তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিত হতে পারে। অনেক ভার অনেক আয়োজন, অনেক জায়গা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্য্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে। কমল, আলোচনা বন্ধ থাক।

আগুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আশ্বে আশ্বে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই না হয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেন না। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভ-বুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারে না। ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। স্ত্রীর দুশ্চরিত্র স্বামী পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক, বেলার পক্ষে স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই আমি জোর করে বলতে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই, স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক করে তার ঠিকানা মেলে না।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্য্যের আশাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে-যাওয়াটাও এমনি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হ'তো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠত না—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সম্বন্ধ তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস, কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না—অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

ভীক্শ্বী কমল একনিমেষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, এ-সকল নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীপালোকে নীলিমার এলো-মেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্রামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত স্ত্রী ধারণ করিয়াছে এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সক্রমণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্য্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অন্তগমন, এ বৃথা—আরক্ত আভায় আকাশের যে-দিকটা আজ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব-পশ্চিম দিক-নির্ঘন না করিয়াই সে ইহার উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে আগুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখব, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও

শেষ প্রশ্ন

তুমি এ-ভাবে অবজ্ঞা ক'রো না। বহু বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেছে, মিথ্যে দিয়ে কখন এত লোককে ভোলানো যায় না।

• কমল অশ্রুমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়টাই বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্ছে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল পুত্রের জন্তই ভার্যার প্রয়োজন তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল এবং সেই অসত্যের পরেই ভিত্তি পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হ'লো না।

কিন্তু এ-কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটু-বাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃস্বই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী-জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এ মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেন না। এ আমার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আগুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্তে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বই কি কমল। কিন্তু সে ত মনিবের ফরমান-মত কাটা-ছাঁটা মানান-করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরার মধ্য দিয়ে বয়। তাই বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ধোঁচে না।

কমল কাছে আসিয়া আগুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আশ্তে আশ্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা বলে দিচ্ছি।

আগুবাবু কিছুই বলিলেন না, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরাজিতে emancipation বলে একটা কথা আছে; আপনি তো জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরী

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

করেনি, করেছিল আপনাদের মত যারা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন-দড়ি আলগা করে যারা আপন কণ্ঠা-সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যানু-সিপেশনের জন্ত যত কোঁদলই মেয়েরা করি না কেন, দেবার আসল মালিক যে পুরুষেরা—আমরা মেয়েরা নই, জগৎ-ব্যবহার এ সত্যটা আমি একটিদিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমারও নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর ক্রীতদাসের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল সেদিন মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদল করে, মুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জন করেনি। এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই নিয়ম; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব ত তাদেরই। মনোরমাকে মুক্তি দেবার ভার আপনার হাতে। মণি বিদ্রোহ করতে পারে, কিন্তু পিতার অভিশাপের মধ্যে ত সন্তানের মুক্তি থাকে না, তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেন না। এই উচ্ছ্বল প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্যাদার মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর ছুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তি ও স্নেহের সীমা নাই।

ফে-লোকটি ইহার পিতা তাঁহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি-অনুসারে সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইহারই উদ্দেশে ছুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন এবং কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ঋণকাল চূপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো। ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

শীতের সূর্য্য অস্ত গেল। সায়াকু-ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপ্পা হইয়াছে, একটা জরুরী সেলাইয়ের বাকিটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্বে সারিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি-একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধু-মহলে জানাজানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা সুরু হইয়াছে সেই নইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এমনিই একটা-কিছু যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

তাহার পর হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া অবশেষে এমন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলে না।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল, যেন মাথা তুলিবার সময়টুকু নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতকক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইল, বলিল, আশ্চর্য্য এই যে, শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়ল না।

কমল মুখ তুলিল না, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ তুমি এতই শাদা-সিদে যে কোন সন্দেহ করনি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে না-পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও কি পারবেন না?

অজিত বলিল, হয়ত পারি, কিন্তু সে তোমার মুখের পানে চেয়ে, এমনি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা হলে চেয়ে দেখুন, বলুন পারেন কি না।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জলিয়া উঠিল; কহিল, তোমার কথাই সত্য, তাকে অবিশ্বাস করনি বলেই তার ফল দাঁড়াল এই!

দাঁড়িয়েচে যানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণ হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন? এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ইহার পর অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনের অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বলতে জানো না ?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালবাসে, ওটা স্বভাব।

তা হলে সে-স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বলতে একটু শেখো, নইলে সংসারের কাজ চলে না।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে ও-পক্ষের অসুবিধেও এমনি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট কবিয়া টুকরিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড় বেশি, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হ'লো নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা প্রকাশ পেলো না হাত-পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালবাসলে যে কি করে সেইটা শুধু জানিনে। কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জ্বলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং তাদের হয়ে কৈফিয়ৎ দিতে পারব না, কিন্তু তারা ভালবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটে না—স্পষ্ট পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্তমানে অস্ত্রের খাওয়া-পরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্তে বাড়িওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট মজবুত করে গড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখে না। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অসুস্থ আঙ্গুল, আমরা ভেতরে আসতে পারি ?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রের। কিন্তু আমরা কারা ?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটিদিন মাত্র দেখেচ, তবু আশা করি তাকে ভোলনি ?

শেষ প্রশ্ন

কমল হাসিমুখে কহিল, না, শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা শাদা, আজ হয়েছে হলদে ।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণামাত্র, আর কিছু না। ও কাশীধাম থেকে সত্ত্ব-প্রত্যাগত, ঘণ্টা-দুয়ের বেশি নয়। ক্লাস্ত, তহুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয় ; তথাপি আমি আসচি শুনে ও আবেগ সংবরণ করতে পারলে না। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য্য, আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে ! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্বাঙ্কেই সমুপস্থিত। যাক, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি ত ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠল বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, ব'সো ; এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে বিধা করিতেছিল ; হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও হরেন্দ্র সহাস্তে কহিল, ব'সো হে সতীশ, জাত যাবে না। কাশী-ফেরত যত উঁচুতেই উঠে থাকো, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে এ-কথাটা ভুলো না।

না, সেজন্য নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজে না হরেন্দ্রবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মোহাস্ত মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়সেও ছোট, পাগুাগিরিতেও খাটো। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা, স্তুরাং—

হরেন্দ্র কহিল, স্তুরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহাস্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমত আমাকে না মেনে চলা। একজনের ত পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশি তৎ-সঞ্চয় করে ; ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠবো না। এখন ভাবনা কেবল অর্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোকেও ফিরিয়ে এনেচে। ইতিমধ্যে আচারনিষ্ঠার যে লেশমাত্র ক্রটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি ; শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্বী করালে ফিরে আসার গাড়ী-ভাড়াটা আমার আর লাগতো না।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে ?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা ! আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি-একটা নাম আছে— সতীশ জানতেও পারে, কিন্তু আধুনিককালের আঁকা শুক্রাচার্য্যের তপোবনে কচের

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ছবি দেখেচ? দেখনি? তা হলে ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবে না। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার তো হঠাৎ মনে হয়েছিল একদল কচ সার বেধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকচে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙে গেলে তারা না ধেয়ে মারা যাবে না, দেশের কোন একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্ছেন, এ কি সত্যি?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ হয় না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য-বস্তুটিকে তুমি চিনতেই পারো না। সেইটো তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে কি না সে তুমিই জানো; কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েচি যে, আমি যাই করি না কেন ওদের ভয় নেই। কারণ চতুর্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সংবাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ-খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থ-ব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু ভারতের সত্য-বস্তুটি আমাকে বুঝিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুললেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ করব না। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি?

সতীশ বিনীত-কণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবে না। কিন্তু তর্কের জন্ত নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটা-কয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবো না?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিল না, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাসা করে বললেন, আমি কানী-ফেরত, যত উচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উচু জায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই—আশ্রম ভাঙলে ক্ষতি হবে না, কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভাল করেই জানেন, সে আশীর্ষক বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল বা থাকলে আশীর্ষকের বন্ধু হতে পারিত না। তার মত ভারতের সর্বাঙ্গীন মুক্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পরম কল্যাণ

শেষ প্রশ্ন

আমারও কাম্য। এই আশার ছেলেদের সম্ভবত্ব করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠবাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া তো কখন সম্ভব সৃষ্টি হয় না। আর শুধু ছেলেরাই তো নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেছি। কষ্ট ওখানে আছে—থাকবেই তো। বহু শ্রম করে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই তো আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের তো কিছুই নেই।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেন্দ্রার আশ্রম যাই হোক না কেন, সে-সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব না, কারণ সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয় আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নির্ভা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ তো অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম এ-সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম নয়; জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ-যুগেও সে-উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমার বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্বলিত, তপস্বী-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি-জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল; সে প্রয়োজন আজও যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি এ-সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া বলিয়া একপ্রকার মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদু-কণ্ঠ সতেজ ও উদ্দীপনায় কালো-মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেইদিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক-চক্ষুে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যত মৌখিক আক্ষালনই করিয়া থাক, আশ্রমের বিগত গোরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেন্দ্রা, আমরা মরেছি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্য দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম-লাভের বিজ্ঞান আছে, এ-সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙতে চাচ্ছেন, কিন্তু ভাঙাটাই কি বড়? গড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশি বড় নয়? আপনিই বলুন?

‡ কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে ?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায় ? আপনাদের আশ্রমের শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ বস্ত্র লাভের ব্যাপারটা আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করছেন।

তাহার ক্রুদ্ধ মুখের চেহারা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করছেন মাত্র। ওটা ঠাণ্ডা স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব ! স্বভাব বলতেই ত কৈফিয়ৎ হয় না হরেন্দা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখান হয়। একে তো উপেক্ষা করা চলে না।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ঠাণ্ডা সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দায় নেই। বস্ত্র অতীত হয় কালের ধর্মে, কিন্তু তাকে হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠে না। যে বর্কর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যাস্ত পুঁতে ফেলতো, আজও যদি সেই প্রাচীন অমুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্তব্য নির্দেশ করতে চায় তাকে তো ঠেকান যায় না সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে তো বর্করের তুলনা হয় না হরেন্দা।

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেন্দা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জানো আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করা যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শত্রু কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করিনি হরেন্দা। আপনি তো জানেন আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাস্ত্রতত্ত্বপন্থাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে-উপাদান যে-সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি

শেষ প্রশ্ন

বিরাট সত্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখতে পাই, সেই ভারতের মজাগত ধর্ম, সেই আমাদের আপন জিনিস। সেই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই ঝাচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না-ও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই-রকম কথার উত্তরেই কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল; তাই নিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল—সেইদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিল তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যা উপাদান হয়ে তাকে নিশ্চিহ্ন করে সংসার মুছে দিলে; এতটুকু দ্বিধা করলে না। সেই অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব-পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত? তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণের সত্য ছিল না?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে হাজির করে দেয়, মুখ-ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেনদা, এ-সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল, আর কিছুই নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিককালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে আমি লজ্জার কারণ দেখিনে সতীশ।

সতীশ বহুকণ নিরীক স্বরুভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার, সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, তবে সেই স্বাধীনতার ভারতের তো জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অমূল্য করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু; বলিল, সতীশবাবু নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দিয়েচেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ-কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হ'তো না যে, ভাবের জগৎ বিশেষত্বের জগৎ মানুষ নয়, মানুষের জগতই তার সমাদর, মানুষের জগতই তার দাম। মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা-প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হ'লো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় তো হবে? তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নর-নারী ধন্ত হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন তো নবীন তুর্কীর দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরানো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরেছিল, ততদিন তার হয়েছে বারংবার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে, তার সমস্ত আবর্জনা ভেসে গেছে; আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিল, তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বিগত গৌরব আবার আজকের দিনেও ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করেনি তার বিবর্তন আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠলো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরও হবে। সতীশবাবু, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে এও তো না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এও তো সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে দিকার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু, মন্দ তো ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভাল সে, সেই আরও ভাল যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হনু, তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি, তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকী রয়ে গেল, ফরাসী-ইংরেজ এসে পড়ল বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে-প্রশ্ন থাক, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দস্তে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে যা পড়বে না আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

শেষ প্রশ্ন

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এমনি করে বলতে থাকলেই হবে সর্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙলায়—সে বেশিদিন নয়, বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে করে সত্য-ব্রহ্ম আদর্শ-ব্রহ্ম জনকয়েক অসম্পূর্ণ শিক্ষায় বিজাতীয় স্পর্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সহ্য নাই। প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়ল। সেই বিষম দুর্দিনে মনস্বী ষাঁরা স্বজাতির কেন্দ্রবিমুখ উদ্ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তাঁরা দেশের নয়, সমস্ত ভারতের নমস্। এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। স্মরণ হরেন্দ্র অজিত উভয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্কদের উদ্দেশে যখন নমস্কার জানাইল তাহাতে বিশ্বাসের কিছুই ছিল না। অজিত মৃদুভাবে বলিল, নইলে খুব বেশি লোকে হয়ত সে-সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জগুই সেটা হতে পারেনি, কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ চুপ করিয়াই আছে। হয়ত জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিল না। অজিতকে সে চিনিত, কিন্তু হরেন্দ্র যখন ইহার অক্ষুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্বের কথা-গুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জড়িমা এমনি বিসদৃশ শুনাইল যে সে নীরবে থাকিতে পারিল না। কহিল, হরেনবাবু, এক-ধরণের লোক আছে তারা ভূত মানে না কিন্তু ভূতের ভয় করে। আপনি তাই। এবং একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি। এমন অন্তায় আর কিছু হতেই পারে না। এদেশে আশ্রমের জন্ম কখনো টাকার অভাব হবে না এবং ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবে না, অতএব আপনি ছাড়াও সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া বলিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি সে গোঁজ তিনিও করেননি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল না, আমার মনে ছিল না। কামনা করি ধর্মকে যেন আমরণ এমনি ভুলেই থাকতে পারি, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী বলে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন এবং নমস্ বলে যাদের নমস্কার করলেন, স্বদেশের সর্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারি, এ-প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুলবে না।

সতীশের গায়ে যেন কে চাবুকের দ্বা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখন ওনেচেন কারো কাছে?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা হলে সেইটে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জ্ঞানা-টাকেই জানার শেষ বলে আমি ভাবতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিত-পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভাণ করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানেই হয় মানুষদের ভুল। ওর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়িতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে দরদ। অকেজো বলে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এই কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

কমল কহিল, পারি, শুধু দান নেবার বেলাতেই একটার বদলে অণুটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেছি। ও-শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমার সন্দেহ জন্মেচে। কিন্তু দীন-হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘর-ছাড়া করে এনেচে তাদের দিয়ে যে কি করব আমি তাই ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও তাদের পারব না।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই। কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ অলৌকিক কিছু একটা করে তুলতেও চাইবেন না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন করে তাদের বড় করে তোলে তেমনি করেই এদের মানুষ করে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল, ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি কমল। মাষ্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখা-পড়া শেখাতে হয়ত পারব, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কি না সেই আমার ভয়।

কমল কহিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত করে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রব্লেম আর সোজা জবাবটা পান না। সন্দেহ আসে, ওরা দেবতা গড়ে

শেষ প্রশ্ন

উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছ্বল পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সামনে থাকে না। পরায়ত্ত মন-গড়া অস্ত্রায়ের বোধের ঘাঁরা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত মলিন করে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা দেখে এসেছি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েচে কি? পেয়েচে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েচে অনধিকার, পেয়েচে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়, পুরুষেরাও তাকে বলে সুন্দর, সে আমার নয়, কিন্তু মেয়েদের সেই নিজেদের পশু, বিকৃতি পায়ের সৌন্দর্য্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয় তখন আশা করার কিছু থাকে না। আপনারা নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবারা কেমন আছ বল তো? ছেলেরা একবাক্যে বললে, খুব ভাল আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে, এমনি শাসন। নীলিমাদিদি আমার পানে চেয়ে বোধ করি এর উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক চাপড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ-কথার জবাব খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতে এরাই আনবে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক, কিন্তু রাজেন, সতীশ এরা তো যুবক? এরাও তো সর্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেন না, সুতরাং সেও যাক। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই তো বেশি পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ-শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ ক'রো না কমল, কিন্তু তোমার রক্তে তো বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা ইয়ুরোপিয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেচে। মা এদেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভাল। দেহে রূপ ছাড়া বোধ হয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় বলে জেনেচ।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেন না। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় করে নিয়ে কোন জাত কখনো বড়ো হয়ে উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুটলো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম তো আর জগৎ-ছাড়া নয়, সে-বিধান উপেক্ষা করে কারও বাঁচবার যো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বলবার দিন পাবেন, কেমন! বলেছিলাম তো! দিন-কয়েকের নাচন-কৌদন ওদের যে ফুরাবে সে আমরা জানতাম।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কিন্তু চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে সুবিমল হান্তে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেইদিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বলতে নেই হরেনবাবু। অতবড় জ্ঞাত যদি মাথা নীচু করে পড়ে, তার ধুলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজে দুর্দিনের আভাস পাচ্ছি। অনেক আলোই নিবু-নিবু হয়ে আসচে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালাবার বিপ্তে শেখোনি। আচ্ছা চললাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি উঠি করিল, কিন্তু উঠিল না।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না পড়ে চোখের ওপর পড়লে খানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেবায় তাকে বন্ধ বলে জানবেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময় মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুরুণে হয়েছিল। সে প্রত্যয়ের জোর আমার নেই, তবু বলতে পারি, যত বিপ্তে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক ভারতের কাছে সে-সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাশে প্রমোশান না-পাওয়া ছেলের এম-এ পাশ করাকে ধিকার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্যাদাবোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা বলেও তেমনি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু এই ভারতই একদিন লকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াতে। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতে সেই শিককের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিল না, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেচে। কিন্তু কোন্ মহা-অতীতে একজনের পূর্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল এবং কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে এ আলোচনার সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার! আজ আসি। বলিয়া বিষম গম্ভীর-মুখে নিজাক্ত হইয়া গেল।

আট-দশদিন পরে কমল আশুবাবুর বাটিতে দেখা করিতে আসিল। যাহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাহাদের জীবনের এই কয়দিনে একটা বিপর্যয় ঘটয়া গেছে। অথচ আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এসো-মেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল; ইহার পরিণতি সন্দেহে বিশেষ সংশয় ছিল না, ঘটিলও তাই।

ফটকের দরওয়ান অল্পপস্থিত। বাটির নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ কেহ বসিত না, তথাপি খানকয়েক চৌকি, সেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙান ছিল, আজ সেগুলি অস্তহিত। শুধু ছাদ হইতে লক্ষমান কালি-মাখান লঠমটা এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জনা জমিয়াছে, সেগুলি পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিল না। কেমন একটা শ্রীহীন ভাব; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্নের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিল না, পর্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই; একটু বেশিমানায় খুশি হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন, কমল যে! এসো মা, এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ষা লাগিল—এ কি! আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন—বুড়ো? সে তো ভগবানের আশীর্বাদ কমল। ভেতরে ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় তাঁর পড়ার মতই করণ।

কিন্তু শরীরটাও তো ভাল দেখাচ্ছে না।

না। কিন্তু আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ কমল?

ভাল আছি। আমার তো কখনো অসুখ করে না কাকাবাবু।

তা জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ তোমার লোভ নেই। কিছুই চাও না বলে ভগবান ছ'হাতে চেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখলেন বলুন তো?

আশুবাবু কহিলেন, এ তো ডেপুটির আদালত নয় মা, যে, ধমক দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি যে ছনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি। তাই তো আজ সকালে খলি ঝেড়ে ফর্দ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, শূন্তের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবিল ফাঁপিয়ে রেখেচে—অন্তঃসারহীন খলিটার মোটা চেহারা মাহুঘের চোথকে কেবল নিছক ঠকিয়েচে, ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোক শুধু ভুল করেই ভাবে মা, গণিত-শাস্ত্রের নির্দেশে শূন্তর দাম আছে। আমি তো দেখি কিছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটি হয়, শূন্তর সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্ত কোটি হয়ে ওঠে না। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিল না, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান-হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই তো যাবার সময় হ'লো, কাল-পরশু যে চললাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাবতে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুলবে না।

কমল কহিল, না ভুলব না। দেখাও আবার হবে। আপনার খলিটা শূন্ত ঠেকচে বলে আমার খলিটা শূন্ত দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি-সত্যিই পদার্থ—মায়।

আশুবাবু এ-কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েচে তা বাড়িতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবে না। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়। এবার একটুখানি দূরে যাবো কল্পনা করেছি। পুরানো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অসুদৃষ্ট সর্বনাশের উদ্দিষ্ট, যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিয়া বেদনা দেখুয়াও নিশ্চয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবে না। এই অকর্মণ্য দেহটার দাম তো ভারি, এটাকে বয়ে বেড়াবার অভূহাতে আমি মাহুঘের কাছে

শেষ প্রশ্ন

খণ আর বাড়াবো না। কিন্তু কে জানত কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন করেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জার মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এতবড় বিশ্বয়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাবতে পেরেচে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমা দিকদিকে দেখচিনে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আণুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন, কাল সকাল থেকেই আর দেখতে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

তাঁর আশ্রমে?

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার-পাঁচজন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে এই তার কল্পনা। তুমি শোননি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুনবে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যাবেলায় ভদ্রলোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্তমনস্ক, বড়-একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কৰ্ম-চারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ করে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম, হয়ত এই আমার শেষ উইল, এটনিকে দেখিয়ে নাম সহায়ের জন্ত এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অশ্রান্ত আদেশও ছিল। নীলিমা কি-একটা সেলাই করছিল, ভাল-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চোকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েচে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত শাদা। কি যে হ'লো হঠাৎ ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল চোখে-মুখে ঝাপটা দিলাম, পাখার অভাবে ধবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম, চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশি নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বসলো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল, তার পরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হু হু করে কেঁদে উঠল। সে কি কামা! মনে হ'লো বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম, কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়ল, আমার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আগুবাবু একমুহুর্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট ছই-তিম । এ অবস্থায় তাকে কি যে বলব আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়াল, একবার চাইলেও না, ঘর থেকে বার হয়ে গেল । না বললে লে একটা কথা, না বললাম আমি । তার পরে আর দেখা হয়নি ।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আপনি আগে বুঝতে পারেননি ?

আগুবাবু বলিলেন, না । স্বপ্নেও ভাবিনি । আর কেউ হলে মনেহ হ'তো এ শুধু ছলনা, শুধু স্বার্থ । কিন্তু এ'র সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ । এ কি আশ্চর্য্য মেয়েদের মন ! এই রোগাতুর জীর্ণ দেহ, এই অক্ষম অবসন্ন চিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্নবেলায় জীবনের দাম যার কাণাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিশ্বয় জগতে কি আছে ! অথচ এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয় । এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে বেদনার ও অকপট লজ্জায় নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন । কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না । ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকি দিন কটা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয় । শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা ।

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ-বিচ্ছেদের যখন মামলা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম । কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিল । তার পর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ করতে পারছিল না । নিজের স্বামীকে এমনি করে সর্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ করে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলে না । ও বলে, তাঁকে ত্যাগ করাটাই তো বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই জীবন পরম সার্থকতা । আমাদের শোধ নেওয়াতেই জীবন সত্যিকার মর্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও তো কষ্টিপাথর, ওতে যাচাই করেই ভালবাসার মূল্য ধার্য্য হয় । আর এ কেমনতর আত্মসম্মান-জ্ঞান ? যাকে অসম্মানে দূর করেচি, তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম ? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলো না ? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অত্মীয়, এ বাড়াবাড়ি । আজ ভাবি, ভালবাসার পারে না কি ? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ । ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা । সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্মমর্যাদা-বোধের টগু-অব-ওয়ার ।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রছিল ।

শেষ প্রাণ

আগুবাবু বলিলেন, কমল, তুমি ওর আদর্শ, কিন্তু তাঁদের আলো যেন সূর্য-কিরণকে ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েচে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধ-মাধুর্যে কতদিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই ছোটো দিনে আমি দুশো বছরের ভাবনা ভেবেচি কমল। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি; কিন্তু নারীর ভালবাসার সে কেবল একটিমাত্র দিক, এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করচে। এর কত বাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে সকল দিকে আঁধার করিয়াছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আগুবাবু বলিলেন, ভাল কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অহুমতি দিতে পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্বাদটুকু রেখে যাবো, দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ত্রাস্তি-ভালবাসা—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল।

এমনভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিল, অনেকক্ষণ পরে মৃদু-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমাদিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

আগুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিসে যেন তাঁহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখ মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারব না। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই। কিন্তু কখনো এ-সংশয় আসেনি যে, একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালবাসাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সেও যেমন সত্যি, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আমার তেমনি সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আশ্রয়ধনা বলতে পারব না। এ তর্কে মিলবে না, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষ এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই! সে আমার করণার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথো, সৃষ্টি মিথো।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়বার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার ব্যর্থ

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দিনগুলোকে শূলের মত বিধবে। ভাবি, সে আর যদি কাউকে ভালবাসত। এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল-সংশোধনের দিন তো আর শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি-রকম? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে করো?

অসম্ভব তো নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘটতে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে করেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মত মেয়ে?

কমল কহিল, তা জানিনে। কিন্তু যাকে পেলে না, পাওয়া যাবে না, তাকেই অরণ করে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক এই কি তার জন্য আপনি প্রার্থনা করেন।

আগুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, প্রার্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবে না কমল। আমি যা পারি, তুমি তা পার না। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন। এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেচে তাদের উপেক্ষা করা চলে না, তৃষ্ণার শেষবিন্দু জল এ-জীবনেই তাদের নিঃশেষে পান করে না নিলেই নয়; কিন্তু আমরা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত—উপুড় হয়ে গুয়ে খাবার প্রয়োজন হয় না।

কমল শাস্তকণ্ঠে কহিল, এ-কথা মানি কাকাবাবু। কিন্তু তাই বলে ত আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারব না। আকাশ-কুম্বমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য্য থাকবে না। যে-জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ-বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে, শোভায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এমনি করেই আপনারা আনন্দ থেকে, সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেচেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ করে দিয়েচে। নীলিমাদিদির দেখা পাবো কি না জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আগুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—যাচো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

শেষ প্রহর

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে তো আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনি। দেহ-মনে যখন আপনি অজস্র লীড়িত, সাক্ষর্য দেওয়াই যখন সমচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি মেন কেবলি আশ্রয় দিতে থাকি। তবুও কারণ চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসিনে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া নীলিমা, এই কি সহজ বিষয়! কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল স্মিত-মুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই, তাই! চোরাবালি নিজের দেহেরও ভার বহিতে পারে না, পায়ের ভলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নিরেট মাটি লোহা-পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার উপরেই চলে। নীলিমা দিকে সব মেয়েতে বুঝবে না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাথিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায় তারা ওকে বুঝবে।

হঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, সেদিন থেকে তাঁকে সত্যি করে বুঝেছি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে—জালা নিবেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই তো তাদের স্মৃতিতে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে চেয়েছিলাম। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ, নইলে ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে ছুঁতে পারে নিয়ে চলে ওদের হৃদয়ের লীলা, তার পরে সেটা ফুরায় বলেই স্বপ্ন গলায় ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে, নইলে বাজতো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি তো জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায়নি, মগি আপনি ভুলেচে। সূর্যাস্ত-বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে কাকাবাবু, সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বলবে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মাসখের দিন চলে না না, উপমা দিয়ে তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি বল তো?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাই তো ঘুরে ঘুরে একটা প্রহরই বারে বারে আসচে কাকাবাবু, শেষ আর হচে না, বরঞ্চ যাবার সময় আপনার এই আশীর্বাদটুকুই রেখে যান, মগি যেন রুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। বা বরবার তা করে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারেও অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশি নয়; ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেই দিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে ট্রাজিডি। দেশান্তরে যাবার পূর্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বোঁঠাকরুণকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন, আমি গাড়ী আনতে পাঠিয়েছি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখনি? কিন্তু বেলা তো নেই।

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট-পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়, আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন।

উনি লিখেছেন, “ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পার আমাকে জানিও। কিন্তু কাল ব’লো না যে আমাকে জানাননি কেন?
—নীলিমা।”

আশুবাবু শুরু হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট আত্মীয় বলে আমি দাবি করতে পারিনি, কিন্তু ওকে তো আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয় না।

তোমার বাসাতেই থাকবেন?

হাঁ, অন্ততঃ এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ-বাড়িতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে ও-বাড়িতে দোষ হবে না।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ-কথা বলিলেন না যে এতকাল এ স্মৃতি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেমনাহেবের জিনিস-পত্রের জগ্ন ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাও গে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ-বাড়ি থেকে বেসা চলে গেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ওর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে

শেষ প্রশ্ন

দিতে ভুলেচি কমল। বেলার স্বামী এসেচেন নিতে, বোধ হয় ওদের একটা reconciliation হ'লো।

° কমল কিছুমাত্র বিশ্বয় প্রকাশ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেন না যে!

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্ম-গরিমায় বাধলো। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামলা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে সম্মতি দিয়েছিলুম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য্য হ'চ্চ কেন কমল? চরিত্র-দোষে যে-স্বামী অপরাধী তাকে ত্যাগ করায় আমি অশ্রয় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মানতে পারিনে।

কমল নির্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির এই সুরে বাঁধা, এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিল না, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কমল তেমনিভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্তা কিছুই হইল না। যাবার পূর্বে আন্তে আন্তে বলিল, শুধু যত ছাড়া এ-বাড়িতে পুরানো কেউ আর রইল না।

যত?

হ্যাঁ, আপনাদের পুরানো চাকর।

কিন্তু সে তো নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন-পাঁচেক হ'লো ছুটি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হইল না। আশুবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই রাজেন ছেলোটর কোন খবর জানো কমল?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাই-বোন, যেন একই গাছের দুটি ফুল। এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকা-কড়ি, ঔষধ-সম্পদ অপরিমিত, কোথায় যেন অন্তমনস্কে সে-সব ফেলে এসেচ। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই, এমনি তাচ্ছিল্য।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কমল সহাস্তে কহিল, সে কি কাকাবাবু! রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ছ'পয়সা পাবার জন্তে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুনতে পাই। তাই বসে বসে ভাবি।

সেদিন বাসায় ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, তুমি নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকেনি, আজও সে ছেড়ে থাকবে না। নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি স্নমুখের দেওয়ালে টাঙানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌছিয়া দেখিল সহজে উপরে যাইবার যো নাই, রাশিকৃত বাস-তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বৃকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া গুনিল পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে; উকি মারিয়া দেখিল অজিত হিন্দুস্থানী মেয়েলোকটির সাহায্যে ঠোঁতে জল চড়াইয়াছে এবং চা চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দিকে আতি-পাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল, চা-চিনি কি তুমি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ না কি? জল মুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরি করে দিচ্ছি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাস-তোরঙ্গ, পোটলা-পুঁটলি, এ-সব কার? আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবার নোটিশ দিয়েছেন। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতে দিন কেটেচে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বের করেচি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন। কিন্তু ওগুলো কি নীচেই গড়ে থাকবে? চুরি বাবে যে!

গুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, যায়নি তো, একটা চামড়ার বাসে অনেকগুলো টাকা আছে।

কমল বাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভাল। একজাতির মানুষ আছে তারা আশি বছরেও সাবালক হয় না। তাদের মাথার উপর অতিভাষক একজন চাই-ই। এ

শেষ প্রহর

ব্যবস্থা ভগবান কৃপা করে করেন। চা থাক, নীচে আসুন। ধরাধরি করে তোলাবার চেষ্টা করা যাক।

২৭

বাড়িওয়ালা এইমাত্র পুরামাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাচিশের ইজিচেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। সুখ শুক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে স্নেহের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধা-ছাদা জিনিসগুলোর ফর্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতার কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই, যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশি নীরব।

সাক্ষ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ আসিল হরের নিকট হইতে। লোকের হাতে নম্র—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায়-উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা—কমল, নিশ্চয় এসো ভাই।—নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, যাবে না কি?

যাবো বই কি। নিমন্ত্রণ জিনিসটা তুচ্ছ করতে পারি আমার এত দর নম্র। কিন্তু তুমি?

অজিত বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা ভেয়ন—

তবে কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখ তখনও চিঠির 'পরে ছিল। নইলে কমলের স্টোলের কোদে কোতুক-হাস্তের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক, বাঙালী-মহলে খবরটা জানাঙ্গানি হইয়াছে যে উভয়ে আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কিতাবে ও কোথায় এ-সম্বন্ধে লোকের কৌতুহল এখনো অনিশ্চিত মীমাংসায় পৌছে নাই। অকালের মেঘের মত কেমন আন্দাজ ও অসুস্থানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ জানা কঠিন ছিল না—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা দাঁতে পারিত তাহাদের গম্য স্থানটা আপাততঃ অসুস্থসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙলো-বাড়ি তৈরি করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়িটা ভাড়া খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে; এই বাড়িতেই ছ'জনে কিছুকাল বাস করিবে। মাল-পত্র যাইবে লরিতে এবং পরে শেষরাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথমদিনের স্মৃতি—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেরুর ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি ?

যাই না ? আশ্রমের দোর তো খোলাই রইল, যবে খুশি দেখা করে যেতে পারবে। কিন্তু আমার তো সে আশা নেই, শেষ দেখা দেখে আসি গে, কি বল ?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেথায় নানা ছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইসারায় আজ শুধু একটিমাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, ইহারই সম্মুখে এই একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মত কাপুরুষতা আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ী কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেরুর বাসায় দ্বিতলের সেই হল-ঘরটায় নূতন দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জলিতেছে অনেকগুলো, কোলাহলও কম হইতেছে না। মাঝখানে আশুবাবু ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জন-কয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অশ্রদ্ধ কাজে নিযুক্ত।

হরেরুর ঘরে ঢুকিল এবং ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময়ে কলস্বরে সম্বন্ধনা করিল, কমল যে ? কখন এলে ? অজিত কই ?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুকিয়া পড়িল। কমল দেখিল, যে ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনি আর কহ নহেন স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইন্দ্রুয়েণ্ডা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ-দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিত না। ছঃখ থাকিয়া যাইত।

শেষ প্রশ্ন

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেননি, শরীরটা ভাল নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।
অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

• নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। দেখছিলাম, ধর্মকে তো ফাঁকি দিলেন, কর্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কি না? এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষার বনু-লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া মাটি ফুড়িয়া উর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতায় ভয়ও নাই, ভাবনাও নাই, যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহ্যিক। ঘরে আসিয়া বসিল, কতটুকুই বা। তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল ভিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রের কথায়। আর দুটি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ক্রটি ঘটিল, কিন্তু আবেগভরে বলিয়া ফেলিল, এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হ'লো। কমল ছাড়া ঠিক এমনি কথাটি আর কেউ বলতে পারতো না।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন-শাস্ত্রের কোন্ সূত্র তত্ত্বটি এতে পরিষ্কৃত হ'লো শুনি?

কমল সহাস্ত্রে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিনতে পার তো?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হ'লো। চিনতে তুমি পারচ তো অক্ষয়?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অগ্রায় আশুবাবু। মাহুষ-চেনা গুর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা গুর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে, এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিল না। কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রের ছিল না, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিস্ত্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই শহর থেকে হয়ত বা এদেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্ছেন; গুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মাহুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ গুর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্তের মধ্যে গুরকে বিদায় দিতে পারি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কথা কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহনীয় শ্রোতা ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যানুগত তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেরই অল্প কথা গাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয়, খবর পেয়েচ বোধ হয় হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটা আর নেই? রাজেন আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, 'সেদিন সতীশ গেছেন'। 'যে ক'টি ছেলে বর্তমানে আছে, হরেন্দ্রের অভিনাথ ভগতের সোজা পথেই তাদের মাহুষ করে তোলেন। তোমরা সকলে অমেরুদণ্ড অনেক কথাই বলেচ, কিন্তু কল হয়নি। তোমাদের কর্তব্য কমলকে কতকটা দেখা।

অক্ষয় অন্তরে অলিয়া গিয়া শুক হাসিয়া বলিল, শেষকালে কল কল ওর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য্য হয়ে য়া়নি। 'এইটি অনেক পূর্বেই অহুমান করেছিলাম'।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই তো। মাহুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আমার মনে হয় তাড়বার প্রয়োজন ছিল না। সকল ধর্ম্মমতই তো মূলতঃ এক, সিদ্ধিলাভের জগু এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলা। যারা মানে না বা পারে না, তারা না-ই পারল, কিন্তু পারার অধ্যবসায় থাকে তাদের নিরুৎসাহ করেই বা লাভ কি? কি বল অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার তো এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হ'লো না আশুবাবু, বরঞ্চ হ'লো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন করে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতাম না। কিন্তু তা তো নয়, আচার-অনুষ্ঠানই যে মাহুষের ধর্ম্মের চেয়েও বড়—যেমন বড় রাজার ঠেয়ে রাজার কর্ম্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্তে কহিলেন, তা যেন হ'লো, কিন্তু তাই বলে কি তোমার উপমা'কেই যুক্তি বলে মেনে নেবো?

কমল যে পরিহাস করে গাই তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশি নয়? সকল ধর্ম্মই যে আসলে এক, এ আমি মানি। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ও সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। সৃষ্টির মধ্যে ওকে তো পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মাহুষের বিবাদ নেই, বিবাদ

শেষ প্রশ্ন

রাখে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল করে বংশধরের জন্তু রেখে যাওয়া চলে। তাই তো জীবনের প্রয়োজনে ও চের বড় সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ তো সবাই জানে, কিন্তু তাই বলে কি মানতে পারে? আপনিই বলুন না অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল, ত্রুটু অক্ষয় কঠোর কিছু-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না।

আণ্ডবাবু বলিলেন, অথচ তোমারই যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারি অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না? তাই তো তোমাকে বোঝা এত শক্ত।

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সামনের পর্দাটা সরিয়ে দিন, আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝতে বিলম্ব হবে না। নইলে আপনার মেহই বা আমি পেতাম কি করে? মাঝখানে কুয়াসার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু তো পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্তন। কালের ধর্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতে চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি বলেই তো। মিথ্যে বলে জানলে মিথ্যের সুর মিলিয়ে মিথ্যে শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারা-জীবন মেনে মেনেই চলতুম—একটুকুও বিদ্রোহ করতুম না।

একটু খামিয়া কহিল, ইয়ুরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করে দেখুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচার-অনুষ্ঠানে। পুরানোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার পূজো, ভেতরে গেল না শেকড়, সখের ফ্যাশান গেল হু'দিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এমনি করেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সামলেচেন। বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিকমত আজও সায় পায় না, মনের মধ্যটা রহিয়া রহিয়া ভারি হইয়া উঠে। কহিল, মুঞ্চিল এই যে, তুমি ভগবান মানো না, মুক্তিতেও বিশ্বাস কর না। কিন্তু যারা তোমার এই অজ্ঞেয় বস্তু-সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার-পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেললেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ার আমি অহঙ্কার করিনে। সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেল আমি নিজের দুর্বলতাকে অসুভব করেছি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তা হলে ভাল করেননি হরেনবাবু। বাবা বলতেন, যাদের ভগবান যত স্নেহ, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশি জড়িয়ে। যাদের যত স্নেহ যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট করে আনলেও লাভ হয় না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেছি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাবতেন, ছুনিয়ার বয়স থেকে হাজার-দুই বছর মুছে ফেললেই আসবে পরম লাভ। এমনি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলাতের পিউরিটান এক দল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী যুচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুলবে বাইবেলের সত্যযুগ। তাদের লাভের হিসাবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানে না শুধু মঠ-ধারী দল যে বিগত দিনের দর্শন দিয়ে যখন বর্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেছি, কিন্তু ভাঙা আশ্রমে বাকি রইলেন ঠাা তাদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়, ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রছিল, এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে-যুগের ইতিহাসে সে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল, যত উজ্জ্বল হোক, তবু সে ছবি, তার বড় নয়; এমন বই সংসারে আজও লেখা হয়নি আশুবাবু, যার থেকে তার সমাজের মথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনার গর্ভ করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগেও না। রামায়ণ-মহাভারতে যত কথাই লেখা থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়া যাবে না। পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি নিয়েই ত মানুষ? তারা যে আপনার চারিদিকে। কমল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখো-মুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আন্তে আন্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারিনে, তাকেও অন্তরে অবজ্ঞা করিনে। এই গৃহেই মেয়েদের ঠাার রুদ্ধ ছিল, শুনেছি একদিন

শেষ প্রায়

তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ হানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল। কিন্তু আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

• একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোষাক; মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস; কহিল, দিদি বলচেন, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, ঠাই হবে ?

অক্ষয় বলিল, হবে বই কি হে। বল গে, রাতও তো হ'লো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বোঁঠাকরণ আসা পর্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয় না, ঔঁর তো কোথাও জায়গা ছিল না, কিন্তু সতীশ রাগ করে চলে গেল।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্তের জন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ সতীশেরও অন্য উপায় ছিল না। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী—এ-সম্পর্কে তার সাধনার বিষ। কিন্তু আমরাই যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভাল হ'লো সব সময়ে ভেবে পাইনে।

কমল অকুণ্ঠিত-স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্ব্বহ। এই বলিয়া সে পলকের জন্ত আশুবাবুর প্রতি চাহিল, হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু হরেন্দ্রকেই পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকেই সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পূজো বারে বারেই ঘাড় হেঁট করে আত্মপূজোর নামে আসে। এ-ছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ তো শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়, এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্ধেককে বাদ দিয়ে যখন দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখন দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও ক্ষোঁয়ায়। সতীশবাবুদের জন্ত দুশ্চিন্তা রাখবেন না হরেনবাবু, ওদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিন্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিত না, তাই শেষের কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল—আত্মদর্শন। অর্থাৎ আপনাকে নিগূঢ়ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা, সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানো না; কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজদের বঞ্চিত করে না রাখলে তারা একাধি চিন্তা-যোজনায় সফল হয় না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

পরস্পরায় পাণ্ডিত্য সংস্কার, কমল। এই তো যোগ। আসমুদ্র-হিমাচল অবিচলিত
প্রকায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।
বাহিরের সর্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দু-চিত্ত
নির্ঝাত-দীপশিখার ছায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি
করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। সঙ্কোচ আর কিছু
জন্ম নয়, শুধু এই সত্যব্রত সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না
পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্য নয়? তখন
সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না আশুবাবু, সত্য নয়। শুধু তো হিন্দুর নয়, এ
বিশ্বাস সকল ধর্মেরই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই তো কোন-কিছু
কখনো সত্য হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়, মৃত্যু-বরণ করার জোরেও নয়।
অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে।
তাদের জ্বিদের জোরকেই সপ্রমাণ করেছে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি।
যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ
এবং আত্ম-চিন্তাই হয় তো এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার
দিয়ে সংসারে যত ভ্রম, যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে
না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্বার আসিয়া জানাইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্ত নিরালস্য পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্ছেন। পরিচিত সকলের বাড়িতেই আপনি এক-আধবার গেছেন; শুধু আমারই ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে নয়, 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করে না, অভিমানও করে না। কিন্তু অক্ষয়ের অন্ত কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়া মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃকপাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি তো কখনো যেতে বলেননি।

না। সেটা আমার অন্তায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবে না? কি করে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্ছি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদলালো কি করে? বরঞ্চ আরও তো কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ তাই হ'তো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ বুঝলেন কি না জানিনে—না-বোঝাও আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা তো সেই দেড় হাজার বছরের পুরানো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অমুঠান, কিছুই তো ব্যত্যয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় তো কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, ওঁদেরও ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে-কোন একটা অতীত দিনেই সূনির্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মানতে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

না, আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেচেন, একবার তাঁকে দেখবেন না ?

কমল কোতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে ?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও-প্রশ্ন কেউ করে না। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখা-পড়া শেখবার সময় পায়নি, দরকারও হয়নি। রাঁধা-বাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে আছেন ; আমাকেই ইহকাল-পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হলে ওষুধ খেতে চায় না, বলে স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে বুঝবে স্ত্রীর আরু শেষ হয়েছে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রর কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি তো ভাগ্যবান, অন্ততঃ স্ত্রী-ভাগ্যে ! এতখানি বিশ্বাস এ-যুগে দুর্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই, ঠিক জানিনে। হয়ত একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একটা অনুরোধ ?

কল্পন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন ? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন, এই-সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাববো। আচ্ছা চললাম, নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল ; এবং সেইখানে কমল শুরু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে, এই সেই অক্ষয় ! এবং মাসখের জানার বাহিরে এইভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্বিঘ্নে শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে। একখানি চিঠির জন্ত তাহার কি কোতূহল, কি সকাতির সত্যকার প্রার্থনা !

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। ইহাই নীলিমার স্বভাব, বিশেষ কেহ কিছু মনে করেনা। আগুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বলছিলেন, লোকে এইটাই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহ্য যায়। মাসখের কাইয়ে

শেষ প্রশ্ন

অন্ডায়টাই দেখে, অস্তরের প্রেরণার ধবর রাখে না। এইখানেই যত বন্দ, যত বিরোধের সৃষ্টি।

• কমল বুলিল ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। স্ততরাং চুপ করিয়া রহিল। এ-কথা বলিল না যে, উচ্ছ্বলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়। দুর্ভুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাইবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ করিয়া তাহারা হরেক্স ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্করণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষবেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সম্মুখে কহিলেন, কিছু মনে ক'রো না মা, এ-ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেক্সের সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন, কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্যা। হাই-সার্কলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা বেশ-ভূবায় আপ-টু-ডেট। এটুকু ভুললে যে ওঁদের একেবারে পুঞ্জিতে যা পড়ে কমল। রাগ করলেও ওঁদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ তো করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবে না তা জানি। রাগ আমাদেরও হ'লো না, শুধু হাসি পেলো। কিন্তু বাসায় যাবে কি করে মা, আমি কি তোমাকে পৌছে দিয়ে বাড়ি যাবো? বাঃ, নইলে যাবো কি করে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু আর দেরি করাও হয়ত উচিত হবে না, কি বলো?

সকলেরই স্মরণ হইল যে, তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিশ্বয়ে নিরীক্ষণ করিল যে, ঘরের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেক্স কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল, হালো! বেটার লেট জান নেভার। একি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম। এবং চক্কের পলকে একটা অভাবিত হুঃসাহসিকতা তাহার ভিতরের কথাগুলো সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে তো আর দেখা হ'তো না। আমরা আজ তোর-রায়েই ছ'জনে চলে যাচ্ছি।

আজই ? এই ভোরে ?

হাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। ঐখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁর গলায় একবার বাধিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হ'তো দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কুল দেখিতে পাইল, ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ-জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বার বার বলেছি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা-কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সন্মত হয়নি। আজ এঁদের স্মৃতি তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজি হও। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাঁচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্ব-সমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের ?

ভয় আজ না থাকে, কিন্তু—

কিছুদিন আগে তো আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো ? তা হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু খামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিচ্ছিন্ন করে বাড়ি গাঁথতে চেয়ে না। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল ? কই সে জোর ?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো অত নিষ্ঠুর

শেষ প্রায়

আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান তো মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম ছনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই কমল। ঐ একই কথা মা। এই আত্মসমর্পণ একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। স্ত্রী পাওনার চেয়েও তার মান বেশি।

সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্বাদ নিফলে যাবে না।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে তো আসোনি, নীচে চল।

আশুবাবু সহাস্তে কহিলেন, এমনি তোমার বিপ্তে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো—যা ও কখনো করে না!

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া খাটো করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে, কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি চুপি জবাব দিল, পেয়েচি? অন্ততঃ সেই আশীর্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না। কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই বিধান।

ঘরের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলো না যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিল না।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসব, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাব; জীবনের কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেন না। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এই রূপে সে দেখা দেয়, তাকে আর কিছুতেই চেনা যায় না। আর যাই কেন না কর দিদি, অশুবাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজি হ'য়ো না।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আগুবাবু গাড়ীতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তব্বের সন্ধান পেয়েছি কমল। অল্পকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষা ক'রো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার। ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেছি যে, ভালবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস; তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলবো না। আমার ক্ষোভের নিখাসে তোমাদের বিদায়-ক্ষণটিকে মলিন করে দেব না। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল শুধু দু-চারজনের জন্তই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় যুচে, তার ভার হয় দুঃসহ।

যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবদের দিন পর্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পাতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম কাকাবাবু।

ধর্ম? তোমার ধর্ম?

কমল কহিল, যে দুঃখকে ভয় করছেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ। দেখতে পান না কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনিই জ্বলচে? তেমনি করেই ছাই করে আনচে? এ নিববে কি দিয়ে?

আগুবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিখাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, কমল, মণির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারিনি—তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্বলতা; কি জানি সে কি, কিন্তু এ মোহ যেদিন ঘুচে, মানুষের অনেকখানি সেইসঙ্গে যুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু উপস্থার ধন। আচ্ছা আসি। বাসদেও, চল।

শেষ প্রশ্ন

টেলিগ্রাফ-পিয়ন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জ্বরুরি তার। হরেন্দ্র গাড়ীর আলোতে থাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার এক ছোট সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ—গ্রামের এক ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহ-মূর্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন মূর্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাঁহার রক্ষাকর্তা। দুইদিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোক কীর্তনাদি-সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নম্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সংবাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কাম্মায় হরেন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ এবং অনাবিল জ্যোৎস্না-রাত্রি সকলের চক্ষেই এক মুহূর্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দু'দিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা ধবর সে দিলে না?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু করতে পারা তো যেতো না, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে সে চায়নি।

আশুবাবু যুক্ত-হাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধুই দেশ—এই ভারতবর্ষটা। তবু, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত ক'রো না। বাসদেও, চালাও।

এই শোকের আঘাত কমলের চেয়ে বেশি বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল; বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু, অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত গিয়া সকলকে বুকে বিধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন। এবং সেই শোকাচ্ছন্ন শুরু নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন, চল।

স্বামী

স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশি ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন করে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি করে? বীজ-মন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত করে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু না গো না, এ আমার দেমাক নয়, দেমাক নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকি কিছু নেই, একেবারে—কিছু নেই। আঠারো, উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশি প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশী বছরের শুকনো হাড়-গোড় নিয়ে বাস করে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? পেলো এতক্ষণ ভয়ে আঁকে উঠতে।

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্ত্রের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে-দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি-বড় শত্রুর জন্তেও তা একদিনের জন্তে কামনা করিনি। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ঋণ-অঋণের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে সর্বস্বান্ত করে যখন আমাকে পথে বার করে দিলেন, লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেচিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বকের মধ্যে তাকে যে তোর পেতেই হবে। এ-জন্মে হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

শয়ৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

জানি, যা হারিয়েচি, তার অনন্ত গুণ আজ কিরে পেয়েচি। কিন্তু তবু বে এ-কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাধবারও জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাধবারও যে ঠাই দেখি না প্রভু! এ-দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদচে—ওরে অম্পৃষ্ঠা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াসনে, আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার মরে বাঁচি!

কিন্তু থাক সে-কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ি চলে এলেন। আমার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর-যত্নের ত্রুটি হ'ল না; বড় বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী বাংলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়িতে একটা পূজা-অর্চনা কি বার-ব্রতও কোনদিন হতে দেখিনি, এ-সব তিনি ছ'চক্কে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বই কি? মামা মুখে বলতেন বটে তিনি Agnostic, কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জগুই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ছাই এ-সব বুঝেছিলুম! আসল কথা হচ্ছে, স্থবির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোঁকা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল ঠিক সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে বসে কি-সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা মা যা খুশি করুন, আমি কিন্তু মামার বিস্তে বোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্তে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা স্ক্র করে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেতো না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমাদের দিন কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার করে এসে বলতেন, দাদা, সত্বর তো দিন দিন বয়স হচ্ছে, এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দেবে কি করে!

স্বামী

মামা আশ্চর্য্য হয়ে বলতেন, বলিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি, এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—

মা কাঁদ কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই। ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসচেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি করে?

মামা হেসে বলতেন, ভাবিস্নে বোন, সে-সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক এমনি করে আমাদের নছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।

মা মুখ ভার করে বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে যেতেন। মামা গ্রাছ করতেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ'ত। কেমন করে যেন বুঝতে পারতুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হতে শুরু হয়েছিল, তা বলচি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দু'পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আগরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী তেমনি দুর্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এতবড় মিথোটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্ছে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল; কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস— সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বলতে পারি না। কলকাতায় সে বি-এ পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ি এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আসত। তখনকার দিনে Agnosticismই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ক্যান্টন। এই নিয়েই বেশিভাগ তর্ক হত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু'জনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না। কিন্তু আমিই প্রায় জিততুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিশ্বরে বলে উঠত, আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন বলে মনে করেন না ?

আমি গর্বে সোভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী! সেদিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন ?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাঙ্গ করে বলতেন, কি জানো নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগত না, যত ভাল লাগত তার মুখের মটিক্রিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হতে চায় না, আমার অর্ধৈর্ষ্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিন একশ'বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।

এমনি তর্ক করে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুল-গাছের তলা ঝরা ফুলে ফুলে একেবারে বোকাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সেদিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই ক্রতপদে যাচ্ছি, মা দেখতে পেয়ে বললেন, ওলো, ছুটে ত যাচ্চিস, জল যে এলো বলে।

আমি বললুম, জল এখন আসবে না মা, ছুটে গিয়ে ছুটো কুড়িয়ে আনি।

মা বললেন, পোনের মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সত্বে, কথা শোন—যাস্নে। এই অবেলায় ভিজ্জে গেলে ঐ চুলের বোকা আর শুকোবে না তা বলে দিচ্ছি।

আমি বললুম, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়লে মালীদের এই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব। বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে, হুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ করে রইলেন। কতদিন ভাবি, সেদিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে মা, এমন করে হয়ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুলফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ষি হয়ে এসেচে, এমন সময় মা যা বললেন, তাই হ'ল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের-চালার মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

স্বামী

কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবছি, ঝম্ ঝম্ করে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ওমা! এ যে নরেনবাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ি এসেছেন, কৈ সে ত আমি শুনি নি!

আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, অ্যা, সহ যে! এখানে?

অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনি নি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কান পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটির দিকে চেয়ে বললুম, আমি ত রোজই ফুল কুড়তে আসি। কবে এলেন?

নরেন মালীদের একটা ভাঙা খাটিয়া টেনে নিয়ে বসে বললে, আজ সকালে। কিছ তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দুটো তার চাঁপা হাসিতে নাচছে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, বললুম, তাই বই কি! কষ্ট করে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন ফস্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আর আমি যদি ঐ কুড়ানো ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠা আমার আলগা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ও কি করলে?

আমি কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়ে বললুম, আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন্ না কুড়িয়ে।

এ্যা! এত অভিমান! বলে সে উঠে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার হুঁচোখ জলে ভরে গেল, আমি জোর করে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ করে চেয়ে থেকে বললে, যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে বলে দেব, তিনি আর যেন পণ্ড্রম না করেন।

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম, কে রাগ করেছে?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

যে ফুল ফেলে দিলে ?

ফুল ত আপনি পড়ে গেল ।

মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে ?

আমি ত মেঘ দেখছি ।

মেঘ বুঝি এদিকে ফিরে দেখা যায় না ?

কৈ যায় ? বলে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দু'জনের চোখো-চোখি হয়ে গেল । নরেন ফিক করে হেসে বললে, একখানা আরসি থাকলে যায় কি না দেখিয়ে দিতুম । নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে ; কষ্ট করে আকাশে খুঁজতে হ'ত না ।

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম । রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে ছুলিয়ে দিলে । এই ত সেই পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সোঁদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল ।

নরেন বললে, মেঘ কাটলে ব্রজবাবুকে বলে দেব, লেখা-পড়া শেখান মিছে । তিনি আর যেন কষ্ট না করেন ।

আমি বললুম, বেশ ত, ভালই ত । আমি ও-সব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে ।

নরেন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি, আজকাল নভেল পড়া হচ্ছে বুঝি ?

আমি বললুম, গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন ?

নরেন বললে, সে শুধু তোমাকে গল্প বলবার জন্তে । নইলে পড়তুম না । বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, এ জল যদি আজ না ধামে ? কি করবে ?

বললুম, ভিজ্জে ভিজ্জে চলে যাব ।

আচ্ছা, এ যদি আমাদের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা হলে ?

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালইবাসি ! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এলো । জিজ্ঞেস করে ফেললুম, সে-দেশের বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না ?

নরেন বললে, একেবারে না । গায়ে তীরের মত বেঁধে ।

আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ ? পোড়া-মুখ দিয়ে তুমি বার হয়ে গেল । ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত !

শ্যামী

সে বললে, এর পর যদি একজন আপনি বলে ডাকে, সে আর একজনের মরা-
মুখ দেখবে।

• কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই তুমি বলব না।

বেশ, তা হলে মরা-মুখ দেখো।

দিব্যি কিছুই না। আমি মানিনে।

কেমন মান না, একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও।

মনে মনে রাগ করে বললুম, পোড়ামুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়?
মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পারলিনে। কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন
শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত ছুনিয়াটা যেন
ঘুলিয়ে একাকার করে দিলে। সন্ধ্যা হয় হয়। ফুল কটি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা
বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নরেন বললে, চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

আমি বললুম, না।

মন যেন বলে দিলে, সেটা ভাল নয়। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাব কি করে?
বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার
হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে চূপ করে
দাঁড়াতে দেখে অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেৱী হ'ল না। কাছে এসে বললে,
এখন উপায়?

আমি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভাল, কিন্তু একলা
অতদূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। মা দেখলে—

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, তার আর কি, চল তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে
পার করে দিই।

তাই ত বটে! আঙ্লাদে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি
যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালায় ওপর ত্রিজের
মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েছি।

খুশি হয়ে বললুম, তাই চল—

নরেন তার চেয়েও খুশি হয়ে বললে, কেমন মিষ্টি শোনাল বল ত!

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বললুম যাও—

সে বললে, নির্বিঘ্নে পার না করে দিয়ে কি আর যেতে পারি !

বললুম, তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী ?

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ-কথা কি করেই বা মনে এলো এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, দেখি, তাই যদি হতে পারি—আমি যেমনি যেন মরে গেলুম।

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ার অন্ধকার, তাতে পিটুলি গাছটাই জলে ভিজ়ে ভিজ়ে যেমন পিছল তেমনই উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হু হু শব্দে বয়ে যাচ্ছে, আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, আমার হাত ধরে যেতে পারবে ?

বললুম, পারব। কিন্তু তার হাত ধরে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোনমতে টাল সামলে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েকমুহূর্ত্ত সে চূপ করে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝক্ ঝক্ করে উঠল। বললে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হতে পারি কি না ?

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, কি করে ?

এমনি করে, বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন ক্ষতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে! কম যেমনি কি আর এ-দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়।

শিউরতে শিউরতে বাড়ি চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের অনুনির মত যত জ্বলতে লাগল জ্বালা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, ভালো মেয়ে তুই সহু, এলি কি করে ? নালাটা ত জ্বলে জ্বলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি ? পড়ে মরতে পারলিনে ?

না মা ; সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন ?

তার পরদিন নরেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসেছিলুম, তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্কান্দে কাঁটা দিয়ে উঠল।

স্বামী .

ইচ্ছে হ'ল ছুটে পলাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা ছটোকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ করে বসে কি শুনিব্ বন্ ত ? যা বাড়ির ভেতরে যা। এতবড় মেয়ের যদি লজ্জা-সরম একটু আছে !

এক-পা এক-পা করে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাচালো ছিল না। তা ছাড়া, লিখে পড়ে তর্ক করে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অস্তঃকরণটা তাঁর এমনি অনুরূপ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটচে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অস্ত নেই। তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পোনের আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় নাই, সপ্রমাণ হোক অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারের মানুষগুলো কি বোকা ! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে। আমার মামারও ছিল সেই দশা। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের ছ'জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিলী দিকটাকে আমি ছ'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেছি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জলা বিষের আঙুনে কল্জে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বৰ্য্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট একতলা খণ্ডরবাড়ির কদাকার মূর্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়িতে পা দিয়েই দেখি বারন্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ মা, আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে—

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, তা হোক, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্তিক।

আমি ক্ষতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরণ, আমার সম্বন্ধ এনেচেন।

মা চঁচিয়ে বললেন, কাপড় ছেড়ে একবার এসে ব'স মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজ্জে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। বুকের কাঁপনি যেনঃঃঃঃঃ থামতে চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাখারিন্দেঃঃঃঃঃ মুখুয়োর ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে না-কি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন পা জলে যাবে কেন?

শুনলুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট ছোট তাই, এক ভারের বিষে হয়েছে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই এনট্রান্স পাশ করেই রোজগারের খান্দায় পড়া ছাড়তে হয়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি করে উপায় মন্দ করেন না।' তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে--নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়বো! সাত বছর আগে বিষের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তার পর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বছর! ঘটকীকে উদ্দেশ্য করে

স্বামী

মনে মনে বললুম, পোড়ারমুখী, এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে য়ুচ্ছিলি ?

• মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, এখন দিন স্থির করলেই হ'ল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করতে লাগল, বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব।

মামা শুনে বললেন, এনট্রান্স ? তবে বলে পাঠা, এখন বছর-দুই সহর কাছে ইংরিজি পড়ে যাক, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

মা বললেন, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত ক'রো না, এমন স্ত্রীবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে-থতে কিছু হবে না—

মামা বললেন, তা হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।

মা বললেন, পনেরয় পা দিলে মে—

মামা বললেন, তা ত দেবেই ; পোনের বছর বেঁচে রয়েছে যে !

মা রাগে দুঃখে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা ? এর পরে একেবারেই পাত্র জুটবে না।

মামা বললেন, সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না !

মা বললেন, ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয় না দেবে।

মামা বললেন, সে ভাল কথা। রবিবার যাব বলে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

ভাঙচির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, এমন চোখ-কানও ছিল যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

বাগানে একটুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন-দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙা খুন্টি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন। তার সে-রকম মুখের চেহারা অনেকদিন পরে আর একবার দেখেছিলুম সত্যি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল যা কখন কোনদিন পাইনি। সে বললে, আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চললে ?

কথাটা বুঝেও বেশ বুঝতে পারলুম না। বলে ফেললুম, কোথায় ?

সে বললে, চিতোর।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

স্পষ্ট হ'বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, কোন উত্তর মুখে এল না।

সে পুনরায় বললে, তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি, বোধ হয় জন্মের মতই।
কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলতে চাই—শুনবে?

বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধরে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—
কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি! দেখি, তার দু'চোখ বয়ে ঝন্ ঝন্ করে জল পড়চে।

ওরে পতিত! ওরে দুর্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা
ভগবান তোকে যখন একেবারে দেননি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে
দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট
দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে বললে, চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে
বসি গে, এখানে কেউ দেখতে পাবে।

মনে বুঝলুম, এ অশ্রায়, একান্ত অশ্রায়। কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা
ভিজ়ে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কাণায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালি-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে
ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ছন্ ছন্ করছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে
বসে বললে, এই একান্ত নির্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে, কিন্তু তোমাকে
হেঁব না। এখনও তুমি আমার হওনি।

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে
মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

তার পর অনেক কথাই হ'ল; কিন্তু থাক্ গে সে-সব। আজও ত প্রতিদিনকার
অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্যন্ত মনে করতে পারি, মরণেও যে বিন্মুতি আসবে, সে আশা
করতেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এতবড় দুর্গতিতেও কোন-
দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিন্তের মাঝে থেকে
নরেনের সংস্রব তিনি কোনদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। সে যে আমার জীবনে
কত বড় মিথ্যে, এ ত তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্তের
উদ্বেজনা পরক্ষণে কতবড় অবসাদে যে ডুবে যেত, সে আমি খুলিনি। যেন কার
কত চুরি-ডাকাতি সর্বনাশ করে ঘরে ফিরে এলুম, এমনি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি
পোড়া কপাল যে, অস্ত্রধারীর এতবড় ইজিত্তেও আমার হ'স হ'য়নি। হবেই বা কি
করে? কোনদিন ত শিখিনি যে, ভগবান মানুষের বুকের মধ্যে বাস করেন। এই
সবই তাঁরই নিবেদ।

স্বামী

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা করে গেলেন। মা মুখ চূণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাওয়া পণ্ড্রম। পাত্র তাঁর কিছুতেই পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা-বিজ্রপ করলেন না। বললেন, হাঁ, ছেলেটা পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্য বলেও মনে হ'ল না। তা ছাড়া নয়, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি-একটু আছে; ইচ্ছে হয় বসে বসে আরও হৃ'দগু আলাপ করি।

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জল করে বললেন, তবে আর আপত্তি ক'রো না দাদা, মত দাও—সহুর একটা কিনারা হয়ে যাক।

মামা বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধরে মনে মনে বললুম, যাক, মামা এখনো মনস্থির করতে পারেননি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জানত, তাঁর ভাগ্যীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ করে এসেছেন, সেদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সহুর সেইখানেই বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে। অবাক্ কাণ্ড! কিন্তু অবাক্ হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি হৃ'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে-ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বলতেন, মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে যে মদ খায় না। জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদরোগে মামা মারা গেলেন, আমরা গড়লুম অকুল-পাথারে। সুখে দুঃখে কিছুদিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে-বাড়িতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনের পার হয়ে যায়, সেখানে আলম্ব্যভরে শোক করবার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে বসে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিধল, তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্ম জননীর লজ্জা ও কুষ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ করে প্রায়ই ভৎসনা করতেন, হতভাগ্য মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া। একে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্তুও যদি আমাকে কোনরকম মুচড়ে মাচড়ে একটু খাটো করে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে ত হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ মর্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্বে কতদিন সারারাত্রি জেগে ভেবেচি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোন-মতেই হতে পারবে না। সে-রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি করে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্মে তেমনি করে আমারও সমাধা হয়ে গেল এবং তেমনি করেই একদিন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাকীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কতদিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিশাশার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যেদিন পাকা হয়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যিক হয়নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটাদিনও দেখা দিলে না, শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ি গেলুম, বিয়ের বাকি অর্ঘ্যদানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বসলুম।

দেখলুম স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়িগুরু আমার দলে। শ্বশুর নেই, সং-শাওড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বৌ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে 'সংসার' করছিলেন, হঠাৎ একটা সতের-আঠার বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, বাঁচলুম বোমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দু'দণ্ড ঠাকুরদের নাম করতে

স্বামী

পাব। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশি; সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ কর মা, আর কিছু আমি চাইনে।

তাঁর কাজ তিনি করলেন; আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, আচ্ছা। কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত; প্যাচ মারতে যে ছ'জনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হ'ল না, আমাকেও ছ'দিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনই আরামের নিশ্বাস ফেললেন, বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচ-পত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তুণে যত-প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, 'আড়ি-পাতা'টা ব্রহ্মাস্ত্র। স্ত্রবিধে পোলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারারাত্রি পড়ে থাকতুম, এ স্মসংবাদ তাঁর আগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হলে সেইদিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই বলে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'ল না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে রাগ কিংবা অভিমান করে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় করে নিলে কি শুতে পার না?

আমি বললুম, দরকার কি, আমার ত এতে কষ্ট হক্কনা।

তিনি বললেন, না হলেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।

আমি বললুম, তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

তিনি বললেন, ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত-রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।

বললুম, ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, এতবড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে? বলে একটুখানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আমার মেজদেওর টাকা চল্লিশের মত কোথাও চাকরী করতেন, কিন্তু একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, আফিস থেকে এলে পা-ধোবার গাডু-গামছা, জল-খাবার, পান তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্য বাড়িগুরু সবাই যেন দ্রুত হয়ে থাকত। দেখতুম, আমার স্বামী, আমার মেজদেওর হয়ত কোনদিন একসঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্তেই ব্যতিব্যস্ত, এমন কি চাকরটা পর্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্তে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাঁর একতিল দেরি কিংবা অসুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখত না। তিনি আধঘণ্টা ধরে হয়ত এক ঘটি জলের জন্তে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্তেই তিনি দিবারাত্রি খেটে মরচেন। ছ্যাকড়া গাড়ির যোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এতবড় পরিশ্রমী এর আগে কখনও আমি দেখিনি। আর চোখে দেখেছি বলেই লিখতে পারছি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভালোমানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সবতাতেই বলতেন, থাক্ থাক্ আমার এতেই হবে।

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়িগুরু সকলের এতবড় অত্যাচার অবহেলায় আমার গা যেন অলে যেতে লাগল।

বাড়িতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোনদিন বা একটু পড়ত, কোনদিন পড়ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে বলে ফেলেছিলুম আর কি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি, ছি, কি নিলজ্জই আমাকে তা হলে এরা মনে করত! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়ী না করে, আমারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বই ত না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে বসে মেজঠাকুরপোর জন্তে চা তৈরি করছি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?

মা বললেন, অবাক করলে ঘমশ্যাম। এত সকালে খাবার পাব কোথায়?

স্বামী বললেন, তবে থাক্, ফিরে এসেই খাব। বলে চলে গেলেন।

স্বামী

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম, ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ির পাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কীল রাতে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল। শাওড়ী ঘরে ঢুকতেই বলে ফেললুম, কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা ?

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, খাবার আবার কে কিনে আনলে বোমা ?

বললুম, সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল ?

তিনি বললেন, ও মা, সে আবার কটা যে, আজ সকাল পর্যন্ত থাকবে ? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

বললুম, তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরি করে দেওয়া যেত না মা ?

শাওড়ী বললেন, বেশ ত বোমা, তাই কেন দিলে না ? তুমি ত বসে বসে সমস্ত গুনছিলে বাছা ?

চুপ করে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়িতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ করে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জলতেই লাগল। ছপুরবেলা শাওড়ী ডেকে বললেন, খাবে এস বোমা, ভাত বাড়া হয়েছে।

বললুম, আমি এখন খাব না, তোমরা খাও গে।

আমার আজকের মনের ভাব শাওড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, খাবে না কেন গুনি ? বললুম, এখন ক্ষিদে নেই।

আমার মেজজা আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে বলে উঠলেন, বটঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না, না ?

শাওড়ী বললেন, তাই না-কি বোমা ? বলি, এ নতুন ঢঙ শিখলে কোথায় ?

তিনি কিছুই মিথ্যে বলেননি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সহিতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বললুম, নতুন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না ? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে ?

তবু ভাল, ঘনশ্রামের এতদিনে কপাল ফিরল ! বলে শাওড়ী মুখখানা বিকৃত করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজজায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে গুনিয়েই বললেন, তখনই ত বলেছিলুম মা ! বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা করে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর খাওয়া হয়নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, এ-সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ খাপছাড়া যে নিজের লজ্জাতেই নিজে মরে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ-কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর একবিন্দু মিছে নয়, কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে-রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হতে লাগল, কেউ যদি কথাটা তাঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছূতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্তায় সহ্য করিনি, কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহুভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছূই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলছি, মানুষের মন-পদার্থটার যে অস্ত নেই, সেইদিন তার আভাষ পেয়েছিলুম। এতবড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন ছোটো উণ্টো শ্রোত একসঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্তে কি করেছে একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খাওয়াং চায় সূর্যদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে! তাই বলি, হতভাগীর স্পর্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান!

গরমের জন্তে কি না বলতে পারিনে, ক'দিন ধরে প্রায়ই মাথা ধরছিল। দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছটফট করে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে বসে ধীরে ধীরে পাথার বাতাস করচে। একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল, চেয়ে দেখলুম স্বামী।

রাত জেগে বসে পাথার বাতাস করে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধরে ফেলে বললুম এ তুমি কি করচ?

তিনি বললেন, কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।

স্বামী

আমি বললুম, আমার মাথা ধরেচে, তোমাকে কে বললে ?

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, কেউ বলেনি ; আমি হাত গুণতে জানি ।
কারো মাথা ধরলেই টের পাই ।

বললুম, তা হলে অন্তদিনও পেয়েচ বল ? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি ।

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, রোজই পেয়েচি । কিন্তু এখন একটু যুমোবে,
না কথা কবে ?

বললুম, মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর যুমোবো না ।

তিনি বললেন, তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই, বলে উঠে
গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগলেন । আমি
ঠিক ইচ্ছে করেই যে করলুম তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন করে তাঁর
কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা চেপে ধরে রাখলেন ।
হয়ত একবার একটু জোর করেও ছিলুম । কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে
গেল । ছরস্তু ছেলেক মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর করে ধরে রাখেন, তখন
বাইরে থেকে হয়ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে
অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না ।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে ওইটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ।
আমার এই জড়পিণ্ড হাতটারও বোধ করি সে জ্ঞানই ছিল, নইলে কি করে সে টের
পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নেই !

তার পর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, আমি চুপ
করে পড়ে রইলুম । আমি এর বেশি আর বলব না । আমার সেই প্রথম রাত্রির
আনন্দ-স্মৃতি—সে আমার, একেবারে আমারই থাক ।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা-কিছু সে আমি শিখে এবং শেষ করে দিয়ে
স্বপ্নরবাড়ি এসেচি । কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত
ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম ! স্বামীর কোলের উপর থেকে
আমার হাতখানা যে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ করে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর
পৌঁছে দেবার মত চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত !

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলুম, স্বামী ঘরে নেই, কখন উঠে গেছেন । হঠাৎ মনে
হ'ল, স্বপ্ন দেখিনি ত ? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখন শিয়রের
কাছে রয়েছে । কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে
রেখে বাইরে এলুম ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শাওড়ীঠাকরুণ সেইদিন থেকে আমার ওপর যে কড়া নজর রাখছিলেন, সে আমি টের পেতুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথায় আর থাকব না। তা ছাড়া দু'দিন আসতে না আসতে স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া—ছি ছি, লোকে গুনলেই বা বলবে কি ?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ পড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম সে আমি নিজেই জানতাম না। তাই দুটোদিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া করে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়তদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজজা তরকারি কুটচেন, শাওড়ী বলে বলে দিচ্ছেন; এটা মাছের ঝোলের কুটনো, ওটা মাছের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অস্থলের কুটনো, এমনিই সমস্ত প্রায় আঁস-রাঙ্গা। আজ একাদশী, তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হান্ধামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্তে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণবমানুষ, মাছ-মাংস ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অস্থল হলেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ ভাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক-আধদিন একটু ভাল তরকারি হলে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকত না, তাও দেখেছি।

বললুম, গুর জন্তে কি হচ্ছে মা ?

শাওড়ী বললেন, আজ আর সময় কৈ বোমা ? তার জন্তে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে বলে দিয়েছি, তার পর একটু দুধ দেব'খন।

বললুম, সময় নেই কেন মা ?

শাওড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতেই ত পাচ্ছ বোমা ! এতগুলো আঁস-রাঙ্গা হতেই ত দশটা-এগারটা বেজে যাবে। আজ আমার অধিলের (মেজদেওর) দু-চার-জন বন্ধু-বান্ধব থাকবে, তারা হ'ল সব অপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হলে পিন্ধি পড়ে, সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর ওপর আবার নিরামিষ রাঙ্গা করতে গেলে ত রাধুনী বাঁচে না।' ত্বর প্রাণটাও ত দেখতে হবে বাছা !

রাগে সর্কাক রি রি করে জ্বলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ করে বললুম, আলু-উচ্ছে-ভাতে দিলে কি কেউ খেতে পারে ? একটুখানি ডাল রাধবারও কি সময় হ'ত না ?

স্বামী

তিনি আমার মুখের পানে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে তরু করতে পারিনি বাছা, আমার কাজ আছে।

• এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। বলে ফেললুম, কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরাগীগিরি করেন না বলে, কুলি-মাহুষ বলে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনি। আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনি রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্ছি।

শাণ্ডী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি ত কাল এলে বোমা, এতদিন তার কি করে খাওয়া হ'ত শুনি?

বললুম, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা। এখন থেকে সে-সব হতে দিতে পারব না। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বললুম, বড়বাবুর জন্তে নিরামিষ ডাল, ডালনা, অফল হবে। তুমি না পার, একটা উমুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধি, বলে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করে স্নান করতে চলে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই ধপ্পে সাদা বিছানাটির উপর ভেতরে ভেতরে যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এতদিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে-কথা জানতে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরে গেলুম।

ঘড়ীতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এতরাত পর্যন্ত জেগে বসে বই পড়ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে-খবর আজ এমনি স্পষ্ট করে আমার কানে কানে বলে দিলে যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলুম না।

স্বামী বললেন, এখনো শোওনি যে?

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ীর পানে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলুম—তাই ত, বারোটা বেজে গেছে?

কিন্তু যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখেছি।

স্বামী শয্যায় বসে একটু হেসে বললেন, আজ আবার কি হান্নামা বাধিয়েছিলে?

বললুম, কে বললে?

তিনি বললেন, সেদিন তোমাকে ত বলেছি, আমি হাত গুণতে জানি।

বললুম, জানলে ভালই! কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?

তিনি বললেন, গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেস করি, এত অল্পে তোমার রাগ হয় কেন?

বললুম, অল্প? তুমি কি ভাবো তোমাদের ঋণ-অঋণের বাটখারা দিয়ে সকলের ওজন চলবে? কিন্তু তাও বলচি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমার রাগ হ'ত।

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হতে হবে।

কেন, আমার অপরাধ?

বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

বললুম, তা হতে পারে, কিন্তু গাছের মত অঋণ সহ করা আমার কাজ নয়, তা সে, যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, বললেন, কে ভগবান মানে না? তুমি?

বললুম, হাঁ, আমি।

তিনি বললেন, ভগবান মান না কেন?

বললুম, নেই বলে মানিনে। মিথ্যে বলে মানিনে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাসি-মুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, এই কথার পরে সে-মুখ একেবারে যেন ছাইএর মত শাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, শুনেছিলুম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—

আমি মাঝখানেই ভুল শুধরে দিয়ে বললুম, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, Agnostic বলতেন—

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে আবার কি?

আমি বললুম, Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী বলে উঠলেন, থাক এ-সব আলোচনা, আমার সামনে তুমি কোনদিন আর এ-কথা মুখে এনো না।

স্বামী

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনলে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে আমার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেছি, অপরকেও করতে শুনেছি, রাগারাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেছি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না করে এভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হ'ল না।

যে মাহুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাকত ; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিলে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোষক তুলে বললেন, আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল ?

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিজ্রপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূল হয়ে আমার বুকে বিধল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা মাহুর পেতে যেমন-তেমনভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সবচেয়ে বড় গর্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট ছুটি-কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল ?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবামাত্রই কাম্বার ঢেউ যেন আমার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করছি, তিনি ডেকে বললেন, আজ এত ভোরে উঠলে যে ?

বললুম, ঘুম ভেঙে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।

বললেন, একটা কথা আমার শুনবে ?

রাগে, অভিমানে সর্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, তোমার কথা কি আমি শুনিনি ?

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, শোন, আচ্ছা তা হলে কাছে এস, বলি।

বললুম, আমি ত কালী নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

পাবে না গো, পাবে না, বলেই হঠাৎ তিনি স্মৃষ্টিতে মুখে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি জোর করে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর করে আমার মুখ তুলে ধরে বললেন, যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে জান? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু যারা ভগবান মানে না তারা বলে, কারও কাছেই মিথ্যে বলতে নেই।

স্বামী হেসে বললেন, বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি করে মুখে আনলে বল ত? কি করে বললে ভগবান তুমি মানো না?

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা করে কেউ বুঝি কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, বলে ফেললুম, ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হ'ত? আমাকে আটকৈ রাখলে কেন? আর কোন কথা আছে?

তিনি স্নানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, আর একটা কথা, মায়ের কাছে আদর মাপ চেয়ে।

আমার সর্কান্ন রাগে জলে উঠল; বললুম, মাপ চাওয়াটা কি ছেলেকেলা, না তার কোন অর্থ আছে?

স্বামী বললেন, অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্তব্য।

বললুম, তোমাদের ভগবান বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিরে অপরাধীকে নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্তব্য করুক?

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাসা করতে নেই, এ-কথা ভবিষ্যতে কোনদিন আর যেন মনে করে দিতে আমায় না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসিনে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেও না।

বললুম, কেন, শুনতে পাইনে?

তিনি বললেন, না। নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম। এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্তে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর সহিতে পারলুম না, বললুম, কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশি, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ির মধ্যে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

স্বামী

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্তব্য? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ি যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।”

স্বামী চলে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ করে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ’ল, হায় রে! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর!

সমস্ত সকালটা যে আমার কি করে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু ছপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে-কথা শুনলুম তাতে বিশ্বাসের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ী বললেন, কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বৌ নিয়ে ত আমি ঘর করতে পারিনে ঘনশ্যাম! কালকের কাণ্ড ত শুনেচ?

স্বামী বললেন, শুনেচি মা।

শাশুড়ী বললেন, ত হলে যা হোক এর একটা ব্যবস্থা কর।

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী বললেন, তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এতবড় খাড়া মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না।—শুধু—

স্বামী বললেন, সে-কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালোমন্দ যাই হোক, বাড়ির বড়বোকে ত আর ফেলতে পারবে না। ও চায়, আমি একটু ভাল খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!

শাশুড়ী বললেন, অবাক করলি ঘনশ্যাম! আমি কি ভালোমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোয় কি বাবা! এতবড় বৌ যেদিন এসেচে, সেইদিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙল। তা বাছা, আমার গিন্নিপনায় আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় তাঁড়ারের চাবি দিচ্ছি। কৈ গা, বড়বোমা, বেরিয়ে এস গো, চাবি নিরে যাও। বলে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি!

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি যে কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেচেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এখন কতবার মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ-কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয়ত, তা হলে এ-কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাই ত, বার বার বলি, ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিসনে, মেয়েমানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে তোর কপাল পুড়বে না ত পুড়বে কার? সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজ-সজ্জাই করলি, অসময়ে ঘুমের ভাণ করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল! তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায় সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদলি, একবার মুখ ফুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমিশয্যায় না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েছে। উঠে বাইরে যাচ্ছি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেচেন।

বুকের ভেতরটায় ধব্বক করে উঠল।

স্বামী বলতে লাগলেন, আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শিকার করবার জন্তু কলকাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমস্তন্ন করে এসেছিল, তাই এসেচেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেন, না?

উঃ, মানুষের স্পর্ধার কি একটা সীমা থাকতে নেই!

ঘাড় নেড়ে জানানুম, আছে। কিন্তু ঘুণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, তোমার প্রতিবেশীর আদর যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

শুনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হ'ল হয়ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ি নেই, অখিলকেও তার আফিস করতে হবে।

মুখ নীচু করে কোনমতে বললুম, তুমি ?

আমার কিছুতেই থাকবার যো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।

কখন ফিরবে ?

ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেইখানে থাকতে হবে।

তা হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বৌ-মানুষ, খণ্ডরবাড়িতে তাঁর সামনে বার হতে পারব না।

স্বামী বললেন, ছি, তা কি হয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ো। এই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

সেইদিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। ছপুরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে বসে কিছুতেই চোখের কোঁতুহল খামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভরে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকে-বেঁকে চলে যেতে দেখলে সর্কাজ যেমন করে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি করে আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি করে যে একদিন ছুঁয়েচি, মনে পড়তেই সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেল, সে হঠাৎ ভারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমাদের বড়বৌ যে বড় বেরুলো না ?

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ির লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুশি করবার জন্মেই হাসির ভঙ্গিতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বললে, কি জানি বাবু, বড়বৌমার ভারি লজ্জা, নইলে তিনিই ত আপনার জন্মে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে বসে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন। লজ্জা করে কিন্তু কম-সম খাবেন না বাবু, তা হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে বলে দিলেন।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মানুষের শয়তানীর অস্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললে, আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সতু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেকদিন দেখিনি, একবার দেখি।

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজজাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা করে বললে, দিদির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত, বিয়ের দিন পর্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখতে চাচ্ছেন, যাও না।

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন ছোটো-আড়াইটে, বাড়ির সবাই যে ঘর ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বললে, বাবু পান চাইলেন মা।

কে বাবু?

নরেনবাবু।

তিনি শিকার করতে যাননি?

কই না, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।

তা হলে শিকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। বাড়িতে আসা পর্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সবচেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, একঝাড় চামেলী ফুলের গাছ দিয়ে সশুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যায় না।

আমি মানুষের মনের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে বসে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলাম সত্যি, কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখছিলাম ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলাম। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হ'তুম তাঁর ক্রমা করবার ক্রমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত এ তাঁর দুর্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই বলেই ক্রমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলাম কেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে

স্বামী

তিনি ভেতরে ভেতরে কত ভালবেসেচেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, আচ্ছা, তুমিই বাড়ির সর্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়িগুরু সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা করলে শাসন করে দিতে পার না ?

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কৈ কেউ ত অযত্ন করে না !

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না। বললুম, আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পার ?

তিনি তেমনি হাসিমুখে বললেন, যে সত্যি ক্রমা চায়, তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো !

তাই এক-একদিন চুপ করে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যি নেই, তা হলে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায় ? এই যে আমি জীবিত কৰ্তব্য একদিনের জন্তে করিনে, তবু ত তিনি কোনদিন স্বামীর জোর নিয়ে আমার অমর্যাদা অপমান করেন না ?

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি খেত-পাথরের গৌরাক্ষমূর্তি ছিল ; আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, স্বামী বিছানার উপর শুক হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আসত, মনে হত, অমনি করে একটাদিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্ধেক বেদনা কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খানকয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম তা নয়, তবুও এমন কতদিন হয়েছে, কখন পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন বেলা বয়ে গেছে, কখন দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাণ্ড পাইনি। কতদিন হিংসে পর্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি বলেই ভাবতে পারতুম !

কিছুদিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্তে, তা কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মাঝের জন্তেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন-কেমন করে, তাই কতদিন ঠিক করেছি, কালই পাঠিয়ে দিতে বলব, কিন্তু যেই মনে হ'ত এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি, না, অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানা হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সাক্ষী। কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চোঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি করে যে সেদিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে এসেচ কেন? শিকার করতে?

নরেন বললে, ব'স বলচি।

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বললুম, শিকার করতে যাওনি কেন?

নরেন বললে, ঘনশ্রামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ি থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

চক্ষের নিমিষে স্বামিগর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্তব্য ভোলেন না, সেদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্বলতা নেই। মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড়।

বললুম, তা হলে বাড়ি ফিরে গেলে না কেন?

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে থপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, সত্বে, টাইফয়েড জ্বরে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন গুনলুম তুমি পরের হয়েচ, আর আমার নেই, তখন বার বার করে বললুম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি, যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে?

বললুম, তুমি ভগবান মানো?

নরেন খতমত খেয়ে বলতে লাগল, না হ্যাঁ, না, মানিনে, কিন্তু সে-সময়ে কি জানো!

থাক্ গে, তার পরে?

নরেন বলে উঠল, উঃ, সে আমার কি দিন, যেদিন গুনলুম, তুমি আমারই আছ, শুধু নামেই অস্তর, নইলে, আমারই চিরকাল, শুধু আমারই। আজও একদিনের জন্যে আর কারও শয্যা রাখি—

ছি, ছি, চুপ কর। কিন্তু কে তোমাকে এ-খবর দিলে? কার কাছে গুনলে?

তোমাদের যে দাসী তিন-চারদিন হ'ল বাড়ি যাবার নাম করে চলে গেছে, যে—

স্বামী

যুক্ত কি তোমার লোক ছিল? বলে জোর করে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু এবারেও সে তেমনি সজোরে ধরে রাখলে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, সত্বে, এমনি করেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? এমন অস্থখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা করে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্ত এতবড় শাস্তি ভোগ করব? লোক ভগবান ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনা দোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কখন না। তুমিই বা কিসের জন্ত একজন অজানা-অচেনা মুখ্য-লোকের—
থাক, থাক, ও-কথা থাক।

নরেন চমকে উঠে বললে, আচ্ছা, থাক, কিন্তু যদি জানতুম, তুমি স্থখে আছ, স্থখী হয়েচ, তা হলে হয়ত একদিন মনকে সাধনা দিতে পারতুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি করে?

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বললে, এমন কোন সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এতবড় অত্যাচার হতে পারত! মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারাজীবন দব্দ করবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাখি মেরে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে না পারে?

এ-সব কথা আমি সমস্তই জানতুম। আমার মামার ঘরে নব্য-যুগের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকি ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছলতে লাগল। বললুম, তুমি আমাকে কি করতে বল?

নরেন বললে, আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয়ত একদিন গুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেছি, তার কাছেই ফিরে চলে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সত্বে, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের ছ'ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল, চুপ করে বসে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি যুগান্তেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একেবারে উণ্টো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকুমাত্র সময়, এইটুকুমাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হলে যেমন করে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ করে দিতুম, কিছুতেই তার

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'ফোটা চোখের জলই বা তার ধরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতাগুলি শরগাছ যেমন করে কাঁপতে থাকে, তেমনি করে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে পাঁচশ' বিদ্যুতের ধারা আমার সর্কান্ধে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত অবশ করে আনচে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদগুলো যদি না থাকত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাত, হয়ত আমি একবার চেষ্টাতে পর্যন্ত পারতুম না—ওগো, কে আছ আমায় রক্ষা করো!

হু'জনে কতক্ষণ এমন শুধু হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, সহ!

কেন?

তুমি ত বেশ জান, আমাদের নিখোঁ শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র। যেমন করে হোক আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি। সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্তে?

বৌমা, বলি কথা তোমাদের শেষ হবে না বাছা?

মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লেও বোধ করি মানুষে এমন করে চমকে ওঠে না, আমরা হু'জনে যেমন করে চমকে উঠলুম। নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক স্রুখে দাঁড়িয়ে আমার শাণ্ডী।

বললেন, বাছা, এ-পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সত্য-ভব্য নয়, অমন করে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্না-কাটি করতে দেখলে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে শুনতে সবদিকে বেশ হ'ত।

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট রইল, একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, বলতে পারিনে বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বৌমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা বেশ! বাবুটি নাকি ছপুরুষেলা চা খান। চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি বৌমা, চায়ের পিয়লাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না, ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে খাবেন?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, তুমি কি রোজ এমনি করে আমার ঘরে আড়ি পাত মা?

স্বামী

শাণ্ডী মাথা নেড়ে বললেন, না না, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ করেই ত সারতে পারিনে। এই দেখ না বাছা, বাতে মরচি, তবু চা তৈরী করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা এ-ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবুটির আবার ভারি লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয়ত খাবেন না। তা যাচ্ছি আমি—, বলে তিনি ফিক্ করে একটু মুচকে হেসে চলে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্রোহ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাণ্ডী-বধুর মন্ত্র সঙ্কল্পের কোন উচু-নীচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম, সর্বাঙ্গ বয়ে ঝন্ ঝন্ করে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটিটা ভিজ়ে গেল।

শুধু একটা সাধনা ছিল, আজ তিনি আসবেন না, আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ করে পড়ে থাকতে পাব, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজ-কর্ম করি—যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন থন্ থন্ করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ-ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আসতেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বন্ধু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে? চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, খুব সম্ভব শিকার করতে বারণ করেছিলুম বলে। তা উপায় কি!

অন্দরে ঢুকতেই, শাণ্ডীঠাকরুণ ডেকে বললেন, একবার আমার ঘরে এস ত বাবা!

তাঁর যে একমুহূর্ত দেরি সহবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন, আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নির্ধুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়-চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি, শাণ্ডী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেননি। তার পরে বথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারারাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত ঘিঘাসকোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেজাজা বললেন, হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি, আজ আমিই আছি।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বললুম, তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি ?

কাজ কি, মা কি জন্তে বারণ করে গেলেন, বলে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বার হ'ল না, আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়িগুরু সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু ঘাঁর মুখ সবচেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ হয় না। কিন্তু সে ত কোনমতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়িতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন করে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পেরেছিল তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্যন্ত হালকা করে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু করে দেবে, সে আর বিচিত্র কি ! যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, তার একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে। কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যত অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে। এই ত মানুষের মন ! এই ত তার গঠন ! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া করে তোলে। একদিন, দুদিন করে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হতে লাগল, এতই কি দোষ করেছি যে স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না করে নির্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন ! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্ছেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুনলুম শাওড়ী বলচেন, ফিরে এলি মা মুক্ত ! পাঁচদিন বলে কতদিন দেরি করলি বল ত বাছা ?

সে যে কেন ফিরে এসেছে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। মুচকে হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন একটুকরো জলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেছে। ইচ্ছে হ'ল তখুনি কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে

স্বামী

নরেনের চিঠি! না পড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারব, তা হলে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অকুরন্ত চিরন্তন কোতূহল জমা হয়ে রয়েছে কিসের জন্তে? নির্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বললুম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও পড়তে পারলুম না। চিঠি লাল কালিতে লেখা মনে হতে লাগল, তার রাঙা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেয়োর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিন্বিন্ করে নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। তার পরে পড়লুম—একবার, দু'বার, তিনবার পড়লুম। তার পরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোঁপা এসে বললে, মাঠাকরুণ বাবুর ময়লা কাপড় দাও।

জামার পকেটগুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোষ্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাত তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেছেন। তারিখ দেখলুম, পাঁচদিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

পড়ে দেখি সর্বনাশ! মা লিখেছেন, শুধু রান্নাঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গুঁজে আছেন।

দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল, কিন্তু একফোঁটা জল বেরুল না। কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলুম জানিনে, ধোঁপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গুলো ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। এইবার চোখের জলে বালিস ভিজ্জে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দু সাহায্য করতে অস্বীকার করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এতবড় ক্ষুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হ'ল, পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতে কথা কইলুম। বললুম, আমাদের বাড়ি গেছে?

তিনি মুখপানে চেয়ে বললেন, কোথায় গুনলে?

গায়ের ওপর পোষ্টকার্ডখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলুম, ধোঁপাকে কাপড় দিতে তোমারই পকেট থেকে পেলুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক বলে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়িগুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এতবড় স্পর্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষা করত, আমার এমন তীক্ষ্ণ শূলও খান্ খান্ হয়ে পড়ে গেল।

একটুখানি স্নান হেসে বললেন, কেমন অশ্রমস্বয়ং হয়ে পড়ে ফেলেছিলুম সহ, আমাকে মাপ কর।

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বললুম, মিথ্যে কথা। তা হলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লুকিয়েচ, তাও জানি।

তিনি বললেন, শুধু দুঃখ পেতে বই ত না! তাই ভেবেছিলুম, কিছুদিন পরে তোমাকে জানাব।

বললুম, কেমন করে তুমি হাত গোণে, সে আমার জানতে বাকি নেই! তুমিই কি বাড়িগুচ্ছ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েচ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখে না, তা জানো?

ওরে হতভাগী! বল, বল, যা মুখে আসে বলে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী শুরু হয়ে বসে রইলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্রমা করতেও মাছুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মুক্তি পেয়ে তারা কোনমতেই আর ফিরতে চাইল না।

একটু থেমে আবার বললুম, আমি হেঁসেলে চুকতে—

তিনি একটুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—

বললুম, সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেই বলেই যে তোমরা খুঁচে খুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছুতেই দেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামার বাড়িতে এখনো ত রান্নাঘরটা বাকি আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কাল আমি যাচ্ছি।

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, যাওয়ারই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়নাগুলো রেখে য়ো।

ওনে অবাক হয়ে গেলুম। 'এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এল। বললুম, সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত, বেশ, আমি রেখেই যাব।

স্বামী

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন শাদা হয়ে গেল। বললেন, না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাধা দেব।

কিন্তু এমনি গোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম, বাধা দাও, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই। বলে, তখনি বাস্তব খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে ছ'গাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই ছটি ছাড়া গা থেকে পর্যাপ্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এঁরা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার করে টান মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্ঝক হয়ে বসে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এমনি বিষিয়ে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকারও অসহ্য হয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কায়ার বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিবে মান বাঁচালুম।

কখন যুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয় হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু-একখানি ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়নাই নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ি এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলাম। রাত্রি ছটোর পর বাগানের দিকেই সেই জানালাটার গায়ে খট খট শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ-ধবর মুক্ত দেবেই এবং এ-সুযোগ সে কিছুতে ছাড়বে না। কোথাও কাছাকাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভারী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বললে, দেরি ক'র না, যেমন আছ বেরিয়ে এস, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতি! গাড়ীওদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস করলে না কেন?

কলকাতায় বৌবাজারের একটা ছোট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম তখন বেলা সাড়ে-আটটা। আমাকে পৌছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

চলে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য্য যে, যে-কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হলে মায়ের হাত ধরে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে বসে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখার বাতাস করেছিলেন—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাত নাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, বোমা, কলের জল চলে যাবে, উঠে চান করে নাও।

জ্ঞান করে এলুম, উড়ে-বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলাম, কিন্তু উঠতে না উঠতে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তার পর হাত-মুখ ধুয়ে নির্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করছি। তিনি তেমনি নীরবে বসে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেলছি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরায় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্কাক ভরে উঠে।

হঠাৎ হাতের ভারি অনন্তটা ছুঁড়ে ফেলতেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বলতে পারিনি। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিস-বিছানা ভিজ়ে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে বসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে।

সে বললে, স্বপ্ন দেখছিলে? ইস, এ হয়েছে কি! বলে কৌচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপ্ন! একমুহুর্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে বসে দেখলুম স্নমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্কেল।

ও কি?

তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম।

তুমি কিনতে গেলে কেন?

নরেন একটু হেসে বললে, আমি ছাড়া আর কে কিনবে?

স্বামী

এত কারা আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বললে, আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে বস্ বোন, আমি দিব্যি করছি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাই-বোন। তোকে আমি যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষা করব।

চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা কেলে দিয়ে চলে এস নরেনদাদা, আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হোক। কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি মরে যাব ভাই!

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপর বসে বললে, মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেছি। কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোন-দিন একসঙ্গে ত—

তাড়াতাড়ি বললুম, তুমি আমার বড়ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস কর না।

নরেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে, আমি আজই তোমাকে তোমাদের রাগানের কাছে রেখে আসতে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?

বুকের ভেতরটা কে যেন ছ'হাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপমান হোক, সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার যো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেছি ভাই! আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এস নরেনদাদা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলছি।

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলব না, কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারলুম না, আবার ঝন্ ঝন্ করে পড়তে লাগল। নরেন মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে বললে, সচ্ছ, তুমি কি সত্যিই ভগবান মানো?

আজ চরম ছুখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার গেল; বললুম, মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত করেও ফিরে যেতে চাইছি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না।

নরেন বললে, কিন্তু আমি ত মানিনে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আমি বলছি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে।

সে তখন বোঝা যাবে। বলে নরেন গম্ভীর-মুখে বসে রইল। মনে মনে কি যেন ভাবচে বুঝতে পেরে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। আমার এক মিনিট দেরি সইছিল না, বললুম আমাকে কখন রেখে আসবে নরেনদাদা?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, সে কথখনো তোমাকে নেবে না।

সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন না নিন সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ-কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কতবড় একটা বিল্ডিং হৈ-চৈ গণ্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!

ভয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললুম, সে ভাবনা তুমি এতটুকু ক'রো না নরেনদাদা। তখন তিনি আমার উপায় করে দেবেন।

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না! তখন?

এ-কথার কি যে জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বললুম, তাতেই বা তোমার ভয় কি?

নরেন মানমুখে জোর করে একটু হেসে বললে, ভয়? এমন কিছু নয়, পাঁচ-সাত বছরের জন্তে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন করে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে, আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই; এ কি ছেলেখেলা?

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুধু নিজের কথাই ভাবচ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সবদিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

ও কি, বাসায় যাচ্চ না কি?

হঁ।

রাগে, হুঃখে, হতাশাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম— তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাব। ওগো, আমি তাঁর দিব্যি করে বলচি আমি কারুর নাম করব না, কাউকে বিপদে জড়াব না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি নরেনদা, আমাকে আটকে রেখে আমার আর সর্কনাশ ক'রো না।

মুখ তুলে দেখি, ঘরে সে নেই, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর-দরজায় দেখি তালা রক্ত। উড়ে-বামুন বললে, বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।

স্বামী

ঘরে ফিরে এসে আর একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাকচি, তোমার একান্ত নিরুপায় মহাপাপিষ্ঠা সন্তানের গতি করে দাও।

আমার সে-ডাক কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কি দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাতদিন কেটে গেল। কিন্তু কেমন করে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্য্যও নেই। সে যাক।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নীচে গলির গানে তাকিয়ে ছিলাম। আফিসের ছুটি হয়ে গেছে, সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়িমুখো হন্ হন্ করে চলেচে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ির ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে এখন সবচেয়ে কারা বেশি ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি করতে সবচেয়ে কারা বেশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্তদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত মেজদেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজবোঁ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে। আমি ত আর নেই, ভুলতে ভয়ই বা কি: হয়ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন। তার পরে, রাত-দুপুরে ছুটো শুকনো ঝরঝরে ভাত, একটু ভাতে-পোড়া। ওবেলার একটুখানি ডাল হয়ত বা আছে, হয়ত বা গেছে—সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য। নিরীহ ভালোমানুষ, কাউকে কড়া-কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতকি! এতবড় নির্মম মহাপাপ তোর চেয়ে বেশি সংসারে কেউ কি কোনদিন করেছে? ইচ্ছে হ'ল এ... সন্দেহে মাথাটা হেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ করে দিই। আমি জানি, তু।

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনদিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নিজের বিছানায় উঠে এসে বসলুম; সেইদিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় পড়ে আছে সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল বলে ভয়ে এদিক মাড়াত না। তার নিজের ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আমি তার উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে, তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?

ঝি দালানে ঝাটা দিচ্ছিল, সে থপ করে বলে দসল, অসুখ করবে কেন? শুধু জল খেয়ে থাকলে মাসুখ রোগা হবে না বাবু? দুটি বেলা দেখছি ভাতের খালা যেমন বাড়া হয় তেমনি পড়ে থাকে। অর্ধেক দিন ত হাতও দেন না।

শুনে দু'জনেই শুরু হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চলে গেলে, মুক্তকে নীচে টেনে নিয়ে বললুম, কেমন আছেন তিনি?

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বোমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলো না!

তুই ত ঘর করতে দিলি না মুক্ত!

মুক্ত চোখ মুছে বললে, মনে হলে বুকের ভেতরটায় যে কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আজও সবাই জানে, তুমি বাড়ি-পোড়ার খবর পেয়ে রাঙিরেই রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেছ। তোমার শাওড়ীও তাঁর হুকুম নেওয়া হয়নি বলে রাগ করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েছে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণের দুঃখ হয়। সাথে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বোমা!

ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্তে যুচে গেল! বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম আটকে এল।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া-বাড়ি লাবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয়ত সেইজন্তেই আসন্ন গয়নাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।... নাটতে

বললুম, বল, এইখান থেকে অষ্ট-রকমের বুক-ফাটা খবর আছে সমস্ত আমাকে একটি একটি করে শোনা, এতটুকু দয়া তোরা আমাকে করিসনে।

মুক্ত বললে, এ-বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন।

শিউরে উঠে বললুম, কি করে?

মাস-খানেক আগে যখন এ-বাড়ি তোমার জন্তেই ভাড়া নেওয়া হয় তখন আমি জানতুম।

স্বামী

তার পর ?

একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন ।

তার পর ?

বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পারলুম না বোমা—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম ।

এলিয়ে মুক্তুর কোলের ওপরেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম ।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, বোমা !

কেন মুক্ত ?

যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন ?

প্রাণপণ-বলে উঠে বসে মুক্তুর মুখ চেপে ধরলুম—না মুক্ত, ও-কথা তোকে আমি বলতে দেব না । আমার ছুঁখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল করে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিসনে ?

মুক্ত জোর করে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বোমা ? টাকার সঙ্গে ত ওকে ওজন করে ঘরে তুলতে পারব না ।

এ-কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম । মনে মনে বললুম, ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে । আকাশ-কুম্বের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি ।

ঘণ্টা-খানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এল, তখন রাত্রি দশটা । ঘরে ঢুকেই বললে, মাথার আঁচলটা তুলে দাও বোমা, বাবু আসছেন, বলেই বেরিয়ে গেল ।

আবার এত রাত্রে ? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম, দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়, আমার স্বামী ।

বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না । আমি জানি, তুমি আমারই আছ । বাড়ি চল ।

মনে মনে বললুম, ভগবান ! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও, ওই দুটি পায়ের মাথা রাখবার সময়টুকু পর্য্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো ।

একাদশী বৈরাগী



একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয়ের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অর্নার-সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-লীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যেই ইহাতেই পাঠ সাজ করিয়া, সন্ধ্যাহিক ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা ছ'আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নখর টিকির সংস্থান দেখিয়া শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল।

সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্বেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্মের মত এমন সনাতন ধর্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা-ব্যাপারে সন্ধ্যাহিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো-নির্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গান্নানের ঘটায় বাড়ির মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায় কল্পনায় যুবক-মহলে একেবারে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, হাঁ, গোপাল মুখুয়ের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্ম মতিগতি কয়টা দেখা যায়! স্মরণ্য দেশের মধ্যে অপূর্ব একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি-দলনী—এই তিন তিনটা সভার আফালনে গ্রামে চাষাভূষার দল পর্যন্ত সম্মত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওঁর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেকরায়ে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিজ্ঞানসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল; অপূর্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোকা তুলিয়া দিল। এমনি করিয়া অপূর্বর হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সপ্ত-সপ্তই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্বর চোখে পড়িল যে, স্কুলের লাইব্রেরীতে শশীভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বন্ধিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্ত সে হেডমাষ্টারকে অশেষরূপে লাঞ্চিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানূনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না।

এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল; কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাহাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম-প্রচার দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্ত অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল। স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অমুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা, নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমীর; কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না—হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে বছরদিনের অব্যবহারে মাসুখের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব তাল হুকিয়া কহিল, টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য।

একাদশী বৈরাগী

না হইলে সেখানের ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বাকুইপুরের জমিদার ত দিদির মামাখণ্ডর।

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব তাহার দিদির মামাখণ্ডরকে বলিয়া বাকুইপুরেও ধোপা নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্ত কি করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যে-হেতু বছর-দুই পূর্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির স্মায় কানে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, এমন অহুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ একফোটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ ত আমার সাত-পুরুষের ভাগ্য। স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত-চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি স্মৃতিয়া অসংখ্য আশীর্বাদ করার পরে, একাদশী করযোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরমশাই যে, সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নাই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস্ বাবা, বাস্তভিটে কখনো ছাড়িস্নে। ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিশ্বৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটি মাটির, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্বে কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ-লোক টাকার কুমীরই হোক, হান্দরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটা মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ী-গোঁফ কামান, মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইন্ধু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুক করিবার জন্তই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাক্স এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসেবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালি-গায়ে পৈতার গোছা গলায় বুলাইয়া শ্লেটের উপর সূদের হিসাব করিতেছে; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ য়ান-মুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সূদ দিতে, কেহ-বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে, কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্ত কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, কোথেকে আসছেন?

অপূর্ব কহিল, কালীদহ থেকে।

মশায় আপনারা?

আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সমস্তমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় বুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, বসতে আজ্ঞা হোক!

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, আপনাদের কি প্রয়োজন?

অপূর্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সূদ ত হয়েছে কুলে সাত টাকা দু'আনা; তার দু'আনাই যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন?

তাহার পরে উভয়ে এমনি ধবস্তাধবস্তি শুরু করিয়া দিল, যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেবী হইতেছে দেখিয়া অপূর্ব উভয়ের বাগ্বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস রে! সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে,

একাদশী বৈরাগী

আবার একটাকা চাইতে এসেচিস্ কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি স্তদ-টদ কিছু এনেচিস্?

নফর ট্যাংক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দু'টো পয়সা কই?

নফর হাত-যোড় করিয়া বলিল, আর নেই কর্তা; ধাড়ার পোর কত হাতে-পায়ে পড়ে পয়সা চারটি ধার করে আনচি, বাকি দুটো পয়সা আসচে হাট-বারেই দিয়ে যাব।

একাদশী গলা-বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, দেখি তোর ওদিকের ট্যাংকটা?

নফর বাঁ-দিকের ট্যাংকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, দুটো পয়সার জন্ত মিছে কথা কইচি কর্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমাদের ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক, এই বলে দিলুম।

একাদশী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুই চারটে পয়সা ধার করে আনতে পারলি, আর দুটো এমনি ধার করতে পারলিনে?

নফর রাগিয়া কহিল, মাইরি দিলাসা করনুম না কর্তা! মুখে পোকা পড়ুক—

অপূর্বর গা জলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা লোক তুমি মশায়!

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্দী সম্মুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পরাণ, নফরার কাছাটা একবার খুলে দেখ ত রে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে নাকি?

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দুটো খুলিয়া একাদশীর সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর-মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, ঘোষালমশাই, নফরার নামে স্তদ আদায় জমা করে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার করবি রে?

নফর কহিল, আবশ্যক না হলেই কি এসেচি মশাই?

একাদশী কহিল, আট আনা নিয়ে যা না! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেলবি রে।

তার পরে অনেক কষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্ত্ত দইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অপূর্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরি করতে পারিনে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শেষে একটা নিখাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমি বুড়োমানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন ?

অপূর্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোটছেলেতে টাকা দেবে ? তারা পাবে কোথায় শুনি ?

বুড়ো সে-কথার উত্তর না দিয়া কহিল, ইস্কুল ত হয়েছে কুড়ি-পঁচিশ বছর ; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলেনি বাবু ? তা যাক, এ ত আর মন্দ কাজ নয়, আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত ! কি বল ঘোষালমশাই ? ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা পেল না । একাদশী কহিল, তা বেশ, চাঁদা দেব আমি, একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা । কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না । অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে, যা হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত ? আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না, কি বল হে ?

ক্রোধে অপূর্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না । অনাথ কহিল, এই চার আনার জন্তে আমরা এতদূরে এসেচি ? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে ?

একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, দেখলেন ত অবস্থা, ছ'টা পয়সা হকের সুদ আদায় করতে ব্যাটারদের কাছে কি ছ্যাচড়াপনাই না করতে হয় ? তা এ পাট-টা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—

অপূর্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল ; বলিল, সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হলে । ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে-ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েচেন, আচ্ছা !

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি আঙ্গুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, বাকুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম্ব, মনে থাকে যেন বৈরাগী !

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল । বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না । অপূর্ব বলিল, গরীবের রক্ত শুধে সুদ খাওয়া তোমার বার করব তবে ছাড়ব ।

নফর তখনও বসিয়াছিল ; তাহার কাছায় বাঁধা পয়সা ছুটো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল ; সে কহিল, যা কইলেন কর্তা, তা ঠিক । বৈরাগী ত নয়, পিচেশ ! চোখে দেখলেন ত কি করে মোর পয়সা ছুটো আদায় নিলে !

একাদশী বৈরাগী

বুড়ার লাঞ্ছনায় উপস্থিত সকলেই মনে মনে নিশ্চল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক, আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপতে বন্ধ হয়েছিল বলব ?

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদগোপের ছেলে, জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধান তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোটবোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাহার ঘটী করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদর-বত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এতবড় পদস্থলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা, দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্ম সবাই উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিভের জন্ম নয়, ছোট বোনটির জন্ম। প্রথম-যৌবনের অপরাধ গৌরীর বৃকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলান্ধুও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণ-মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সক্রম দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বিপিন বলিতে লাগিল, আমরা কি ভিখারী যে দু'কোশ পশ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগুণা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেছি? তাও আবার আজ নয়, কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে— তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুয়ে স্কদ খাও বুড়ো, মনে করেচ জৌকের গায়ে জৌক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্টাচার্য্যই নয়। ছোট-জাতের পয়সা হয়েছে বলে চোখে কানে আর দেখতে পাও না? চল হে অপূর্ব, আমরা যাই, তার পরে যা জানি করা যাবে। বলিয়া সে অপূর্বের হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্বের অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে-কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহার তৃষ্ণার জল এক হাতে এবং অণ্ড হাতে রেকাবীতে গুটি-কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গোরীকে ছোটজাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতে মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড়; স্নানের পর বোধ করি এইমাত্র আঙ্গিক করিতে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে গুনিয়া সে আঙ্গিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে?

বিপিন কহিল, পাটের শাড়ী পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাব আমরা? অপূর্ব, ইনিই সে বিদ্রোহী হে!

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কহুয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, এ-সব কি বাঁদরামি হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান নেই?

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্বের খোঁচা খাইয়া আরও নির্ধূর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, কেন, মিছে কথা বলচি নাকি? ওর এতবড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্ত জল আনে? আমি হাতে হাড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো?

অপূর্ব বুঝিল আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, আমি আনতে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া ক'রো না। চল, আমরা এখন যাই।

একাদশী বৈরাগী

গৌরী রেকাবীটি কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ ?

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের আয় বসিয়াছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, না, এই যে দিই দিদি !

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, বাবুশাই, আমি গরীব-মাছুষ। চার আনাই আমার পক্ষে ঢের, দয়া করে নিন।

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উত্তত হইয়াছিল, অপূর্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, থাক বৈরাগী, তোমায় কিছু দিতে হবে না।

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কলিকাল! বাগে পেলো কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে! দাও ঘোষালমশাই, পাঁচ গণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখ। কি আর করব বল। বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কতবড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল; মুহূর্ত্ত হাসিয়া কহিল, থাক বৈরাগী, তোমায় দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা চাঁদা নিইনে। আমরা চললুম।

কি জানি কেন, অপূর্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্বে অপূর্ব যথার্থ-ই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণা নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্ত ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।

অপূর্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটা বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃবিয়োগ কিংবা এমনি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়াছিল। অনাথ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটে, তুই যে এখানে ?

পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, আমার মা বসে আছেন। মা বললেন, আমাদের অনেক টাকা গুঁর কাছে জমা আছে। বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিবার জন্ত অপূৰ্ব্ব নিজের আকর্ষণ পিপাসা সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি কহিল, আমার নাম শশধর; বাড়ি ঔদের গাঁয়ে—কালীদহে।

তোমার বাবার নামটি কি?

ছেলেটির হইয়া এবার অনাথ জবাব দিল; কহিল, এর বাপ অনেকদিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; সাত বৎসর পরে মাস-খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েছেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রদ্ধাধিকারী।

কাহিনী শুনিয়া সকলে দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, টাকার হাতচিঠা আছে? যাও তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, কাগজ-পত্র কিছু নেই, সব পুড়ে গেছে।

একাদশী প্রশ্ন করিল, কত টাকা?

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, ঠাকুর মরবার আগে বলে গেছেন, পাঁচশ' টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থ-যাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও, বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষালমশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেন, তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। আমরাও জানতুম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘোষাল মূহু হাস্য করিয়া বলিলেন, শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু! এ-সব মবলগ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তা হলে কি-রকম হবে বল দেখি?

বিধবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার মনে হচ্ছে, যেন পাঁচশ' টাকা কে জমা রেখে আর নেয়নি। তুমি একবার পুরোনো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে না কি?

একাদশী বৈরাগী

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কে এতবেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে যাবে বাপু ? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্ৰ নেই—

- কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আদিলা, রসিদ-পত্ৰ নেই বলে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে না কি ? পুরানো খাতা দেখুন, আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্ছি।

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল, কিন্তু যে ছকুম দিল তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, কত বছর হয়ে গেল মা ! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়। খাতা-পত্ৰের আণ্ডিল ! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি। বিধবাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, তুমি বাছা কেঁদো না, হকের টাকা হয় ত পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কাল এক বার আমার বাড়ি যেয়ো ; সব কথা জিজ্ঞেসা করে খাতা দেখে বার করে দেব। আজ এতবেলায় ত আর হবে না।

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাব।

যেয়ো, বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়িতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, আট বছর আগের—তা হলে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না ?

ঘোষাল কহিলেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের মা !

গৌরী কহিল, আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্ছি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেচেন—দু'কোশ এই রোঁদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন ; এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষালকাকা ?

একাদশী কহিল, সত্যিই ত ঘোষালমশাই ; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটান কি ভাল ? বাপু রে ! দাও, দাও, চটপট দেখে দাও।

ক্রুদ্ধ ঘোষাল রুষ্টকণ্ঠে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উন্টাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুণী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাঃ ! আমার গৌরীমায়ের কি সুন্দর বুদ্ধি ! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল ! এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচশ'—

একাদশী কহিল, দাও, চটপট সুদটা কবে দাও ঘোষালমশাই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, আবার সূদ ?

একাদশী কহিল, বেশ, দিতে হবে না ! টাকা এতদিন খেটেচে ত, বসে ত থাকেনি ! আট বছরের সূদ, এই ক'মাস সূদ বাদ পড়বে ।

তখন সূদে-আসলে প্রায় সাড়ে-সাতশ' টাকা হইল । একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার করে আনো । হাঁ বাছা, সব টাকাটাই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ত ?

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন ; চোখ মুছিয়া প্রকাশে কহিল, না বাবা, অত টাকার আমার কাজ নেই ; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও ।

তাই নিয়ে যাও মা । ঘোষালমশাই, খাতাটা একবার দাও, সই করে নেই ; আর বাকি টাকার তুমি একটা চিঠি করে দাও ।

ঘোষাল কহিল, আমি সই করে নিচ্ছি । তুমি আবার—

একাদশী কহিল, না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই । বলিয়া খাতা লইয়া অর্ধ-মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, ঘোষালমশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তা ব্রাহ্মণের নামে জমা আছে । আমি জানি কি না, ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখতে পায় না, বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল । এতগুলি লোকের স্মৃখে মনিবের সেই ব্যঙ্গোক্তি ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল ।

সেদিনের সমস্ত কর্ম নির্বাহ হইলে, অপূর্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল । ঘোষাল সঙ্গে ছিল, সে সবিনয়ে আহ্বান করিয়া কহিল, আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে ।

অপূর্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল । ঘোষালের গা জলিয়া যাইতেছিল ; সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আশ্পর্ক ? আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধূলো পড়েচে, হারামজাদার ষোল-পুরুষের ভাগ্য ; ব্যাটা পিশেচ কি না পাঁচ গুণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখারী বিদেয় করতে চায় !

বিপিন কহিল, দু'দিন সবুর করুন না ; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপতে বন্ধ করে পাঁচ-গুণ্ডা পয়সা দেওয়া বার করে দিচ্ছি । রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষালমশাই ।

একাদশী বৈরাগী

ঘোষাল কহিল, আমি ব্রাহ্মণ। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জল-গ্রহণ করিনে, দুটো মুক্তোর জন্তে কি-রকম অপমানটা দুপুরবেলায় আমাকে করলে চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও করবেন না। সে-বেটা—যারে ছুলে নাইতে হয়, কিনা বামুনের ছেলের তেষ্ঠার জল নিয়ে আসে, টাকার গুমরটা কি-রকম হয়েছে, একবার ভেবে দেখুন দেখি!

অপূর্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, অনাথ, আমি ফিরে চললুম ভাই, আমার ভারি তেষ্ঠা পেয়েচে।

ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, আপনি এদের নিয়ে যান, আমি যাচ্ছি ঐ একাদশীর বাড়িতেই জল খেতে।

একাদশীর বাড়িতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, চল, চল—দুপুর-রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!

অপূর্ব হাত টানিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্ত ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষালমশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এস, ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।

তাহার শাস্ত স্থির কর্তৃস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা জানেন?

অনাথ কহিল, ক্ষেপে গেলে নাকি?

অপূর্ব কহিল, তা জানিনে! কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সে তখন ধীরে-স্বস্থে করা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না, বলিয়া সে এই খর-রৌদ্দের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ির উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

নারীর মূল্য

নারীর মূল্য

মণি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না, তাহা দুপ্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুপ্রাপ্য নহেন। জল জিনিসটি নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি একফোঁটার জন্ম মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি—ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে—আজ নহে। আজ ইনি সুলভ।

কিন্তু দাম যাচাই করিবারও একটা পথ পাওয়া গেল। অর্থাৎ পুরুষের কাছে নারী কখন, কি অবস্থায়, কোন্ সম্পর্কে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা স্থির করিতে পারিলে নগদ আদায় হোক আর না হোক, অন্ততঃ কাগজে-কলমে হিসাব-নিকাশ করিয়া ভবিষ্যতে একটা নালিশ-মোকদ্দমারও দুরাশা পোষণ করিতে পারা যায়। একটা উদাহরণ দিয়া বলি। সাধারণতঃ বাটীর মধ্যে বিধবা ভগিনীর অপেক্ষা স্ত্রীর প্রয়োজন অধিক বলিয়া স্ত্রীটি বেশী দামী। আবার এই বিধবা ভগিনীর দাম কতকটা চড়িয়া যায় স্ত্রী যখন আসন্ন-প্রসবা; যখন রাঁধা-বাড়ার লোকাভাব, যখন কচি ছেলেটাকে কাক দেখাইয়া বক দেখাইয়া দুধটা খাওয়ান চাই। তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে—নারী ভগিনী-সম্পর্কে বিধবা অবস্থায়, নারী ভাৰ্যাসম্পর্কীয়ার অপেক্ষা অল্প মূল্যের। ইহা সরল স্পষ্ট কথা। ইহার বিরুদ্ধে তর্ক চলে না। একটা স্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিলে নারীর বিশেষ অবস্থার বিশেষ মূল্য বোধ করি আঁক কষিয়া কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত বাহির করা যায়। কিন্তু কথা যদি উঠে, ইহার অবস্থা-বিশেষের মূল্য না হয় একরকম বোঝা গেল, কিন্তু নারীত্বের সাধারণ মূল্য ধাৰ্য্য করিবে কি করিয়া, যখন ইহার জন্ম সোনার লক্ষা নিপাত হইয়াছিল, ট্রম-রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; আরও ছোট-বড় কত রাজ্য হয়ত ইতিপূর্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস সে-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। এখানে এতবড় প্রয়োজন নারীতে কি ছিল যে সাম্রাজ্য

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ভাসাইয়া দিতেও মানুষ পরাশ্রুত হয় নাই, প্রাণ দিতেও দ্বিধা করে নাই। তোমার স্নেটখানিতে জায়গা কত যে ইহার দাম তুমি কষিয়া বাহির করিয়া দিবে? কথাটা বাহিরের দিক হইতে অস্বীকার করি না, কিন্তু ভিতরের দিকে চাহিয়া আমি যদি প্রশ্ন করি, মানুষ রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখে নাই সত্য, কিন্তু তাহা কতটা যে নারীর দিকে চাহিয়া, আর কতটা যে নিজের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দিকে চাহিয়া—সে জবাব আমাকে কে দিবে?

নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ, কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখে কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ, তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী। অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এ-ছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে-কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।

ইয়োরোপ এ-দেশীয়কে চোখ রাঙাইয়া বলে, “তোমরা নারীর মূল্য জানো না, মর্যাদা বোধ না, আমোদ-আহ্লাদে তাহাকে যোগ দিতে দাও না, ঘরের কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখ—তোমরা বর্বর।” মনু প্রভৃতি হইতে ‘পূজার্হা’ ইত্যাদি শ্লোক তুলিয়া পাঠা জবাব দিয়া আমরা বলি, “না, আমরা মা-বোনের মুখে রঙ মাখাইয়া, শ্রাম্পেন-ক্লারেট পান করাইয়া উত্তেজিত করিয়া সভা-সমিতিতে নাচাইয়া লইয়া ফিরি না, আমরা ঘরের কোণে পূজা করি। তোমাদের ঐ বল-ডাম্বের পোষাক দেখিয়া লজ্জায় আধোবদন হই, নাচ দেখিয়া চোখ বুজি। আমরা বরং বর্বর হইয়া চিরদিন মা-বোনকে ঘরের কোণে বদ্ধ করিয়া রাখিব, কিন্তু তাঁহাদের মর্যাদা বাড়াইবার জন্ত প্রকাশে ভিড়ের মধ্যে নাচাইতে পারিব না।” সাহেবেরা অবশ্য এ তিরস্কার গ্রাহ্য করে না। প্রসিদ্ধ আচার্য্য Prof. Maspero সাহেব প্রাচীন মিশরে নারীর সভ্যতা-প্রসঙ্গে তাঁহার Dawn of Civilisation গ্রন্থে এক স্থানে লিখিয়াছেন, মিশরীয় মহিলারা বক্ষ প্রায় অনাবৃত করিয়া রাজপথে বাহির হইতেন—সুতরাং, নিশ্চয়ই তাঁহারা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিলেন। যেহেতু “like Europeans they must have coveted public admiration.” কনিটা অব্যর্থ, তাহা অস্বীকার করা চলে না। নিজেদের মহিলা-সম্বন্ধে তিনি অসঙ্কোচে একথা বলিয়া গেলেন, কিন্তু এই ‘admiration’ কথাটার ঠিক বাঙলা তর্জমা করিতেও আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। যাহা হোক, আমাদের উত্তরটাও নেহাৎ মন্দ শুনাইল না। “ভিড়ের মধ্যে নাচাইতে পারিব না”; এবং “ঘরের কোণে

নারীর মূল্য

পূজা করি”। স্মৃতরাং কথার লড়াইয়ে তখনকার মত একরকম জিতিয়া যাই এবং মনু-পরাশর মাথায় করিয়া পরম্পরের পিঠ ঠুকিয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসি। অবশ্য সাহেবদের কাছে আমি হঠিতে বলি না, কিন্তু ঘরে ফিরিয়া দুই ভায়ে যদি বলাবলি করি, “ভায়া, পূজা ত করি, কিন্তু কিভাবে করি বল ত?” তখন কিন্তু এমন অনেক কথাই বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা যাহা বাহিরের লোকের কানে কিছুতেই তোলা চলে না। অতএব, আমাদের এটা নিভৃত আলোচনা।

প্রথম, সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই এ-কথা বোঝে, কেন না, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী। এবং, স্বামীর অবাধ্য হওয়া,—তিনি অতি পাষণ্ড হইলেও—তাঁহাকে মনে মনে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মত দোষ আর নাই। একটা অপরটার corollary; এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে-কথার পুনঃপুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এ-দেশে এ তর্ক এত অধিক হইয়াছে যে, এ-সম্বন্ধে আর বলিবার কিছু নাই। এখানে স্বয়ং ভগবান পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত তর্কই একতরফা—একা নারীরই জন্ত। পুরুষের এ-সম্বন্ধে যে বিশেষ কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল, তাহা কোথাও খুঁজিয়া মেলে না, এবং এতবড় একটা প্রাচীন দেশে পুরুষের সম্বন্ধে একটা শব্দ পর্যন্ত যে নাই এ-কথা খুলিয়া বলিলে হাতহাতি বাধিবে, না হইলে বলিতাম। ইংরাজ বলে, chastity, তবুও ইহার দ্বারা তাহারা নরনারী উভয়কেই নির্দেশ করে, কিন্তু এ-দেশে ও-কথাটার বাঙলা করিলে ‘সতীত্ব’ দাঁড়ায়; সেটা নিছক নারীরই জন্ত। শাস্ত্রকারেরা বনে জঙ্গলে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সমাজ চিনিতেন। তাই একটা শব্দ তৈরি করিয়াও তাঁর জাত-ভাইকে অর্থাৎ পুরুষকে inconvenient করিয়া যান নাই। তাহার প্রবৃত্তি নারী-সম্বন্ধে যত-রকমে হাত-পা ছড়াইয়া খেলিতে পারে, তাহার জায়গা রাখিয়া গিয়াছেন। পৈশাচ বিবাহটাও বিবাহ। এমনি সহানুভূতি। এতই দয়া। আর এত দয়া না থাকিলে কি পুরুষ শাস্ত্রকারকে মানিত, না, আজ বিংশ শতাব্দীতেও বিধবা-বিবাহ উচিত কি না, জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইত! কবে কোন্ যুগে সে-সব পুঁথিপত্র দরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়া মনের মত শাস্ত্র বানাইয়া লইয়া ছাড়িত। যাহাই হোক, নারীর জন্ত সতীত্ব, পুরুষের জন্ত নয়। এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়াছিল—সহমরণে। কবে এবং কি হইতে ইহার সূত্রপাত, সে-কথা ইতিহাস লেখে না। রামায়ণে স্বামীর মৃত্যুতে কৌশল্যা বোধ করি একবার রাগ করিয়া সহমরণে যাইবেন বলিয়া গুণ

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। দশরথকে একাই দন্ধ হইতে হইয়াছিল। এ গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা যায় না। তাই অনুমান হয়, ব্যাপারটা লোকের জানা থাকিলেও কাজটা তেমন প্রচলিত হইয়া পড়ে নাই। মহাভারতে মাদ্রী ভিন্ন আর যে কেহ এ-কাজ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ের পর কতক কতক ঘটয়া থাকিলেও তাহা কম। অন্ততঃ, পুরুষ যে তখনও উঠিয়া পড়িয়া লাগে নাই তাহা নিশ্চিত; অথচ দেখা যায়, অসভ্য জাতির মধ্যে এ-প্রকার বেশ প্রচলন। দাক্ষিণাত্যে সতীর কীর্তিস্তম্ভ যথেষ্ট, এবং আফ্রিকায় ও ফিজি দ্বীপে ভাগ্যে কীর্তিস্তম্ভের বালাই নাই, না হইলে ওদেশগুলায় বোধ করি এতদিনে পা ফেলিবার স্থানটুকুও থাকিত না। এক একটা ডাহোমি সর্দারের মৃত্যু-উপলক্ষে তাহার শতাবধি বিধবাকে সমাধিস্থানের আশপাশে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত; অর্থাৎ পরলোকে সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইত। পরলোকের ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট নয়, বলা যায় কি, যদি লোকাভাবে সেখানে কষ্ট হয়! সাবধানের বিনাশ নাই, তাই সময় থাকিতে একটু হুঁসিয়ার হওয়া। আমাদের এ-দেশেও মূল কারণ বোধ করি ইহাই। যাহারা অশোক রাজার রাজত্ব দেখিয়াছিল, তাহারা বলে, সে সময় বিধবাকে দন্ধ করার প্রথাটা আর্য্যাবর্তে ছিল না, দাক্ষিণাত্যে ছিল। কিন্তু আর্য্যাবর্তের আর্য্যেরা যেই ধবর পাইলেন, অসভ্যেরা অসভ্য হোক, যাই হোক, বড় মন্দ মতলব বাহির করে নাই—ঠিক ত! পরলোক যদি সত্যই কিছু থাকে ত সেখানে সেবা করে কে? অমনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন, এবং এত বিধবা দন্ধ করিলেন যে, স্পেনের ফিলিপেরও বোধ করি লোভ হইত।

এমনি করিয়া মহাভাগার পূজার উপকরণ সজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু একদিন যাহাকে বংশের হিতকামনায় ঘরের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, যাহার জন্ম হয়ত যুদ্ধ করিয়াছি, ছলনা, মিথ্যা কথা, এমন কি চুরি পর্য্যন্ত করিয়াছি, এমন এতবড় উপকারী জীবটাকে এখন হত্যা করি কেন? কারণ আছে। প্রথম, পরলোকে সেবা করে কে, দ্বিতীয়, ভাগ্যদোষে যে স্ত্রী বিধবা হইয়া গেল, তাহার দ্বারা আর কি বিশেষ কাজ পাওয়া যাইবে? বরং, ভবিষ্যতে অশান্তি-উপদ্রবের সম্ভাবনা, অতএব সময়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এখানে যদি মনে রাখা যায়, নারী ব্যক্তি-বিশেষের নিকটে সম্বন্ধ-বিশেষেই দামী, অন্তথা নহে, তাহা হইলে অনেক কথা আপনিই পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তবে, আর একটা সম্বন্ধের কথা উঠিয়া আপত্তি হইতে পারে, তাহা জননীর সম্বন্ধ। সে আলোচনা পরে হইবে।

নারীর মূল্য

যাঁহারা ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন বিধবা-বিবাহ জগতের কোন দেশে কোনদিন সমাদর পায় নাই। কম-বেশী ইহাকে সকলেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় যেদেশে এ-প্রথা একেবারেই নিষিদ্ধ, সেদেশে পুড়াইয়া মারা যে বিশেষ হিতকর অল্পাধিক বিনিয়োগ বিবেচিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতে অনেকেরই লজ্জা হইবে, কিন্তু পতিহীনা নারীর এখানে যখন আর তত আবশ্যক নাই, তখন কোনমতে ও-পারে রওনা করাইয়া দিতে পারিলে স্বামী মহাশয়ের কাজে লাগিবার সম্ভাবনা, এই ইচ্ছাই যে এ-প্রথার মূলে এ-কথা অস্বীকার করা এক গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুতেই পারা যায় না। তা ছাড়া দেখা যায়, যে-সমস্ত অসভ্য দেশে স্বামীর মৃত্যুর সহিত স্ত্রী বধ হইত, তাহাদের ঐ বিশ্বাস একান্ত দৃঢ়। তাহারা মনে করে, মৃতের আত্মা কাছাকাছি, ঝোপে-ঝাড়ে, গাছ-পালায় বসিয়া থাকে, স্মৃতরাং সন্নিবীকে পাঠাইয়া দিলে উপকার হইবে। কিন্তু আমাদের সুসভ্য এই প্রাচীন দেশ, যেদেশে আত্মার স্বরূপ পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া গিয়াছিল, ঈশ্বরের দীর্ঘ-প্রস্থ মাগিয়া শেষ করা হইয়াছিল, সেদেশের পণ্ডিতেরাও যে বিশ্বাস করিতেন, বধ করিয়া সঙ্গে পাঠান হয়, ইহাই আশ্চর্য্য! তবে এ যদি নারী-পূজার একটা বিশেষ পদ্ধতি হইয়া থাকে ত সে আলাদা কথা। পুরুষ বুঝাইয়াছে সহমৃত্যু হওয়া সতীর পরম ধর্ম্ম। মনুও বলিয়াছেন, এক পতি-সেবা ব্যতীত স্ত্রীলোকের আর কোন কাজ নাই। সে ইহকালে পুরুষের সেবা করিয়াছে, পরকালে গিয়াও করিবে। কিন্তু কখন করিবে, কতদিন পরে করিবে, এত ঝঞ্জাটে সে যাইতে চাহে নাই। তাহার বিলম্ব সহ্য না, তাই মরণ-সময়ে একটু সত্বর ও সতর্ক হওয়াই সে আবশ্যক মনে করিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, এক মাতৃঘের কারণেই সে পূজার্হা, স্মৃতরাং সে স্মরণ না থাকিলে তাহাকে লইয়া আর কি হইবে? তার পর ছোট-বড় কীর্ত্তি-স্তম্ভ উঠিয়াছে, গল্পের মধ্যে, দৃষ্টান্তের মধ্যে তখন সে স্ত্রীর দাম চড়িয়া গিয়াছে। পুরুষ যে কেবলমাত্র নিজের সুখ ও সুবিধা ব্যতীত—সেটা সত্যই হোক আর কাল্পনিক হোক—আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই, সে-কথা চাপা দিয়া গর্ভ করিয়া প্রচার করিয়াছে, যেদেশে নারী হাসিতে হাসিতে চিতায় গিয়া বসিত, স্বামীর পাদপদ্ম ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল-মুখে নিজেকে ভক্ষসাৎ করিত। ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু তাই যদি হয়, তবে স্বামীর মৃত্যুর পরই তাহার বিধবাকে একবাটি সিদ্ধি ও ধূতুরা পান করাইয়া মাতাল করিয়া দেওয়া হইত কেন? শ্মশানের পথে কখন-বা সে হাসিত, কখন কাঁদিত, কখন বা পথের মধ্যেই তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিত। ..

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এই তার হাসি, এই তার সহমৃতা হইতে যাওয়া ! তার পর চিতায় বসাইয়া কাঁচা বাঁশের মাচা বুনিয়া চাপিয়া ধরা হইত, পাছে সতী দাহ-যজ্ঞা আর সহ্য করিতে না পারে। এত ধূনা ও ঘী ছড়াইয়া অন্ধকার ধূয়া করা হইত যে, কেহ তাহার যজ্ঞা দেখিয়া যেন ভয় না পায়। এবং এত রাজ্যের ঢাক-ঢোল কাঁশি ও শাঁখ সজোরে বাজানো হইত যে, কেহ যেন তাহার চীৎকার, কান্না বা অমুনয়-বিনয় না শোনে। এই ত সহমরণ ! আমি জানি, এখানে অনেক-রকমের আপত্তি উঠিবে। প্রথমেই উঠিবে, দেশের লোকের সত্যই যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, সহমৃতা সতী পরলোকে স্বামীর সহিত বাস করিতে পায় এবং সেইজন্যই এ অনুষ্ঠান,—তাহা হইলেও আমার এই উত্তর যে, দেশের অশিক্ষিত ইতর লোক কি বিশ্বাস করিত, না করিত, সে আলোচনায় লাভ নাই, কারণ তাহারা শুধু ভদ্র ও শিক্ষিতের অনুকরণ ও অনুগমন করিত মাত্র। কিন্তু যেদেশে তখনও টোল করিয়া মহামহোপাধ্যায়েরা সাংখ্য বেদান্ত পড়াইতেন, জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন, কর্ম-ফলে জীবের স্থাবর-জঙ্গম পশু-জন্ম প্রচার করিতেন, দেবযান পিতৃযান প্রভৃতি পথের নির্দেশ করিতেন, তাঁহারা যে সত্যই বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবীতে কর্মফল যাহার যাহা হোক, দুইটা প্রাণীকে এক-সঙ্গে বাঁধিয়া পোড়াইলেই পরলোকে একসঙ্গে বাস করে—এ-কথা স্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।

লেকি সাহেব লিখিয়াছেন, এই প্রথা ইংরাজেরা যখন তুলিয়া দেন, তখন টোলের পণ্ডিত-সমাজ চেষ্টামেচি করিয়া সভা-সমিতি করিয়া, রাজা-রাজড়ার নিকট চাঁদা তুলিয়া বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল, এ-প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেলে হিন্দু-ধর্ম বনিয়াদ-সমেত বসিয়া হিন্দু একেবারে ধর্মচ্যুত হইয়া যাইবে। নারী-পূজা বটে !

তার পর আপীল যখন নিতান্তই নামঞ্জুর হইয়া গেল, এবং বেশ বুঝা গেল, অতঃপর ঢাক ঢোল কাঁশি শাঁখের শব্দে পিয়াদার কান ঢাকা পড়িবে না, এবং ধূনা পোড়াইয়া সমস্ত নদীর কিনারাটা অন্ধকার করিয়া ফেলিলেও দারোগার দৃষ্টি এড়াইবে না, তখন ধর্মধ্বজেরও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সনাতন হিন্দু-ধর্মের বনিয়াদ ইঞ্চি-কয়েক বসিয়া গেলেও যদি বা চলে, পুলিশের হাঙ্গামায় পড়িলে চলিবে না ; সুতরাং অল্প পথের সন্ধান দেখিতে হইল। রাজার কাজ রাজা করিয়া গেলেন, কিন্তু সমাজ-রক্ষকের কাজ বাড়িয়া গেল। এ দুর্দিনে বসিয়া পড়িলে চলিবে না। তাঁহারা কহিলেন, স্নেহ আমাদের ধর্ম বুঝিল না,—আইন করিয়া বসিল ; আমরা কিন্তু হাল ছাড়িব না। এইখানে বসিয়াই আমাদের বিধবাকে দেবী

নারীর মূল্য

বানাইয়া তুলিব। তাহার পর শাস্ত্রের পুরাতন শ্লোক এতদিন যাহা অব্যবহারে কোথায় পড়িয়াছিল, তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া লোকাচারের দোহাই দিয়া, সুনীতির দোহাই দিয়া, যত-রকমের কঠোরতা কল্পনা করা যাইতে পারে সমস্তই সন্ত-বিধবার মাথায় তুলিয়া দিয়া তাহাকে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া দেবী করা হইতে লাগিল। সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, খান-ফাড়া কাপড় পরে, কেন না সে দেবী। চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল, আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে! অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছানলা-তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না—পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে। মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাক্ষের পিণ্ড রাঁধিতে।

তার মা তাহাকে দেখিয়া হয়ত বা সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্বখে পড়িয়া মারা গেলেন। বাপ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 'দায়ে পড়িয়া', 'নিতান্ত অনিচ্ছায়' 'লোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া' তার চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। ঘরের বিধবা মেয়ের উপর হুকুম হইয়া গেল, একটু সকাল সকাল, অর্থাৎ বেলা দশটার মধ্যে রাঁধিয়া বাড়িয়া তাহার বোমাকে যেন খাওয়ানিয়া দেওয়া হয়। না হইলে ছোট মেয়ে, হয়ত পিত্ত পড়িবে। এ-বাড়িতে বিধবা-মেয়ে ও নববধূর মূল্য যে এক বাটখারায় ধার্য হইতে পারে না, সে-কথা বোধ করি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাপ ত বিবাহ করিয়া আনিলেন,—ইনি প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত, টোলার অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞানেরও নাকি সীমা নাই, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে একথানা বইও লিখিয়াছেন,—কিন্তু সে যাই হোক, যে লোক এক বাটীর মধ্যে বাস করিয়া ও তাহার নিজের মেয়ের চেয়ে ছোট একটি মেয়েকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সে যে কেমন করিয়া মুখে আনে, ঘরের কোণে নারীজাতিকে পূজা করি, এ আমার বুদ্ধির অগোচর! অথচ যে পুরুষ এ-রকমটি করে নাই, সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে, যে করে সে করে, আমরা ত পারি না। অর্থাৎ সে ভাবিতে চায় না, এ অবস্থায় সে নিজে কি করিবে। অবশ্য, ও দুর্ঘটনা ঘটবার পূর্বে কাহাকেও স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায় না, কিন্তু শতকরা নিরনব্বই জন পুরুষ যে ঠিক এমনটাই করে, তাহা নিঃসন্দেহ। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও পুরুষ ঘরের মধ্যে আরও একশত স্ত্রী আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলেও তাহাকে দেবী হইতেই হইবে, এই ব্যবস্থা এদেশের সমস্ত নারীজাতিকে যে কত হীন, কত অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে-কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

থাক্ এ-কথা। আমাদের সহমরণের কথা হইতেছিল। এবং সেই স্ত্রী পুরুষের নারী-পূজার উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে যদি কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এদেশে সমস্ত সতীকেই কি জোর করিয়া সহমরণে বাধ্য করা হইত? স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন কি ছিল না? রাজপুত্রের জ্বর-ত্রতের কথা কি জগৎ শুনে নাই? এই ত সেদিনও বাঙালীর ঘরে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্রই স্ত্রী সর্বদা কেবল চালাইয়া পুড়িয়া মরিয়াছে। এমন পতিভক্তি, এমন গৌরবের কথা আর কোন্ দেশে শোনা যায়? শোনা যদি নাও যাইত, তাহাতেও পুরুষের যশঃ কিছুমাত্র বৃদ্ধি করিত না, কিংবা নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা-ভক্তিও সপ্রমাণ করিত না। তন্নিয়, বলপূর্বক হোক, কৌশল করিয়াই হোক, কিংবা মাতাল করিয়াই হোক, একটিমাত্র নারীকেও দণ্ড করা কি একটা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

সেদিন ঐ কেবল আত্মহত্যা করায় দেশের অনেকেই বাহবা দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ সতী বটে! অর্থাৎ, আরো দুই-চারিটা এমন ঘটিলে তাহারা খুশী হয়। এ ঘটনায় এ-দেশের পুরুষের মনের গতি যে কোন্‌দিকে, শুধু যে ইহাই বুঝিতে পারা গিয়াছিল তাহা নয়, এমন দেশে একসঙ্গে বাস করিয়া নারীর মনের গতিও যে স্বভাবতঃ কোন্‌দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, তাহাও বুঝিতে পারা গিয়াছিল। যে যাহার আশ্রিত, সে তাহাকে সুখী করিতেই চায়। আমি যদি বাটীর মধ্যে সকলকেই একবাক্যে ঐ প্রশংসা করিতে শুনি, আমারো ঐ অবস্থায় সুখ্যাতি ও বাহবা-লাভের লোভ যে প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। ইহার উপর ধর্মের গন্ধ আছে। সে-বেচারার হাতে নাকি গীতা ছিল। গীতায় কি ওই কথা বলে? কিন্তু সে ভাবিল, গীতা হাতে থাকিলে আরো ভাল। এখানে অশোভন উদাহরণ দিবার ইচ্ছা আমার না হইলে এই গৌরবান্বিত কেবল আত্মহত্যায় এমন মেয়ের কথাও বলা যাইতে পারিত, যে সতীও নয়, এবং ঠিক স্বামীর শোকেও এ-কাজ করে নাই। তা ছাড়া, শাওড়ীর গজনাথ, সময়ে বিবাহ না হইবার লাঞ্ছনায়,—ইত্যাদি আরও অনেক সংবাদ খবরের কাগজ লিখে,—কিন্তু সে-সব থাক্। আমাদের সতী-সাধীর কথাই চলুক।

• স্বামীর মৃত্যুতে কাহারও কাহারও আত্মহত্যা করিবার কি যে একটা প্রবল ঝোঁক হয়, তাহা যাহারা চোখে দেখিয়াছে তাহারাই জানে। আমি একজনকে তেতালার ছাদ হইতে পড়িয়া মরিতে দেখিয়াছি, আর একজনকে গলায় দড়ি দিতে দেখিয়াছি—বিষ খাইয়া মরিতে অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া এ মরা,

নারীর মূল্য

আর চিতায় বসিয়া একটু একটু করিয়া দগ্ধ হওয়া এক বস্তু নয়। একটায় ঝাঁকের মাথায় মরা, কিন্তু আর একটায় আঙনের তাপে সে ঝাঁক বহুপূর্বেই কাটিয়া যায়; তখন আত্মবিসর্জন খুনে পরিণত হয়। টাইলার সাহেব বলেন, আফ্রিকার সর্দার-পত্নীরা বহুদিন পূর্বে হইতেই গলায় দিবার দড়ি নিজে মনোনীত করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। হারবার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, ফিজি দ্বীপে সন্ত-মৃত সর্দারের পত্নীরা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত সংকল্প বলিয়া মনে করে, এবং কেহ বাধা দিলে তাহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হয়। তিনি লিখিয়াছেন, The wives of the Fijian chiefs consider it a sacred duty to suffer strangulation on the deaths of their husbands. A woman who has been rescued by Williams escaped during the night, and, presenting herself to her own people insisted on the completion of the sacrifice which she had in a moment of weakness reluctantly consented to forego; and Wilkes tells of another who loaded her rescuer with abuse, and ever afterwards manifested the most deadly hatred towards him. ইহাতে কি বুঝা যায়? বুঝা যায় যে, সহমরণ গৌরবের কাজ হইলে আধ্যাত্মিক ভিন্ন আরো অনেক নীচ জাতি আছে যাহারা তুল্য গৌরবের অধিকারী। আরো একটা কথা এই, পুরুষেরা যাহা ইচ্ছা করে, যাহা ধর্ম বলিয়া প্রচার করে, নারী তাহাই বিশ্বাস করে এবং পুরুষের ইচ্ছাকেই নিজের ইচ্ছা বলিয়া ভুল করে এবং ভুল করিয়া স্মৃথী হয়। ইহাতে পারে ইহাতে নারীর গৌরব বাড়ে, কিন্তু সে গৌরবে পুরুষের অগৌরব চাপা পড়ে না। যেই প্রশ্ন করা হয়, এত নির্ভুর প্রথা কেন? উত্তর তৎক্ষণাত্ মুখে আসিয়া পড়ে, পরলোকে গিয়া স্বামীর সেবা করিবে। অথচ পরলোক যে কি, তাহা কয়টা পুরুষ জানে? আশ্চর্য্য, এত অত্যাচার, অবিচার, পৈশাচিক নির্ভরতা সহ করা সত্ত্বেও নারী চিরদিন পুরুষকে স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভক্তি করিয়াছে, এবং বিশ্বাস করিয়াছে। যাহাকে সে পিতা বলে, ভ্রাতা বলে, স্বামী বলে, সে যে এত নীচ, এমন প্রবঞ্চক, এ-কথা বোধ করি সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বোধ করি এইখানেই তাহার মূল্য।

বিষমঙ্গল একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। বহুদিন হইতে ইহা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বাঙালী আগ্রহ করে না, কারণ ইহাতে ধর্মের কথা আছে। সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বণিক লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিয়া নিজের সহধর্মিণীকে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সম্পট অতিথির শয্যা প্রেরণ করে। দর্শক অর্থ ব্যয় করিয়া দেখে এবং খুব তারিফ দিতে থাকে; বণিকের বক্তার মার মর্ষ এই, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এই বাড়িতে অতিথি বিমুখ করিবে না। পাছে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, পাছে অধর্ম হয়, পাছে মৃত্যুর পর যমদূতে ডাঙস্ মারে, এই তার ভয়। তাহার মনের ভাবটা এই যে, আমার পায়ে তৃণাকুরও না বিদ্ধ হয়—তোমার যা হয় তা হোক। তা ছাড়া, শাস্ত্রে আছে, সর্বস্ব দিয়াও অতিথি-সংকার করিবে। অর্থাৎ ধন-দৌলৎ, হাতি-ঘোড়া, গরু-বাছুর, যা-কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই। কিন্তু অতিথিটা যখন ও-সব চায় না, তখন তুমিই যাও। আমার কাছে সে তোমাকে চাহিয়াছে—এবং তুমি আমার স্বাবর অস্বাবর সম্পত্তির মধ্যে। স্বামীর কাছে পতিব্রতা স্ত্রীর সম্মান এই! অপরিচিত পাপিষ্ঠ অতিথির সেবার তুলনায় স্ত্রীর মূল্য এই! যাহারা বিধমঙ্গলের ভক্ত, তাহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, অতিথির জন্ত হিন্দু প্রাণ দিতে পারে—কর্ণ পুত্রহত্যা করিয়াছিল। এ-সব কথা আমিও জানি। দাতাকর্ণ মস্ত কাজ করিয়াছিলেন, বণিকও মস্ত কাজ করিয়াছে। কিন্তু কথা সে নয়। প্রাণটা তোমার নিজের, ইচ্ছা হয় সেটা না হয় দিতে পার, কিন্তু এই যে ধারণা,—স্ত্রী তোমার সম্পত্তি, তুমি স্বামী বলিয়া ইচ্ছা করিলে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে, তাহার নারী-ধর্মের উপরও অত্যাচার করিতে পার, তাহাকে রাখিতেও পার, মারিতেও পার, বিলাইয়া দিতেও পার,—তোমার এই অনধিকার, এই স্বৈচ্ছাচার তোমাকে এবং তোমার পুরুষজাতিকে হীন করিয়াছে, এবং তোমার সতী স্ত্রীকে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান করিয়াছে। অতিথি-সেবা খুব মস্ত ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য যেমন তুমি চুরি-ডাকাতি করিতে পার না, এটাও ঠিক তেমনি পার না। ইহুদীরা যখন পণ্ডুর মত ছিল, তখন তাহারা সম্পত্তির সঙ্গে স্ত্রীর বখরা করিত। এখনও অনেক অসভ্য জাতি বাড়ি-ঘর জমি-জমা গরু-বাছুরের সঙ্গে বাড়ির স্ত্রীগুলিকেও ভায়ে ভায়ে ভাগ করিয়া লয়। স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে বণিকের ধারণাও প্রায় এমনি। আর অতিথি-সংকার যদি এতবড় ধর্মই হয়, যার কাছে সতী স্ত্রীর সর্বস্ব নষ্ট করিয়া ফেলাও ধর্মপালন, তবে এখনো যাহারা এই ধর্ম রাখিয়া চলে তাহাদের নীচ বলা শোভা পায় না।

* আমেরিকার অসভ্য ছিগুক জাতির সম্বন্ধে কাণ্ডেন লুইস্ বলিয়াছেন, ইহারা অতিথির শয্যা বাটীর শ্রেষ্ঠ কন্ঠাটিকে, না হয়, স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেওয়া অতি উচ্চ অঙ্গের ধর্মপালন বলিয়া মনে করে। এসিয়ার চুক্চি জাতি সম্বন্ধে অসম্মান সাহেব লিখিয়াছেন,—The Chuckchi offer to travellers, who chance to

নারীর মূল্য

visit them, their wives, and also what we should call their daughters' honour. কাপ্তেন লায়ন এবং সার্জন লবক, এস্কুইমো, কামস্‌ট্‌কা-নিবাসী ও কালমুখদের সম্বন্ধেও ঠিক এমনি অতিথি-সেবার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। হারবার্ট স্পেন্সর তাঁহার Descriptive Sociology গ্রন্থে এমনি বহুতর দয়ার কাহিনী প্লস্ ও প্যালাস্ সাহেবদের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের সহিত আমাদের ধার্মিক বণিকটির প্রভেদ কোন্‌খানে? সে-দেশের পুরুষেরাও যাহা কর্তব্য এবং ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহাই পালন করিয়াছে—ইনিও তাই; অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা উভয়েরই সমান, উভয়েই মনে করিয়াছে, অতিথি সন্তুষ্ট না হইলে আমার পাপ হইবে, আমি কষ্ট পাইব। কথাটাকে যেমন ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেও ওই একটা 'আমি' ছাড়া আর কিছুই পাইবার যো নাই। ওই 'আমি'টার মধ্যে নারীর প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা যে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evil, অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল। ইউরোপ-প্রসিদ্ধ ল্যাটিন ধর্মযাজক টায়টুলিয়ান নারীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—Thou art the devil's gate, the betrayer of the true, the first deserter of the Divine law. ধর্মযাজক সেন্ট অগষ্টিন, যিনি সেন্ট পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it be in person of mother or sister; we have to be beware of Eve in every woman. সেন্ট অ্যাম্ব্রোস্—ইনিও 'সেন্ট'—তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body not a part of his soul to make her.

৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আহুত ওসিয়ার ক্রীশ্চান ধর্ম-সম্বন্ধে নাকি হির হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। ধর্মের জন্তে যে নারীজাতি মরে বাচে, যে ধর্ম-গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি নারীর অচলা ভক্তি, সেই ধর্মগ্রন্থ লিখিবার সময় পুরুষ নারীজাতিকে কি শ্রদ্ধাই দেখাইয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সেন্ট বার্নার্ড (ইনিও সেন্ট) জননীর উদ্দেশে পত্র লিখিয়াছেন, What have I to do with you? What have I received from you but sin and misery? Is it not enough for you that you have brought me into this miserable world, that you being sinners have begotten me in sin.....

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

আজ ইউরোপবাসীরা অহঙ্কার করিয়া বলে, তাহারা যেমন নারীর dignity বোধে, এমন আর কেহ নহে। অথচ, নারীজাতিকে গত ১৩১৪ শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ অসহ্য ঘৃণা করিয়াছে, যত ক্রেশ দিয়াছে, যত অবনত করিয়াছে, তত আর কোন জাতি করিয়াছে কি-না সন্দেহ। ইহাদের sacredotal celibacyর ইতিহাস, চার্চের ইতিহাস প্রভৃতির পাতায় পাতায় যে পুণ্য-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তৎসঙ্গেও ইহাদের মুখের শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা উপহাস ব্যতীত যে আর কি হইতে পারে জানি না।

যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে, আদিম জননী ইভার পাপের উপর, যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাহার শ্রদ্ধা শুধু ততটুকুই হইতে পারে যতটুকুতে নিজের স্বার্থ জড়িত হইয়া আছে। তাহার অধিক শ্রদ্ধাই বল, জীব্য অধিকারই বল, সহস্র বৎসর পূর্বেও পুরুষে দেয় নাই, সহস্র বৎসর পরেও দিবে না। মিল সাহেব তাঁহার Subjection of Women গ্রন্থে 'isolated fact' বলিয়া মিথ্যা দুঃখ করিয়া গিয়াছেন।

শুনিতে পাই, এক মহানির্বাণতন্ত্রের "কণ্ঠাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াত্যত্নতঃ" আদেশ ছাড়া আর কোন শাস্ত্রেই নারীকে শিক্ষা দিবার হুকুম নাই। স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের উপক্রমণিকা খণ্ডে ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক বেদ পর্য্যন্ত তৈরী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ-সমস্ত তর্ক কোন কাজেই লাগে না, পুরুষ যখন শাস্ত্রের "ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" শ্লোকের সন্ধান পাইয়াছে। ইউরোপের কোন এক প্রাচীন ধর্মযাজক লিখিয়া গিয়াছেন Shall the maid Olympias learn philosophy? By no means, Woman's philosophy is to obey laws of marriage. মার্টিন লুথার সর্বদাই বলিতেন, No gown worse becomes a woman than the desire to be wise. চীনদেশে একটা প্রচলিত বাক্য আছে, জ্ঞান যেমন পুরুষের শোভা বৃদ্ধি করে, অজ্ঞান তেমনি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহার পর সে আর পুরুষের হাত হইতে কি মঙ্গল আশা করিতে পারে? কবে উর্কনী বেদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, কেন শ্রোতৃসমূহে পত্নীকে বেদ প্রদান করিবার কথা ছিল, স্বামী প্রবাসে থাকিলে কি-হেতু দশ পৌর্ন-মাস ব্রতে স্ত্রীর হোম করিবার অধিকার হইয়াছিল, বৃহদারণ্যকোপনিষদের

নারীর মূল্য

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী, যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী-সংবাদ কেন রচিত হইয়াছিল, এ-সব আলোচনা অরণ্যে রোদন। ছয়-সহস্র বৎসর পূর্বে মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার দিনে নারীর অধিকার সম্বন্ধে মাস্‌পেরো "husband a privileged guest", "she inherited equally with her brothers", "mistress of the house", "judicially equal of man", "having the same rights and being treated in the same fashion" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সভ্যতার আলো রোম পাইয়াছিল বলিয়া তাহার নারীজাতিও এ-সময় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। এই pagan law পরবর্তী সুসভ্য আইন-কাহ্ননের মধ্যে কোথায় ডুবিয়াছে, মেম সাহেব তাঁহার Ancient Law গ্রন্থে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

সার হেনরীর এই অধ্যায়টা আমি সকল শিক্ষিতা রমণীকেই পড়িয়া দেখিতে অহরোধ করি।

ইউরোপের আইন-কাহ্ননের মধ্যে প্রাচীন রোমের প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হইলেও, নারী সম্বন্ধে ইহুদীদের কড়া ব্যবস্থাই অধিক স্থান পাইয়াছে। কেন না, এইগুলাই পুরুষের ভাল লাগিয়াছে এবং মনের সঙ্গে মিলিয়াছে। প্রথমে মনে হয় বটে, ধর্মের নৈকট্য হেতু ইহাই ত স্বাভাবিক; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক বটে, কিন্তু শুধু তাহা ধর্মের ঘনিষ্ঠতা হেতুই স্বাভাবিক নয়, তাহা পুরুষের মনোনীত হইয়াছে বলিয়াই স্বাভাবিক হইয়াছে। অবশ্য ধর্মের চাপ ত আছেই। যীশুখৃষ্ট অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী-জাতির উপর অত্যাচার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া একটি কথাও কোথাও বলিয়া যান নাই। জগৎ-বিখ্যাত সেন্ট পল শিখাইয়াছেন, ধর্ম সম্বন্ধে নারী পুরুষের মত কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না। সে সর্বদাই তাহার স্বামীর অধীন। যেহেতু ঈশ্বর নারীকে পুরুষের জ্ঞানই সৃজন করিয়াছেন, পুরুষকে নারীর জ্ঞান সৃজন করেন নাই। আরও বলিয়াছেন, নারী কোন পুরুষকে শিক্ষা দিতে পারিবে না। সে-ই সংসারে পাপ প্রবেশ করাইয়াছে। তাহার অনন্ত নরকে ডুবিবে, সদগতির কোন উপায় নাই। তবে সদগতি হইতে পারে, গর্ভে সন্তান ধারণ করিতে পারিলে। ঈশ্বর-জানিত পল ঠাকুরের উক্তি কি সুন্দর। নারীর মুক্তির কি সোজা পথ! এবং এই পথের পরিচয় বিলাতের যে-কোন ধর্মগ্রন্থ খুলিলেই চোখে পড়ে। আমাদের শাস্ত্রে সন্তানের জন্মই নারী মহাভাগা, এবং পুত্রের জন্মই ভার্য্যাগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। এবং সংসারের যে-কোন দেশের ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে কম-বেশী এই-রকমের ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নারীর সম্মান তাহার নিজের জন্ত নহে, তাহার সম্মান নির্ভর করে পুত্র-প্রসবের উপর। পুরুষের কাছে এই যদি তাহার নারী-জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, ইহা কোনমতেই তাহার গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু সত্যই তাই। এ-ছাড়া তাহার কাছে সংসার আর কিছুই আশা করে না, এবং সে যত-কিছু সম্মান দিয়া আসিয়াছে তাহা এই জন্তই। আমাদের শাস্ত্রে ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি আছে। কুস্তীকে পঞ্চপাণ্ডবের, অম্বিকা-অম্বালিকাকে পাণ্ডু-ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম দিতে হইয়াছিল। সতী নারীর পক্ষে ইহা প্লাবার কথা নহে। প্রাচীন ইহুদী সমাজে অপুত্রক বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সন্তান-কামনায় দেবরের উপপত্নী হইয়া থাকিতে হইত। নারীর জন্ত যে-সকল শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থা ডুটরনমির পঁচিশ অধ্যায়ের গোড়ার দিকে লিপিবদ্ধ করা আছে, পড়িলে ঘৃণা জন্মিয়া যায়। মনে হয়, সন্তান-কামনায় ইহাদের সমাজে নারীকে কি না করিতে হইত। এমনি আফ্রিকাতেও সন্তানের জন্ত নারীকে বাধ্য হইয়া অসাধ্য সাধন করিতে হইত। হারবার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, Dahoman like all other semi-barbarians considers a numerous family the highest blessing. আফ্রিকার পূর্ব অঞ্চলে it is no disgrace for an unmarried woman to become the mother of numerous family; woman's irregularities are easily forgiven if she bears many children. ওটিয়াকস্‌দিগের মধ্যে it is honourable for a girl to have children. She then gets a wealthier husband and her father is paid a higher halym for her. ওল্ড টেষ্টামেন্ট বাইবেলের মতে স্ত্রীর সন্তান না হওয়া মহাপাপ। নারীর মূল্য কি দিয়া যে ধার্য হয় সে-কথা বুঝাইবার জন্ত আর বেশী নজির তুলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। পুরুষের এই স্বার্থের জন্তই যে তার মান, এইজন্তই যে মর্যাদা, আবশ্যক হইলে এ সত্য আরও সহস্র প্রকারে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু সে প্রয়োজন বোধ করি নাই। কিন্তু স্বার্থের জন্তই যে পুরুষ তাহাকে চিরদিন নির্যাতন এবং অপমান করিয়া আসিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আরো কিছু বলা আবশ্যক। কেন না, এ-কথা পুরুষে বুদ্ধিতেও স্ত্রীলোক বুঝে না, বোধ করি বুঝিতে চাহে না। সংসারে ছোট-খাটো সুখ-শান্তির মধ্যে থাকিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কি করিয়া সে মনে করিবে, এই স্বামী তাহার আন্তরিক মঙ্গল কামনা করে না! পিতার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিয়া সে ভাবিবে, এই পিতা তাহার মিত্র নহে! বাস্তবিক পৃথগ্ভাবে একটি একটি করিয়া দেখিলে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য, কিন্তু সমগ্রভাবে সমস্ত নারীজাতির সুখ-দুঃখের,

নারীর মূল্য

মঙ্গল-অমঙ্গলের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিলে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর সমস্ত হীনতা সমস্ত ফাঁকি একমুহূর্তেই সূর্যের আলোর মত ফুটিয়া উঠে। একটু বুঝাইয়া বলি। কোন একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায় তাহা নহে, ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাহারা সম্পন্ন করেন, তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাঁহারা পুরুষ—পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়, তাঁহারাও আত্মীয় নহে, নারীমাত্র। পুরুষ তখন পিতা হইয়া কণ্ঠার দুঃখের কথা ভাবে না; সে তখন পুরুষ হইয়া পুরুষের কল্যাণ চিন্তা করে—নারীর নিকট হইতে কতখানি কিভাবে আদায় করিয়া লইবে, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। তার পর মলু আসেন, পরাশর আসেন, মোজেজ আসেন, পল আসেন, শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ারী করেন—স্বার্থ তখন ধর্ম হইয়া সূদৃঢ় হস্তে সমাজ শাসন করিবার অধিকার লাভ করে। দেশের পুরুষ-সমাজ, ব্যাসদেব, শাস্ত্রকারেরা গণেশ-ঠাকুর নাত্র। সকল দেশের শাস্ত্রই অনেকটা এইভাবেই প্রস্তুত। তার পর শাস্ত্র মানিয়া চলিবার দিন আসে। ধর্মের আসন জুড়িয়া বসিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না, এবং সেই ধর্ম-পালনের মুখে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ স্নেহ-মমতা ভালো-মন্দ বক্তার তৃণের মত ভাসিয়া যায়। দেশের সহমরণেও তাহা দেখিয়াছি, অত্যাগ্র দেশের অধিকতর নিষ্ঠুর ব্যাপারের মধ্যেও তাহা দেখিয়াছি। ইহুদীরা ঠাকুরের সম্মুখে পুত্র-কন্যা বলি দিতে কুণ্ঠিত হইত না। সম্ভান-হত্যার কত নিষ্ঠুর ইতিহাস যে তাহাদের ধর্ম-পুস্তকের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে তাহার সংখ্যা হয় না। তাহাদের মলেক দেবতাটা ত শুধু এইজন্তই অমর হইয়া আছেন। মেক্সিকো-বাসী পিতা-মাতারা তেজকাটলিপোকা ঠাকুরের সম্মুখে তাহাদের শ্রেষ্ঠ কন্যাটিকে হত্যা করিয়া পুণ্য অর্জন করিতে লেশমাত্র দ্বিধা করিত না। দাতা কর্ণের মত ধর্মের নামে পুত্র হত্যা করিতে অনেক দেশে অনেক রাজাকেই দেখা যায়। মেবারের রাজা পুত্র বলি দিয়াছিল, কার্থেজের রাজা দেবতার সম্মুখে কন্যা বধ করিয়াছিল। প্রাচীনদিনের বোধ করি এমন একটি দেশও বাকী নাই যেখানে ধর্মের নামে সম্ভান-হত্যা ঘটে নাই। তবে কি তখনকার দিনে পিতা-মাতারা সম্ভানকে ভালবাসিত না? বাসিত নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায় ছিল তখন স্নেহ-মমতা? থাকিতে পায় না। প্রথা যখন একবার ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়, দেবতা প্রসন্ন হন, পরকালের কাজ হয়, তখন কোন নিষ্ঠুরতাই আর অসাধ্য হয় না। বরঞ্চ, কাজ যত নিষ্ঠুর, যত বীভৎস হয়, পুণ্যের ওজনও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সম্ভান বলিয়া পিতা-মাতা আর তখন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ী-মমতা হয়ত বাধা দিতেও আসে, কিন্তু তখন আর উপায় থাকে না। স্বার্থের জন্ত পুরুষ সাধারণভাবে একবার যে প্রথাকে ধর্মের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা করে, পিতা হইয়া আর সেই প্রথাকে নিজের সম্বন্ধে বেলা অতিক্রম করিতে পারে না।

পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত যখন তাহাকে বালিকা কন্যার বিবাহ দিতে হয়, হয়ত তাহার ক্ষণকালের জন্ত বৃদ্ধে বাজে, কিন্তু উপায়ও সে খুঁজিয়া পায় না। তাহাকে জাত বাঁচাইতে হইবে। ধর্ম-রক্ষা করিতে হইবে। যে-প্রথা সে পুরুষ হইয়া, সমাজের একজন হইয়া নিজের হাতে গড়িয়াছে, এখন সেই প্রথা তাহাকে এক হাতে চোখ মুছায়, আর এক হাতে সম্প্রদান করিতে বাধ্য করে। স্নেহের এত বড় জোর নাই যে, তাহাকে এই নির্দয় কর্ম হইতে বিরত করিতে পারে। স্মৃতরাং দেখা যায়, স্নেহ-মায়ী-দয়া থাকা সত্ত্বেও লোকে অমঙ্গল করিতে পারে, এবং পরম আত্মীয় হইয়াও পরম শত্রুর মতই ক্লেষ দিতে পারে। আজ সে স্বার্থের কথা মনে করিতে পারিবে না জানি, এখন সে ধর্মের দোহাই পাড়িয়াই আপনাকে শাস্ত করিবে, কিন্তু কোথায় ইহার সুদৃঢ় মূল নিহিত আছে, ইহা যদি সে তলাইয়া দেখিতে চাহে, সেখানে অথও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই সে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এ দেখা কঠিন। পিতার পক্ষেও কঠিন, তাহার কন্যার পক্ষেও কঠিন। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-পালনের মধ্যে মানুষ যখন একান্ত মগ্ন হইয়া থাকে, চোখের দৃষ্টিও তখন তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়। সে কোনমতেই দেখিতে পায় না, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম। বৈদিক যজ্ঞের অগণিত পশু-হত্যার মধ্যে কোথায় অন্তায় ছিল, মানুষ তখনই শুধু দেখিতে পাইয়াছে বৃদ্ধদেব যখন তাহাকে পৃথক করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সহমরণ আজ রহিত হইয়া গিয়াছে, তাই আজ সে-কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠি। গঙ্গা-সাগরে সম্বান নিক্ষেপ করার মধ্যে কত পাপ গোপন ছিল, আজ তাহা দেখিতে পাইয়া ইংরাজের আইনকে সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করি। অথচ সে-সময় কত না লড়াই করিয়াছি। গাঁটের পয়সা অপব্যয় করিয়া বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিয়াছি। যাহারা প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিল, আপীল করিতে, বাধা দিতে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা-দিগকে পরম মিত্র বলিয়া আহ্বান করিয়াছি, স্বর্গীয় রামমোহনকে ধর্মদেবী রাক্ষস বলিয়া গালি-গালাজ দিয়াছি।, আজ সে ভ্রম বোধ করি ধরা পড়িয়াছে,—তথাপি চৈতন্য হয় নাই। আজও সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিতে টোলের ভট্‌চাখির নিকট ছুটিয়া যাই। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তাহাদিগকে গিয়া প্রশ্ন করি। কারণ, তাহারা শাস্ত্রবিৎ। কিন্তু এ-কথাটা একবারো ভাবি না, তাহারা শাস্ত্রের

নারীর মূল্য

শ্লোকই জানে—আর কিছু জানে না। বিচার চরম উদ্দেশ্য যদি হৃদয় প্রশস্ত করা হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই পড়াশুনা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা একবারও চিন্তা করি না। মেয়ের কত বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত, জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা শাস্ত্র আওড়ায়, বিধবা-বিবাহ উচিত কি না, জানিতে চাহিলে পুঁথি খুলিয়া বসে। মিলাইয়া দেখিতে চায়, শ্লোকে কি বলে শাস্ত্র তাহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রের বাহিরে তাহারা দেখিতে পায় না, শাস্ত্রের বাহিরে তাহারা পা বাড়াইতেও পারে না। ইহারা মুখস্থ করিবার ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলিয়া মনে করে, এই মুখস্থ করাটাকেই জ্ঞান বলিয়া জানে। এই জ্ঞান ইহাদের অধিকাংশ অবস্থাতেই যে অল্পস্বর-বিসর্গকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার শ্রীগোপাল মল্লিক ফেলোশিপের দ্বিতীয় লেকচারে নামকরণ-প্রণালীর মধ্যে বলিয়াছেন, “কেহ কেহ বলেন, মেরুতন্ত্রে লণ্ডন নগরের উল্লেখ আছে, অতএব উহা নিতান্ত আধুনিক। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, পুরাণাদিতে অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা আছে। মেরুতন্ত্রেও ভবিষ্যদ্বক্তা স্থলেই লণ্ডন নগরের উল্লেখ আছে। সুতরাং তদ্বারা মেরুতন্ত্রের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না। উহা যে ভবিষ্যদ্বক্তা, তাহা দেখাইবার জন্ত মেরুতন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

পূর্বান্মায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্তিতা
ফিরিজি ভাষয়া মন্ত্রা যেষাং সংসাধনাং কলৌ ।
অধিপামগুলানাঞ্চ সংগ্রামেষপরাজিতাঃ ।
ইংরেজা নবষট্ পঞ্চ লণ্ডুজাশ্চাপিভাবিনঃ ।”

অথচ, স্বর্গীয় অক্ষয় দত্ত মহাশয় ছদ্ম শাস্ত্রকারগণের জুয়াচুরি সপ্রমাণ করিতে মেরুতন্ত্রের এই শ্লোকটাই তাঁহার ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে’র উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের উভয়ের পাণ্ডিত্যই অতি গভীর ছিল, অথচ একজন যে শ্লোকের অস্তিত্বে সন্দেহ বোধ করিয়াছেন, আর একজন তাহাকেই ঘৃণার সহিত বর্জন করিয়াছেন। এস্থলে কাহার বিচার সমীচীন, তাহা বুঝিতেও যেমন বিলম্ব হয় না, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতচূড়ামণির মুখে এমন কথা, সংস্কৃত শ্লোকের উপর এতবড় অন্ধবিশ্বাস দেখিয়াও আর আশা-ভরসার স্থান থাকে না। পণ্ডিত মহাশয় আবার নিজেই বলিয়াছেন—মেরুতন্ত্রের প্রামাণ্য সন্দেহ করিবার অন্য কারণ আছে। তাহা এই—পারশ্ব ভাষায় ও ফিরিজি ভাষায় যে-সকল মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তত্তদ্বাষাবিদেরা জানেন যে, বস্তুগত্যা উহাদের অস্তিত্ব নাই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এইখানে অতি অনিচ্ছায় তাঁহার মনে একটু খটকা বাজিয়াছে। তা সে কিছুই না। পুরাণাদিতে যখন যোগবলে হাত গণিয়া ভবিষ্যৎ বলা হইয়াছে, মেরুতন্দের গ্রন্থকারও তেমন হাত গণিয়া লগুন নগরের এবং কলিকালের মন্ত্রসিদ্ধ ইংরাজের পরাক্রমের কথা বলিবেন, ইহা বিচিত্র কি? এইজন্য তিনি পূর্ব হইতেই সন্দেহ-কারীকে সতর্ক করিয়া পুরাণাদির ভবিষ্যদ্বক্তির কথা পাড়িয়াছেন। ধন্য বিশ্বাস! ধন্য যুক্তি! আমি জানি, আমার কথাগুলো অনেকেরই ভাল লাগিতেছে না এবং বিরুদ্ধ তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকিলে অনেক রকমেই করা যাইবে। কিন্তু ইহা তর্কের কথা নহে, বিবাদ-বিসম্বাদের বস্তু নহে; ভাবিবার বিষয়, কাজ করিবার সামগ্রী। স্বদেশ-বিদেশের শাস্ত্রে, ইতিহাসে, যাবতীয় জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমার চেয়ে যঁহার পড়াশুনা অধিক, তর্ক করিবার ইচ্ছা করিলে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন জানি, কিন্তু যে সত্য আমি হৃদয়ের ব্যথার ভিতর দিয়া বাহির করিলাম, সে সত্যকে কোন মহামহোপাধ্যায় যে উড়াইয়া দিতে সক্ষম হইবে না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি। বাস্তবিক, আমার হার-জিৎ যাহাই কেন-না হোক, এ-কথাটা কিন্তু নিশ্চয়ই করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, যথার্থ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসার ভার সমাজের কাহাদের হাতে থাকা উচিত। যঁহারা জোর করিয়া এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও করুন। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী দুই দণ্ড আগে বসিবে, কি পরে বসিবে, বিড়াল মারার প্রায়শ্চিত্তে এক কাহন কিংবা পাঁচ কাহন কড়ি প্রশস্ত, মোহান্ত মহারাজেরা বেশা রাখিলে স্বর্গে যায় কিংবা বিবাহ করিলে পতিত হয়, এ-সব মীমাংসা তাঁহারাই করিতে থাকুন, কিছুমাত্র আপত্তি করি না; কিন্তু সমাজের ভালো-মন্দ কিসে হয় না-হয়, কোন্ নিয়ম রাখিলে বা পরিবর্তন করিলে আধুনিক সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে, স্বদেশের কাজে বিলাত গেলে জাতি যাইবে কি যাইবে না, এ-সমস্ত দুর্কহ বিষয়ে তাঁহাদের হাত দিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চা। এ-সমস্ত প্রশ্ন নিষ্পত্তি করার অধিকার দেশের শুধু তাঁহাদেরই জন্মিয়াছে শিক্ষা যঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত করিয়া সার্থক হইয়াছে। স্বর্গীয় বিজ্ঞানাগরের মত যঁহাদিগকে সমাজের ভালো-মন্দ স্থির করিয়া দিতে ভগবান নিজের হাতে গড়িয়া পাঠাইয়াছেন, যঁহাদিগকে দেশের লোক বড় বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এ-সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের ভারও দেশের সেইসমস্ত মহৎ লোকের উপর, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের উপর নহে। কেমন করিয়া জানিবে ইহারা, শাস্ত্র কেন শাস্ত্র? কোন্টা প্রতারণা? কি করিয়া বুঝিবে ইহারা, তখন কি দোষ-গুণ সমাজে বিস্তৃত ছিল, এখন কি দোষ-গুণ আছে? কোন্ টোলে এ আলোচনা

নারীর মূল্য

হয়? কোন্ স্বতিরত্নের এ আলোচনা করিবার ধৈর্য্য এবং সাহস আছে? নিজের দলটি ছাড়া ইহাদের কাছে সবাই ফ্লেচ্ছ, সবাই অশুচি। নিজেদের মতটি ছাড়া সমস্তই অশাস্ত্রীয়! নিজেদের আচার-ব্যবহার ভিন্ন জগতের সমস্ত আচার-ব্যবহারই কদর্য্য এবং হীন! এক কথায় নিজেরা ছাড়া আর কেহ মানুষই নয়। কালের সঙ্গে সঙ্গে যে নিয়মও বদলায়, এ সত্যের ইহারা কোন ধার ধারে না। তাই সময়োপযোগী কোন একটা নূতন পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা হইবামাত্রই ইহারা ভয়ে সারা হইয়া যায়। কঁাদ-কঁাদ হইয়া জানায় শাস্ত্রের শ্লোকে খুঁজিয়া মিলিতেছে না, এবং প্রাণপণে বাধা দিয়া মনে করে দেশের উপকার হইতেছে—শাস্ত্র বজায় হইতেছে।

অথচ ইহারাই কি সমস্ত শাস্ত্র মানিয়া চলে? শাস্ত্রে আছে, রাক্ষস-বিবাহ। শাস্ত্রে আছে, অসুর-বিবাহ। শাস্ত্রে আছে, ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি। আধুনিক সমাজে এইগুলি সুরু হইয়া গেলে ইহারাই কি ভাল মনে করে? অথচ কেন করে না, জিজ্ঞাসা করিলেও ঠিক-মত জবাব দিতে পারে না, তখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানারকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করে, দেশাচার নয়—তেমন আবশ্যকও নয়—ভাল নয়—মানুষের নৈতিক বুদ্ধি অনুমোদন করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এ-কথা শাস্ত্রে থাকে থাক, আর একটা শাস্ত্রের উণ্টা শ্লোকও ত আছে। গান্ধর্ব-বিবাহ, ক্ষেত্রজ সন্তানাদি নিজেদের সংসারে যখন কোনমতেই পছন্দ করি না, তখন আর কেহ করিলেও যত পারিব তত গালি দিব।

‘পছন্দ করি না’ এইটাই আসল কথা। বাস্তবিক কোন শাস্ত্রই পুরুষে অধিক দিন মানিয়া চলে না, যদি না তাহা তাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের সহিত মিশ যায়। মিশ খাইলে তখনই সেটা টিকসই হয়, অথথা স্বয়ং ভগবান রাস্তায় দাঁড়াইয়া নিজের মুখে চোঁচাইয়া বলিয়া গেলেও হয় না। হইতে পারে, অবস্থা-বিশেষে এই শাস্ত্র কাহারও বা দুঃখ উপস্থিত করে, কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার চাপে এ দুঃখ স্থায়ী হইতে ত পায়ই নাই, পরন্তু দুঃখ উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের আকার ধরিয়া পরলোকে শত-শুগল সুখের আশ্বাস দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়া যায়। পুরুষের ক্ষণিক দুঃখ ক্ষণিকেই শেষ হয়, কিন্তু চির-দুঃখ যাহাকে সহিতে হয়, সে নারী।

আমাদের দেশে পূজার্হা নারীর পূজার ব্যবস্থা দেখিয়াছি। তথাপি ইহাকেই আদর্শ বলিয়া যে পুরুষ শ্রাবা বোধ করেন তাঁহাকে আমার কিছুই বলিবার নাই। বিদেশের ব্যবস্থাও দেখিয়াছি, সেখানেও ঐ ব্যাপার। চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার লুপ্ত আইন-কানূনের একটা ধারার সামাজিক ব্যবস্থা লেখা আছে— “if a wife hates her husband and says, ‘thou art not my husband’, into

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

the river they shall throw her." আর একটা ধারায় লেখা আছে, "if a husband says to his wife, 'thou art not my wife,' half a mina of silver he shall weigh out to her and let her go." অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বামীকে পছন্দ না করে, তাহা হইলে তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ কর, আর পুরুষ যদি পছন্দ না করেন তাহা হইলে আধ মিনা ওজনের রূপা দিয়া বিদায় করিয়া দাও। কি স্বপ্ন বিচার! আধ মিনা রূপা কতখানি, অবশ্য সে-কথা বলিতে পারি না, কিন্তু যতই হোক, জলে ডুবাইয়া মারার সঙ্গে এক নিক্তিতে যে ওজন হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি। প্রাচীন বেবিলনে ১৩৭ হইতে ১৪৩ ধারায়ও ঠিক এইমত ব্যবস্থাই আছে, অথচ এই বেবিলন ইহুদীদিগের অপেক্ষা সহস্র-গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। অল্পদিন পূর্বেও ইউরোপের নারী-সম্বন্ধে অনেকেই লিখিয়াছেন, "She was sold into slavery to her husband by her father and was treated with a different legal code from her brother;" "wife of the labourer a chattel of the estate, her life an unceasing drudgery." তবে কোথাও বা বাহিরের চাকচিক্য আছে স্বীকার করি, এবং কোথাও বা ভিতর হইতে সংশোধনের চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সংশোধনের ভার লইয়াছে নারী। পুরুষ উপযাচক হইয়া কোনদিন ভাল করিতে আসে নাই, কোনদিন আসিবেও না। যিনি বড় ভাল, তিনি দয়া করিয়া বই লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন মিল, কনডোরসেট। কিন্তু মুখ্যতঃ তাহা বই লেখার গৌরবের জগুই। প্রাচীনকালে প্লেটোও রিপব্লিকে লিখিয়া গিয়াছেন, "this sex which we keep in obscurity and domestic work, is it not fitted for nobler and more elevated functions? Are there no instances of courage, wisdom, advances in all the arts? May hap these qualities have a certain debility, and are lower than in ourselves, but, does it follow that they are, therefore, useless to the country?" এ লেখার স্বপ্ন বিচার করিতে চাহি না, এবং 'may hap' কথাটারও ব্যাখ্যা করিতে চাহি না; তবে সং অভিনু যে ইহাদের একেবারেই ছিল না, এ-কথা বলিলেও অগ্রায় বলা হইবে, কিন্তু বিশেষ কোন ফলও ইহাতে ফলে নাই—বোধ করি, সত্যকার প্রয়াস ছিল না বলিয়াই।

বই লেখা ছাড়া পুরুষ কোথাও যে যথার্থ সম্মান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অবগত নহি, তবে এ-কথা জানি যে, যদি কোন দেশে রমণী যথার্থ শ্রদ্ধা-সম্মান লাভ

নারীর মূল্য

করিয়া থাকে ত সে শুধু নিজের চেষ্টাতেই লাভ করিয়াছে। প্রাচীন মিশরে এই চেষ্টা একবার হইয়া গিয়াছিল এবং সেই চেষ্টার স্রোত রোম পর্যন্ত আসিয়া আঘাত করিয়াছিল। আমাদের এদেশেও একদিন এ চেষ্টা হইয়াছিল যখন নারী বেদ রচনা করিবারও স্পর্ধা রাখিত। এখন তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহার নাই। যখন নারী পুরুষের মুখের দেবী সম্বোধন শুনিয়া গলিয়া পড়িত না, সে মুখের কথা কাজে পরিণত করিতে বাধ্য করিত, তখন ছিল নারীর মূল্য।

আর এখনকার দিনের একটা দৃষ্টান্ত দিই। একসময় এদেশে যখন বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে বিপক্ষে ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল, সে-সময় ঠাহারা বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে ঠাহারা নানাবিধ সুযুক্তি কুযুক্তির মধ্যে এই একটা অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন যে, অল্পবয়স্ক বিধবাদের পুনর্বিবাহ না হওয়াতেই বঙ্গদেশে কুলত্যাগিনীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বিধবা-বিবাহের অল্পকূলে ইহাও একটা হেতু হওয়া উচিত। মোটের উপর, বিধবা-বিবাহ উচিত, কিংবা উচিত নয়, এ লইয়া উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই চলিতে লাগিল, কিন্তু পুনর্বিবাহ না হওয়ার দরুণই যে বিধবারা কুলত্যাগ করে, এই কথাটা বিধবা-বিবাহের শত্রু-পক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিল না। অর্থাৎ পুরুষমাত্রেই মানিয়া লইল যে, হাঁ, কথা বটে! কুলত্যাগিনীর সংখ্যা যখন বাড়িয়াই চলিতেছে, তখন বিধবা ভিন্ন কে আর কুলত্যাগ করিতে সম্মত হইবে! সুতরাং কিরূপ বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিলে, কিরূপ শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্মচর্চার মধ্যে সত্ত্ব-বিধবাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলে, কিরূপে তাহার নাক চুল কাটিয়া লইয়া বিক্রী করিয়া দিতে পারিলে, এবং কিরূপ খাটুনির মধ্যে ফেলিয়া তাহার অস্থিচর্ম্ম পিষিয়া লইতে পারিলে এই অমঙ্গলের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়েই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। আজও এ মীমাংসার শেষ হয় নাই। এখনও থাকিয়া থাকিয়া মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কি করিলে সত্ত্ব-বিধবাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়, এবং এতদর্থে পিতা-মাতারই বা কর্তব্য কি। বস্তুতঃ স্ক্রু হইতে শেষ পর্যন্ত পুরুষের এই ভয়টাই চোখে পড়ে যে, নারীকে আটকাইয়া রাখিতে না পারিলেই সে বাহির হইবার জন্ত পা তুলিয়া থাকে। কেহ বলিলেন, 'বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যম্', কেহ আর এক ধাপ চড়িয়া বলিলেন, 'অন্ধে স্থিতাপি', কেহ বা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রচার করিলেন, 'দেবা ন জানন্তি'। বলা বাহুল্য, ইহাতে পূজার্হা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই। এবং পুরুষের কোন্ সংস্কারের উপর যে এতগুলো বিধি-নিষেধ ডাল-পালা ছড়াইয়া বড় হইয়া উঠিতে পারিয়াছে, সে-সম্বন্ধেও বোধ করি দুই মত নাই।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বিধবা-বিবাহ ভাল কিংবা মন্দ, সে তর্ক তুলিব না। কিন্তু এ বিবাহ যদি শুধু এই বলিয়াই উচিত হয় যে, অন্তথা তাহাকে সুপথে রাখা শক্ত হইবে, তাহা হইলে আমি বলি, বিধবা-বিবাহ না হওয়াই উচিত।

কিন্তু কথাটা কি সত্য? পুরুষ নির্বিচারে মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিয়াছে কি, বিধবা বাহিরে আসিবার জন্ত নিশিদিন উত্তত হইয়াই থাকে কি না? কথাটা প্রচার করিবার সময়, বিশ্বাস বন্ধমূল করিয়া লইবার সময়, একবারও সে মনে করিয়াছে কি, কি গভীর কলঙ্কের ছাপ সে নারীদের উপর বিনা দোষে ঢালিয়া দিতেছে? বিলাতের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছিলেন, দাস-ব্যবসায় যেমন 'sum of all villainy', বেষ্টারুত্তি তেমনি 'sum of all degradation'. আমি বিদেশের কথা বলিলাম, কারণ দেশের কথা তুলিতে সাহস হয় না। দেবতাদের মত এ-দেশের স্বর্গেও এঁরা থাকেন, এবং রাগ করিয়া শাপ-সম্পাত করিলে মুনি-ঋষিদের চেয়ে বড় কম ফলে না। যাই হোক, বিদেশীর কথায়, এই এতবড় হীনতার মধ্যে ডুব দিয়া পড়িবার জন্তই কি নারী অহরহ উন্মুখ হইয়া থাকে? এবং এতবড় পাশবিকতাই কি নারীর স্বাভাবিক চরিত্র? পুরুষ তাহার গায়ের জোর লইয়া বলিবে, হাঁ। নারী তাহার সঙ্কীর্ণ অভিমান লইয়া বলিবে, না। বাস্তবিক, যাচাই না করিয়া শুধু একটা কাল্পনিক উত্তর দিবার চেষ্টা করিলে তর্কই চলিতে থাকিবে। কিন্তু যাচাই করিয়া দেখিলে কি জবাব পাওয়া যায় তাহাই দেখাইতেছি। বারো-তের বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলার বহুসংখ্য হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ লিপিবদ্ধ ছিল। বইখানি গৃহদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে—বোধ করি, ভালই হইয়াছে—সুতরাং কেহ সঠিক প্রমাণ চাহিলে দিতে পারিব না সত্য, কিন্তু ইহার আগাগোড়া কাহিনীই আমার মনে আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে, এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তরজন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা। ইহাদের প্রায় সকলেরই হেতু লেখা ছিল, অত্যধিক দারিদ্র্য ও স্বামী প্রভৃতির অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়ন। সধবাদিগের প্রায় সবগুলিই নীচজাতীয়া এবং বিধবাদিগের প্রায় সবগুলিই উচ্চজাতীয়া। নীচজাতীয়া সধবারা 'এই বলিয়া জবাবদিহি করিয়াছিল যে, ধাইতে-পরিতে তাহারা পাইত না,—দিনে উপবাস করিত, রাত্রে স্বামীর মায়াধোর ধাইত। সং-কুলের বিধবারাও কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, কেহ-বা ভাই ও ভ্রাতৃজায়ার, কেহ-বা খণ্ডর-ভাস্করের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। ইহাদের সকল কথাই যে সত্য তাহা নয়,

নারীর মূল্য

তথাপি সমস্ত ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই চোখে পড়ে ;
এমনিই বটে !

ভদ্র-কুলের বিধবারা স্বামীর অবর্তমানে যেমন নিরুপায়, নীচজাতীয়া সধবারা স্বামী বর্তমানে ঠিক তেমনি নিরুপায়। কিন্তু তাহাদের বিধবার অবস্থা ভাল। কারণ, নীচ-ঘরের স্ত্রীলোকেরা বিধবা হইলে আর বড় কাহাকেও মিথ্যা ভয় করিয়া চলে না—অনেকটা স্বাধীন। তাহারা হাটে-বাজারে যায়, পরিশ্রম করে, ধান ভানে, প্রয়োজন হইলে দাঁসীবৃত্তি করে। সুতরাং, সৎ উপায়ে জীবিকানির্ভাহ করা তাহাদের পক্ষে সহজ,—তাহারা তাই করে, কুলত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না, করেও না। অথচ তাহাদের সধবার পক্ষে সে পথ বন্ধ। স্বামী বিত্তমানে, সে না পায় দুঃখ-মেহনত করিতে, না পায় খাইতে পরিতে। স্বামী ভাত-কাপড় যোগাইতে পারে না, যাহা পারে তাহা শুধু মার-ধোর করিয়া শাসন করিতে। ঐ যে কথা আছে, “ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, কিল মারবার গৌসাই” কথাটা বাঙলার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে কতদূর সত্য, এবং কতবড় দুঃখেই যে ছড়াটার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আবার ভদ্র-ঘরের বিধবার অবস্থা ঠিক নীচজাতীয়া সধবার অমুরূপ। তাহাকেও স্বাধীনভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে দেওয়া হয় না, কারণ তাহাতে পিতৃকুলের বা স্বশুরকুলের মর্যাদা-হানি হয়, অথচ বাড়ির মধ্যে ভদ্র-বিধবার অবস্থা কাহারো অবিদিত নাই। আমিও ইতিপূর্বে তাহা একাধিকবার বলিয়াছি। অতএব দেখিতে পাওয়া যায়, শতকরা সত্তরজন হতভাগিনী অন্ন-বস্ত্রের অভাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের অনাদর, উপেক্ষা, উৎপীড়নেই গৃহত্যাগ করে, কামের পীড়নে করে না। এবং এইজন্যই কুলত্যাগিনীদের মধ্যে বিধবা অপেক্ষা সধবার সংখ্যাই অধিক। অথচ কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়াই পুরুষ ধরিয়া লইয়াছে, কুলত্যাগ শুধু বিধবাতেই করে, অতএব অদ্ভুত বিধিনিষেধের দ্বারা তাহাকে শাসন করাই ঠিক কাজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলত্যাগ যে পতিবৃদ্ধারাই অধিক করে, এবং তাহা পুরুষেরই অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে, এ-কথা কোন্ পুরুষ স্বীকার করিতে সক্ষম হইবে? একদিকে পুরুষ যেমন দরিদ্র ও কহনাতীত উৎপীড়নে নারীর স্বাভাবিক গুণবুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, অন্যদিকে তেমনি তাহাকেই আপাতমধুর স্বথের প্রলোভনে প্রতারিত করিয়া ঘরের বাহির করিয়া আনে। পুরুষের ভয় নাই, সে যদিচ্ছা স্বথ ভোগ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে। তাই সে ফিরিয়া গিয়া দিন-দুই ঘরের কোণে অমৃতপ্তভাবে বসিয়া থাকে, আত্মীয়-স্বজন তাহার পুনরাগমনে খুশি হইয়া সাহস দিয়া বলিতে

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

থাকে, “তার আর কি! ও অমন হইয়া থাকে,—পুরুষের দোষ নেহ। এম বাহিরে এস।” সেও তখন হাসিমুখে বাহির হয় এবং গলা বড় করিয়া প্রচার করিতে থাকে, নারীর পদস্থলন কিছুতেই মার্জনা করা যাইতে পারে না।

ঠিক ত! যে কারণেই হোক, যে নারী একটিবার মাত্রও ভুল করিয়াছে, হিন্দু তাহার সহিত কোন সংশ্রব রাখে না। ক্রমশঃ ভুল যখন তাহার জীবনে পাপে স্প্রতিষ্ঠিত হয়, দিন দিন করিয়া যখন তাহার সমস্ত নারীত্ব নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যায়—যখন সে বেগা—তখন, আবার তাহার অভাবে হিন্দুর স্বর্গও সর্বাদসুন্দর হয় না। এতই তাহার প্রয়োজন। দেশের লোক আদর করিয়া যেন শ্রীকৃষ্ণের ‘কালো সোনা’, ‘কালো মাণিক’ প্রভৃতি অষ্টোত্তর-শতনাম দিয়াছিল, সংস্কৃত-সাহিত্যেও বোধ করি বেগার আদরের নাম তার চেয়ে কম নয়। এইসকল হইতেই বুঝিতে পারা যায়, স্বার্থপরতা ও চরিত্রগত পাপ-বুদ্ধি নর-নারী কাহার অধিক। এবং সমাজ হইতে এই পাপ বহিস্কৃত করিতে হইলে শাস্ত্রের কড়া আইন-কানুন কাহার সম্বন্ধে অধিক থাকা উচিত, এবং সামাজিক জীবন বিগুহ্ন রাখা উদ্দেশ্য হইলে নর-নারীর কাহাকে অধিক চোখে চোখে রাখা কর্তব্য, এবং শাস্তি কাহাকে অধিক দেওয়া আবশ্যিক। অথচ, সমাজ নারীর ভুল-ভ্রান্তি এক পাইও ক্ষমা করিবে না, পুরুষের ষোল-আনাই ক্ষমা করিবে। হেতু? হেতু শুধু গায়ের জোর। হেতু শুধু সমাজ অর্থে ‘পুরুষ’, ‘নারী’ নয় বলিয়া। কাজটা ঘণার কাজ, তাই পুরুষ নারীকে ঘণা করে। তাহাকে ঘণা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু নারীকে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। পুরুষ যতই ঘণ্য হউক, সে স্বামী! স্বামীকে ঘণা করিবে স্ত্রী কি করিয়া? শাস্ত্র যে বলিতেছেন, তিনি যেমনই হউন না, সতী স্ত্রীর তিনি দেবতা। এবং এই দেবতাটির মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পদপঙ্কজ ক্রোড়ে করিয়া অনুগমন করা আবশ্যিক। অন্ততঃ এ-যুগে তাঁহারই পদপঙ্কজ স্মরণ করিয়া জীবন্ত হইয়া থাকাতেই যথার্থ নারীত্ব।

কেহ কেহ বৈজ্ঞানিক তর্কের অবতারণা করিয়া বলেন, ভবিষ্যৎ বংশধরের ভালো-মন্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে নারীর ভুল-ভ্রান্তিতেই ক্ষতি হয়, পুরুষের হয় না। অথচ চিকিৎসকেরাই বিদিত আছেন, কত কুলস্ত্রীকেই না অসতীর পাপ ও কুৎসিত ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং কত শিশুকেই না চিররুগ্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং সারা-জীবন ধরিয়া পিতৃ-পিতামহের দুঃস্বপ্নের প্রায়শ্চিত্ত করিতে থাকে। অথচ, শাস্ত্র এ-সম্বন্ধে অস্পষ্ট, লোকাচার নির্বাক, সমাজ মৌন। তাহার প্রধান কারণ এই যে, শাস্ত্র-বাক্যগুলি সমস্তই প্রায় ফাঁকা আওয়াজ। পুরুষের ইচ্ছা এবং

নারীর মূল্য

অতিরিক্তই আসল কথা এবং তাহাই সমাজের যথার্থ সুনীতি। মনু, পরাশর, হারীত, মিথ্যাই ইহাদের দোহাই পাড়া। এই যে পুরুষ চোখের উপরেই অস্তায় অধর্ম করিবে, অথচ সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহার স্ত্রী কথাটি মাত্র বলিতে পারিবে না (শাস্ত্র-বাক্য!), এমন কি, তাহার বীভৎস জঘন্য ব্যাধিগুণা পর্যন্ত জানিয়া শুনিয়া নিজ দেহে সংক্রমিত করিয়া লইতে হইবে, এর চেয়ে নারীর অগৌরবের কথা আর কি হইতে পারে?

তথাপি অন্যান্য দেশে আছে, divorce—তথাকার রমণীর কতকটা উপায় আছে, কিন্তু আমাদের এই যে স্বয়ং-ভগবানের দেশ, যে-দেশের শাস্ত্রের মত শাস্ত্র নাই, ধর্মের মত ধর্ম নাই, যেখানে জন্মাইতে না পারিলে মাহুষ মাহুষই হয় না, সে-দেশের নারীর জন্য এতটুকু পথ উন্মুক্ত রাখা হয় নাই। এ-দেশের পুরুষ রমণীকে হাত-পা বাঁধিয়া ঠেঙ্গায়, সে বেচারী নড়িতে চড়িতে পারে না। তাই পুরুষ বাহিরে আশ্ফালন করিয়া বলিতে পায়, এ-দেশের নারীর মত সহিষ্ণু জীব জগতের আর কোথায় আছে?

নাই, তাই মানি। কিন্তু যেজন্য নাই সে কারণটা কি পুরুষের বড়াই করিবার মত? বিদেশের সংবাদ-পত্রে যেই খবর বাহির হয়, অমুক অমুকের সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছেদ করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, স্বদেশী কাগজওয়ালার তখন আর আহ্লাদ ধরে না—চোঁচাইয়া সে গাঁ ফাটাইতে থাকে, দেখ, চেয়ে দেখ, বিলাতী সভ্যতা!

তাহাদের মনের ভাব এই যে, পরের দোষগুণা প্রচার করিতে পারিলেই নিজেদের গুণগুণা মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। Divorce জিনিসটা যে বাহনীয় নয়, সে-কথা তাহারাও বোঝে, কিন্তু মার খাইয়া তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—মারামারি করে। মারামারি জিনিসটা, নিঃশব্দে হইবার বস্তু নয়, তাই সে-কথা বাহিরের লোকে শোনে, এবং তাই শত্রুপক্ষ দাত বাহির করিয়া হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিবার অবকাশ পায়। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে-কারণে ও-অঞ্চলে এ মোকদ্দমা রুজু হয়, সে-কারণ কি হিন্দুর ঘরে ঘটে না? আমার বিশ্বাস, যে অতি বড় নির্লজ্জ, সেও বোধ করি না বলিবে না। যদি তাই হয়, তবে আহ্লাদ করিবার হেতু কোন্‌খানে থাকে? মোকদ্দমাই কি আসল বস্তু, কারণটা কিছু নয়? ও-দেশেও এক সময় divorce ছিল না, কিন্তু মধ্য-যুগের অকথ্য হীনতার মধ্যে পড়িয়াই একসময় তাহাদের চৈতন্য হইয়াছিল। Church's irrational rigidity as regards divorce tended to foster

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

disorder and shame. Sexual disorder increased. Woman became cheaper in the esteem of men, and the narrowing of her interest to domestic work the desire to please men proceeded apace. শাস্ত্রের এই গৌড়ামি নারীজাতিকে যে কত দুঃখে কত নীচে নামাইয়া আনিয়াছিল, আচার্য K. Pearson তাঁহার Ethic of Free Thought গ্রন্থে অনেক রকমে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন—নারী মাত্রকেই একবার তাহা পড়িতে অস্বরোধ করি।

কিন্তু তাই বলিয়া আমাকে যেন এমন ভুল না বুঝা হয় যে, আমি divorce বস্তুটাকেই ভাল বলিতেছি। মারাত্মক জিনিসটাও ভাল জিনিস নয়, সমাজের মধ্যে ওটা ঘটতে থাকে এ কামনা কেহ করে না, কিন্তু স্ত্রী-ত্যাগ বলিয়া একটা ব্যাপার যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন উভয় পক্ষেই ও জিনিসটা কেন থাকা উচিত নয়, তাহা বলিতে পারি না।

অবশ্য পুরুষ এ-কথা কিছুতেই মানিবে না যে, তাহার মত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাহার স্ত্রীরও থাকে। কিন্তু কেন থাকিবে না, কেন অন্যান্য দেশের নারীর মত এই শ্রাব্য অধিকার তাহাকে দেওয়া হইবে না, ইহারও সে কোন সঙ্গত কারণ নির্দেশ করিতে পারিবে না, শুধু জলিয়া উঠিয়া জবাব দিবে, “দূর,—এও কি একটা কথা!”

এটা কথা নয়, কারণ তাহার অপরাধ করিবার অবাধ স্বাধীনতা থক্ক হয় ইহা সে চাহে না। বিশেষ করিয়া এ-দেশের পুরুষ, যে নিজে কাপুরুষ, ভীক,—অন্যান্য দেশের পুরুষের তুলনায় যে নারীর মতই নিরুপায়, যে নারীর কাছে পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যথার্থ ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, সে কাপুরুষের মত তাহার অপেক্ষা দুর্বল ও নিরুপায়কেই পীড়ন করিয়া কর্তৃত্ব করার আনন্দ উপলব্ধি করিতে চাহিবে, তাহা স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার নহে। সে যে মরিয়া গেলেও স্বেচ্ছায় এ অধিকারের এক পাইও ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না, তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। সে যে শাস্ত্র আওড়াইবে, বিজ্ঞানের দোহাই পড়িবে, সুনীতির ছদ্ম অভিনয় করিবে, তাহাও জানা কথা। কিন্তু নারীরও বুঝিয়া দেখার সময় হইয়াছে। যে পুরুষ স্ত্রীকে পথে রক্ষা করিতে পারিবে না জানিয়াই শাস্ত্র বানাইয়াছে, ‘পথি নারী বিবর্জিতা’, তাহার শাস্ত্রের ততটুকু মূল্যই দেওয়া উচিত এবং ইহাই স্মবিচার।

আমার মনে হইতেছে, আমার কথাগুলো পুরুষদিগের ভাল লাগিতেছে না, এবং অন্তঃপুরেও এগুলো পৌঁছায় ইহাও তাহাদিগের ইচ্ছা হইতেছে না। কিন্তু

নারীর মূল্য

যেদেশে অর্ধশূন্য অত্যাচার-অবিচারের একটা সীমা পর্যন্ত নাই, সেদেশে কোন-না-কোনদিন নারী কারণ জানিতে চাহিবেই, পুরুষ তাহা পছন্দ করুক, আর নাই করুক। ফ্রান্সের নেপোলিয়নও একদিন ম্যাডাম কন্ডোর্সেটকে বলিয়াছিলেন, I do not like woman to meddle with politics. তাহাতে ম্যাডামও জবাব দিয়াছিলেন, You are right General, but in a country where it is the custom to cut off the heads of women, it is natural that they should wish to know the reason, why.

মানুষ যখন মানুষ হইয়া উঠে নাই, তাহার পূর্বেও সে যে কার্য-কারণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের আভাস পাইয়াছিল, আজকাল পণ্ডিতেরা তাহা আর অস্বীকার করেন না। সে যখন শামুক ছিল, তখনই অকস্মাৎ মেঘের ছায়ায় সূর্যের আলো মলিন দেখিয়া ভয়ে মুখ বুজিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল,—সে টের পাইয়াছিল ছায়া শুধু ছায়া নয়, তার সঙ্গে আর কিছু একটা আসিতেছে। যে আসিতেছে সে প্রবল, সে সন্নিকটবর্তী, হয়ত অপকার করিবে এই তার ভয়। ছায়ার কারণ দেখিয়া সে কার্য অসম্মান করিয়াই দুর্গদ্বার আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই জীবের ক্রমোন্নতি-ব্যাপার জগতে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরে মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যতগুলি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই একটা কথা পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে যে, মানুষের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ঠিক তাহার শরীরের মত ধীরে ধীরে উন্নত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ পশু অপেক্ষা যদিচ সব বিষয়ে মানুষ খুবই বড় হইয়াছে, তবুও একটা সম্পর্কের টান যে রহিয়াই গিয়াছে তাহাকে কোনমতেই না করিবার পথ নাই। এই পার্থক্য পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নহে। সেই সত্যটা বুঝিয়া লইয়া যদি সন্ধান করা যায়, যাহাকে আমরা পশু বলি তাহাদের মধ্যে নারীর মূল্য আছে কি না? দেখা যায় আছে। ছোটো সিংহ প্রাণান্তকর যুদ্ধ করিতে থাকে, সিংহীটা চুপ করিয়া লড়াই দেখে। যে জয়ী হয়, ধীরে ধীরে তাহার সহিত প্রস্থান করে, একবার ফিরিয়াও চাহে না অপরটা মরিল কি বাঁচিল। অতঃপর এই সিংহমিথুন কিছুকাল একসঙ্গে বাস করে, তার পর সিংহী যখন আসন্নপ্রসবা তখন ইহারা পৃথক হয়—সন্তান লালন-পালন ও রক্ষা করার ভার একা জননীর উপরই পড়ে। সিংহ মহাশয় সন্তানের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন না, বরঞ্চ সুবিধা পাইলে সংহার করিবার চেষ্টাতে ফিরিতে থাকেন। বাঁদর ও গোরিলার মধ্যেও প্রায় অসুস্থ প্রথা দেখা যায়। ইহাতে লাভ এই হয় যে, এমন জাতি ধ্বংসের মুখেই অগ্রসর হইতে থাকে। ইতিমধ্যে অসুস্থ কারণ না থাকিলে, গহন-বনে বা অতি নিহৃত

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

পৰ্বত-বন্দরে সন্ততি-রক্ষার আশ্রয় না মিলিলে আমরা বোধ করি এই পশুগুলোর নাম পর্য্যন্তও জানিতে পারিতাম না। তাহারা বহু পূর্বেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। এই ঘটনাটা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই একটা আশ্চর্য্য আত্মঘাতী ব্যাপার চোখে পড়ে। এই পশু বংশবৃদ্ধির নৈসর্গিক তৃষ্ণা ও উত্তেজনার বশে লড়াই করিয়া প্রাণ দেয়, অথচ ইহারই শেষ সফলতার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখে না। তা ছাড়া আরো একটা কথা এই, যে জন্তুটা প্রাণ দেয়, সে নিজের অসহ প্রবৃত্তির যুপকার্ঠেই কঠচ্ছেদ করে, নারীর জন্তু নারীর পদমূলে আত্মবিসর্জন করে না। অতএব মূল্য যদি এখানে কিছু থাকে ত সে তাহার নিজের প্রবৃত্তির, নারীর নয়। এই দুটো কথা মনে রাখিয়া পশুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া মানুষের রাজ্যে পদার্পণ করিয়াও এই ব্যাপারের অসম্ভাব ঘটে না, এবং আজ এই পাশব প্রবৃত্তিকে নিজেদের সমাজে যত ইচ্ছা বড় বলা হউক না কেন, এবং নর-নারীর স্বর্গীয় প্রেমের জন্মভূমি যতবড় স্বর্গেই নির্দেশ করা থাক না কেন, তাহা সত্য নয়, নিছক কল্পনা মাত্র। আমি গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই বলিতেছি। কিন্তু বলিবার পূর্বে এ-কথাটাও বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখি যে, ক্রমোন্নতির ফলে নর-নারীর সহস্রমুখী স্নেহ-প্রেমের যে মধুর চিত্র বাস্মীকির হৃদয়ে, ব্যাসের হৃদয়ে, কালিদাসের হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বজগতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। নীচ-কূলে জন্ম বলিয়া আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। কোহিনুরকে পাথুরে কয়লার খোঁটা দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকে ভূতের ভয়ের লজ্জা দিয়া তাহার যথার্থ মূল্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা কিছুতেই চলে না। এ-সকল আমি জানি। এবং জানি বলিয়াই ইহার জন্মের কথা তুলিয়াছি, এবং ধীরে ধীরে এই মূল্য যে আজ যথার্থ কতবড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা মানবের আদিম-যুগের ইতিহাসের দিকে চাহিয়া পরিমাণ করিতে আহ্বান করিতেছি। কি করিয়া পাশব বৃত্তি অদ্ভুত অনির্করণীয় প্রেমে, পাতিব্রত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে, কি করিয়া নরের প্রবৃত্তির মানদণ্ডে প্রথম পরিমিত নারীর মূল্য একদিন ভাবুকের হৃদয়ে অপরিমেয় দেবতার মূল্যে এক আসন পাতিয়াছে এবং সেই তাহার যথার্থ স্থান কি না, তাহা দেখিতে গেলে সাহসপূর্ব্বক গোড়া হইতে দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। চোখ বুজিয়া যাহা অভিরুচি হয় বলিব, যাহা খুশি শাস্ত্র বানাইব, যথা ইচ্ছা দাম দিব, এই শুধু বলবানের গায়ের জোরে করা যায়, সত্যের জোরে, সত্যের জোরে করা যায় না। মূল্যের একটা নৈসর্গিক নিয়ম আছে, সেও যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিতীয় ও একমাত্র নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, কৃত্রিম উপায়ে তাহাকে

নারীর মূল্য

বাড়াইলে কমাইলে শেষ পর্যন্ত যে সফল ফলে না, সেন-রাজার কৃত্রিম কুলীন-করা বামুনের দাম যে ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে নাই, পেরুর ইন্কার জোর-করা আভিজাত্য যে তাহাকে ধ্বংস না করিয়া ছাড়ে নাই, এই সত্য বে-কেহ লোক বা যে-কোন জাতি আলস্য অজ্ঞান বা দস্তুর জোরে অস্বীকার করিবে, সে-ই যে কক্ষভ্রষ্ট উপগ্রহের মত অনিবার্য মৃত্যুর পথেই দিন দিন ধাবিত হইবে, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই।

এই সত্য স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় জগতের আদিম মানবজাতির রীতি-নীতির দিকে চাহিয়া দেখিলে। ইতিপূর্বে আমি মুখ্যতঃ সভ্য-জাতির সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি, তাহারা নারীর মূল্য কোথায় ধার্য করিয়াছে, তাহাই নিরূপণ করিবার প্রয়াস করিয়াছি; এইবার দেখিতে চাহি, যে মানুষ এখনও সূসভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহারা নারীর মূল্য কি দিয়াছে।

মূল্য কি করিয়া দেওয়া যায়? আমেরিকার অসভ্য চিপিয়ানদের সম্বন্ধে হারবার্ট স্পেন্সর লিখিয়াছেন, "men wrestle for any woman to whom they were attached." বেশ কথা। আবার ইহাদের সম্বন্ধেই হার্ন সাহেব শত বৎসর পূর্বে উত্তর-মহাসমুদ্র ভ্রমণ-কাহিনীর একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, ইহারা নিজের জননীকে (বিমাতা নয়) স্নন্দরী বিবেচনা করিলে পিতার নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করে। এবং ইহাদের সম্বন্ধেই হারবার্ট স্পেন্সরের (Descriptive Sociology) সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে একস্থানে লেখা আছে, "in the Chipewayan tribes divorce consists of neither more nor less than a good drubbing and turning the woman out of doors." অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা 'fight with spears for possession of a woman.' আমেরিকার ডগ্‌রিব জাতিরা 'fight just like stags.' আমেরিকার মন্ত্র জাতিরা 'fight like natural enemies.' অথচ ডগ্‌রিব জাতিরা স্ত্রীকে 'use like beast of burden'; এবং এক একজন মন্ত্র জীবনে ৪০।৫০বার বিবাহ করে। অতএব দেখা যায়, এই অসভ্যদিগের স্ত্রী-লাভের যুদ্ধ ও বন্ড পশুর নৈসর্গিক প্রবৃত্তি, ত্যাগ করার প্রয়োজনও ঠিক তাহাই। নারীর মূল্য এখানে এক কাণাকড়িও নাই। নারীও তেমনি। স্বামী যুদ্ধে শেলবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইবামাত্রই তাহার পতিব্রতা স্ত্রী নিজের জিনিস-পত্র মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে বিজেতার অহুসরণ করে। এখানে বন্ড পশুর মত নর-নারীর বিশেষ কোন সম্পর্কও নাই। উদালক-পুত্র খেতকেতু যখন নিজের জননীকে অপরিচিত ব্রাহ্মণের দ্বারা বলপূর্বক আকর্ষিত হইতে দেখিয়া পিতাকে প্রণয় করিয়াছিল যে, মাকে কোথায় লইয়া বাইতেছে? ইহাও সমাজের সেই অবস্থা।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এই অবস্থায় স্ত্রীলোক-মাত্রেই পুরুষের সম্পত্তি—যে যতক্ষণ জোর করিয়া দখল রাখিতে পারে ততক্ষণই, আবার ভাল না লাগিলে ছাড়িয়া দেয়—ভাবটা, যাও, চরিয়া খাও। ইহার পরের অবস্থা পলিনেসিয়া, নিউ ক্যালিডোনিয়া এবং ফিজি দ্বীপের অসভ্যদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। স্ত্রী-লাভের জন্য ইহারা লড়াই করে, এবং নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়াও যাহাকে পছন্দ হয় তাহাকে ধরে আনে। কিন্তু পছন্দ গত হইবার পরে, অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হইলে আর তাড়াইয়া দেয় না—এডমিরাল ফিজরয়, হম্বোর্ট, উইঙ্কেস প্রভৃতি অনেকেই বলিয়াছেন, মারিয়া খাইয়া ফেলে। যাক, ইহাকে নিতান্ত মন্দ ব্যবস্থা বলা যায় না। তাহার পরের অবস্থা যখন হইতে স্ত্রীলোক সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—Spencer সাহেবের Principles of Sociology হইতে তুলিয়া দিতেছি—a Chippewayan chief said to Hearne, “women were made for labour, one of them can carry, or haul as much as two men can do.” ঐ গ্রন্থে ব্যারো সাহেবের Interior of Southern Africa হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, “the woman is her husband’s ox as a kaffir once said to me—she has been bought, he argued, and must therefore labour.” স্কটার সাহেব লিখিয়াছেন, “a kaffir who kills his wife can defend himself by saying I have bought her once for all.” একটু সামান্য উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় অসভ্য মাপুচি জাতির মধ্যে, “a Mapuchi widow by the death of her husband becomes her own mistress unless he may have left grown-up sons by another wife, in which case she becomes their common concubine, being regarded as a chattel naturally belonging to the heirs of the estate.” জগতের অধিকাংশ স্থানে ইহাই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অবস্থা। Old Testament-এর লেভির চিনাদের বিধবা পুত্রবধূকে অপরের কাছে বিক্রয় করা, (কন্টার পিতা বিক্রয়লব্ধ মূল্য ফিরাইয়া দিতে অক্ষম হইলে) হিন্দুর বিধবা পুত্রবধুর উপর স্বশুরকুলের সম্পূর্ণ অধিকার, ইত্যাদি সম্পত্তিবাচক। Vera Paz-এর আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে ইনিই লিখিয়াছেন, “the brother of the deceased at once took her (the widow) as his wife even if he was married and if he did not, another relation had a right to her.” অর্থাৎ সম্পত্তি কিছুতেই বেহাত হইতে পায় না। সংসারে শতকরা নব্বইটা জাতির সম্বন্ধে কম-বেশি এই উক্তি বর্ণে বর্ণে প্রয়োগ করা যায়। আমেরিকার বোষ্টন

নারীর মূল্য

সহরের মত স্থানেও ১৮৫০ অব্দ পর্যন্ত নারীর স্থান কোথায় ছিল, History of Women's Suffrage হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ; উক্ত গ্রন্থে নারী বিবাহ করিবার পূর্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি ভাবী স্বামীকে লিখিয়া দিবার পরেও 'she was not a person', 'not recognised as a citizen', 'was little better than a domestic servant'. "By the English common law her husband was her lord and master," "he could punish her with a stick," "the common law of the state of Massachusetts held man and wife to be one person, but that person was the husband," "she had no personal rights and could hardly call her soul her own". অথচ আমেরিকার নারীজাতির আশ্চর্য স্বাধীনতার কথা কতই না শোনা যায়। সেদেশেও এদেশের মত লাঠিবাজি ছিল এবং নালিশ করিয়াও প্রতিকার হইত না।

এইখানে একটা প্রশ্ন মনে উঠে ; সংসারে মানবজাতির কোন্ অবস্থায় নারীর উপর প্রথম নির্যাতন শুরু হইয়াছিল ? মানুষ যখন পশুর মত ছিল,—তখন হইতে, না কতক মানুষের মত হইবার পর হইতে ? এ-সম্বন্ধে কোন সমাজতত্ত্ববিদই ঠিক কিছু বলিতে পারে না। পারিবার কথাও নয়। কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যেই, তিনি সুসভ্যই হোন, আর অসভ্যই হোন, নর-নারীর সম্বন্ধটা এতই জটিল, এতই রহস্যে ঢাকা যে, বাহিরের লোকের বাহির হইতে দেখিয়া কিছুতেই তাহা ঠিক করিয়া বলিবার যো নাই। লেটুর যখন প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সমস্ত অসভ্যরাই নারীজাতিকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেয়, তখন তিনি নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছিলেন, এবং তখন অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি অনেক পণ্ডিতই তাহাতে ধীরে ধীরে আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। বস্তুতঃ, নর-নারীর সম্বন্ধটা কিছুতেই এমন হইতে পারে না যাহাতে extreme and unmitigated oppression, constantly subjected to unimaginable cruelty and violence by the savage খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়। এমন হইলে সংসারে মানবজাতিই লোপ পাইত। এই সত্যটা সমস্ত আলোচনার মধ্যে মনে করিয়া না রাখিলেই ভুল হইবে। তবে তাঁহারও কথাটা যে বারো-আনা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরন্ত, Haddon সাহেব যে জোর করিয়া তাঁহার Head Hunters গ্রন্থে বলিয়াছেন, by no means down-trodden or ill-used, সে-কথাটাও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। যদিও তাঁহার এই কথাটার অল্পকূলে কয়েকটা অসভ্য জাতির মধ্যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা, ভারতের খাসিয়া রঙ্গীরা

বিরক্ত হইলে স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নিকারাগুয়া ও টাহিটির স্ত্রীলোকেরাও স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় বিবাহ করে। আপাচ জাতির লড়াইয়ে হারিয়া আসিলে স্ত্রীরা স্বামীদের ঘরে ঢুকিতে দেয় না। ডায়োক যুবকেরা এবং আমাজনের পাশীরা যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পায় না। নর-মাংসাহারী কারিব-জাতির পুরুষ মারিয়া খাইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মাংস খাইতে পায় না। আরবদেশে শেখেরা স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীব্র চাবুকের আঘাত দাঁত বাহির করিয়া সহ্য করিতে না পারিলে যুবতীর হৃদয় অধিকার করিতে পারে না, এবং আরো কয়েকটা জাতির মধ্যে, যথা, সুমাত্রা-দ্বীপের বাটা প্রদেশে, আফ্রিকার সূবর্ণ উপকূলের নিগ্রোদের মধ্যে, আমেরিকার পেরুর অসভ্য জাতির মধ্যে এবং আরও কয়েকটা আদিম জাতির মধ্যে, বোধ করি আমাদের দেশের টোডাদের মধ্যেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার রমণীর দিক দিয়াই হয়, পুরুষের দিক দিয়া হয় না। এ-সকল উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও রমণীরা চিরদিন যে নিপীড়িত হইয়াই আসিতেছে, তাহা সহস্র প্রকারের উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায়। রমণীরা যে সম্পত্তির মধ্যেই পরিগণিত হইত, তাহা ইতিপূর্বে অনেক প্রকারে বলিয়াছি, এবং এইজন্যই সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারীর দিক দিয়াই আসিয়াছিল। একটা স্ত্রীকে লইয়া চার-পাঁচবারেরও অধিক কাড়াকাড়ি হইয়া যাইত, সুতরাং তাহার গর্ভের সম্ভান যে কোন্ বংশের তাহা স্থির করিবার উপায় ছিল না; এই হেতুই নিজের স্ত্রীর সম্ভান বিষয় পাইত না, বিষয় পাইত ভগিনীর সম্ভান। তাহাকে লইয়াও যে কাড়াকাড়ি হইত না তাহা নহে, কিন্তু হাজার কাড়াকাড়ি হইয়া গেলেও ভগিনীটি যে অন্ততঃ নিজের বংশের এবং তাহার গর্ভের সম্ভান যে কতকটা নিজের বংশেরই হইবে সে-বিষয়ে তাহারা নিঃসন্দেহ ছিল। এই হেতু ভাগিনেয় বিষয় পাইত, পুত্র পাইত না। বিষয় যেই পাক, উত্তরাধিকার স্থির করিত পুরুষেরা, নারীর তাহাতে কিছুমাত্র হাত ছিল না। মানুষের বুদ্ধির তারতম্য-হিসাবে ছাগলের গলা ডান দিক ঘেঁসিয়াই কাটা হোক, কিংবা বাঁ দিক ঘেঁসিয়াই হোক, ছাগলের ভালো-মন্দ তাহাতে নির্দিষ্ট হয় না। বোধ করি এই কারণেই টাইলার সাহেব সূবর্ণ উপকূলের নিগ্রোদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন যে, বাহির হইতে নারীর অবস্থা 'officially superior' দেখাইলেও 'practically vary inferior.' আমার মনে হয়, সব জাতির মধ্যেই এই ইঙ্গিত খাটে। Crawley সাহেব সম্প্রতি তাঁহার Mystic Rose গ্রন্থে নারীর উন্নত অবস্থা সম্বন্ধে গাপুয়ানদের কথা তুলিয়া এই যে একটা তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন যে, ইহাদের নারী-নির্যাতন করা সম্বন্ধে যথেষ্ট দুর্নাম থাকিলেও, এই যে একটা প্রথা

নারীর মূল্য -

আছে, নারীরাই স্বামী মনোনীত করে এবং বিবাহের প্রস্তাব তাহারা করিতে পারে, পুরুষে পারে না, এই প্রথাটাই তাহাদিগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত করিয়া রাখিয়াছে। কথাটা বাহির হইতে মন্দ না শুনাইলেও বিপক্ষে বলিবারও বিস্তর আছে। প্রথম এই যে, মনোনীত করে বলিয়াই যে পুরুষের কাছে নিপীড়িত হয় না, তাহার কোন সঙ্গত হেতু নাই। যাহাদের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয়ের কিছুমাত্র ধারণা নাই, যাহারা কথায় কথায় স্ত্রী-হত্যা করে, তাহাদের মধ্যে নারীর এই একটুখানি ক্ষমতা পরিশেষে তাহাদিগের যে বিশেষ কোন কাজে আসে বলিয়া মনে হয় না। রেভারেণ্ড স্মিটার সাহেব বলেন, নারীর অনেকটা মান-মর্যাদা আফ্রিকার কঙ্গো এবং উগাণ্ডা প্রদেশে আছে। বস্তুতঃ সেদেশে রমণী রাণী পর্য্যন্ত হয়। অথচ Captain Speke তাঁহার *Discovery of the Source of the Nile* গ্রন্থে কঙ্গো ও উগাণ্ডা দেশের ওয়াহুমা বড় লোকেরা কি করিয়া কথায় কথায় প্রায় বিনা-অপরাধে স্ত্রী-হত্যা করে, নিজের হাতে আঁকিয়া তাহার ছবি পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছেন; ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হাতে দড়ি বাঁধিয়া স্ত্রীগুলিকে বধ্যভূমিতে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় তাহারা যেভাবে উচ্চৈশ্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে যায়, শুনিলে অতি বড় পিশাচেরও দয়া হয়, অথচ সেদেশের পুরুষগুলি তাহাতে ক্রক্ষেপ করে না। গ্রন্থকারের তাঁবুর পার্শ্বের পথের উপর দিয়া তাই প্রায়ই বামা-কণ্ঠে কান্না উঠিত—“হে মিরাজি, হে বাকা!” “ও আমার স্বামী! ও আমার রাজা!” স্বামী এবং রাজাটী বোধ করি তখন মৃদু-মধুর হাস্য করিতেন। সেই দেশের রাজা কিনেরার মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ঘটনাগুলি যাহা কাপ্তেন স্পিক তাঁহার পুস্তকে চোখে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, শিশুরা মাটির পুতুলের যে মূল্য দেয় সে মূল্যও তথাকার পুরুষেরা নারীকে দেয় না। একস্থানে লেখা আছে, মৃত পিতার সমস্ত কন্যাগুলিকেই ছোট রাজা বিবাহ করিলেন, এবং সাতদিন পরে তাহার তিনটিকে ঠিক-মত গাজিগ (সেলাম) না করার অপরাধে জীবন্ত দণ্ড করিলেন। প্রায় পর্য্যটকেই পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ভালবাসার ব্যাপার অধিকাংশ অসভ্য জাতিরাই অবগত নহে। মনটেরো বলেন, “The Negro knows not love, affection or jealousy, they have no words or expression in their language indicative of affection or love.” সারু জন লবক ঐ-দেশেরই সম্বন্ধে বলেন, “are so cold and indifferent to one another that you would think there was no such thing as love between them.” কাক্রিদের সম্বন্ধে “no feeling of love in

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

marriage.” জারিবদের সম্বন্ধে “affection between man and wife out of the question.” অথচ ইহাদিগের মধ্যেই নারীর পতিপ্রেম, স্বামী-সেবার কথা শোনা যায় না, তাহা নহে। হইতে পারে জ্বরদস্তির চোটে, সে যাই হোক, অতিশয় নিষ্ঠুর ডাহোমান, মালগাসি, ফিজিয়ান, ছিপা, বেচয়ানা, ইহাদের সকলের ঘরেই পতিব্রতা স্ত্রী পাওয়া যায়। ডাহোমি ও ফিজি-দ্বীপে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা আত্মহত্যা করে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমেরিকার মণ্ডান জাতির বিধবারা মৃত স্বামীর কপাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গলায় মালা করিয়া গাঁধিয়া রাখে, রাত্রে মুণ্ডটাকে বিছানায় লইয়া শয়ন করে, স্নান করাইয়া দেয়, আহার করায়, শীতের দিনে কাঁথা দিয়া রাখে, এমন কি গান গাহিয়াও তাহাকে ঘুম পাড়ায়। অথচ পুরুষেরা জীবিতাবস্থায় কি কীর্তিই না করিয়া যান! তবে এমন কথাও বলিতেছি না যে, সর্বত্রই পুরুষেরা ক্রমাগত অত্যাচার করিয়াই চলে, এবং তৎপরিবর্তে রমণীরা কেবল ভালবাসিতে, সেবা করিতেই থাকে। এমন কথা বলিলে মানবের স্বভাবের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়; তবে কোন কোন স্থানে দারুণ অত্যাচার-অবিচারের পরিবর্তেও যদি স্নেহ-প্রেম সম্ভবপর হয়, তাহা রমণীতেই হয়, এবং সে দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই অসভ্য মানব-সমাজেও যে দুর্লভ নয়, তাহাই গোটা-দুই দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলাম মাত্র। নারীর এই মূল্য পুরুষ স্বীকার করিতে চাহে না এবং করে না, তাহা বহুবিধ প্রকারেই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য ইহার প্রতিকূলেও কিছু বলিবার আছে, কিন্তু তৎসঙ্গেও এ-কথা সত্য যে, তাহা অস্বীকার করিয়া লইলেও এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য তিলার্দ্ধও বিচলিত হয় না।

সে যাই হোক, আমি এতক্ষণ যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা এই যে, প্রায় কোন দেশেই পুরুষ নারীর যথার্থ মূল্য দেয় নাই, এবং তাহাকে নির্যাতন করিয়াই আসিতেছে। নির্যাতন করিয়া যে আসিতেছে সে-কথা অস্বীকার করিবার পথ নাই, কিন্তু ঋণ্য মূল্য হইতে যে চিরদিন বঞ্চিত করিয়াই আসিতেছে, এই কথাটার উপরেই তর্ক বাধিতে পারে। কারণ, কি তাহার সত্য মূল্য তাহা স্থির না করার পূর্বে বলা চলে না, নারী যথার্থ মূল্য পাইয়াছে কি না। পুরুষ এমন কথাও বলিতে পারে যে, যেদেশে নারী যে মূল্য লাভ করিয়া আসিতেছে, হয়ত সেই দেশে সেই তাহার প্রাপ্য মূল্য। অতএব, এই কথাটা আলোচনা করা আবশ্যিক। করিতে হইলে সর্বপ্রথমে নর-নারীর সম্বন্ধের বিচারই করিতে হয়। সম্বন্ধ মুখ্যতঃ চারিটা; স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা ও জননী,—তাহাই আমি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করিতেছি। আদিম মানব কি করিয়া স্ত্রী লাভ করিত, তাহার অনেক

নারীর মূল্য

তথ্য John F. M'Lennan তাঁহার প্রসিদ্ধ Primitive Marriage গ্রন্থে নানা দেশ হইতে আহরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন পশুর মত ছিল, তখন কি করিয়া স্ত্রী লাভ করিত, আমি এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই সে ইঙ্গিত একাধিকবার করিয়াছি। সবল দুর্বলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইত এবং সখ মিটিলে ত্যাগ করিত; তাহার সখের কাছে, তাহার স্ত্রী-লাভের প্রয়োজনের কাছে সে কিছুই বিচার করিত না, কোন সম্বন্ধই তাহাকে বাধা দিতে পারিত না। M'Lennan একস্থানে বলিয়াছেন, "men must originally have been free of any prejudice against marriage between relations." তাঁহার এ-কথাটা বড় সত্য কথা। Primitive instinct বলিয়া তখন কোন বস্তু ছিল না। মা মেয়ে ভগিনী কিছুই না মানিবার অনেক উদাহরণ শুধু যে অসভ্য আদিম মানবের কাছেই পাওয়া যায় তাহা নহে, অর্ধ-সভ্য ও সুসভ্যের মধ্যেও পাওয়া যায়। অতিশয় সভ্য সমাজেও যে মাঝে মাঝে বীভৎস গোপন কলঙ্কের কথা শোনা যায়, এ-ও যে সেই আদিম মানবের খেলা, তাহা heredity সম্বন্ধে যে-কেহ কিছু অলোচনা করিয়াছেন তিনিই অবগত আছেন। পূর্বে বলিয়াছি, অসভ্য ছিপিওয়েনরা জননীকে বিবাহ করে। অর্ধ-সভ্য আফ্রিকার গেবুন (Gaboon) প্রদেশের রাণী কিছুদিন পূর্বে স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্য হারাইবার আশঙ্কায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনের দাবী বজায় রাখিয়াছিলেন। পারস্যের সম্রাট আর্টজারাক্সস্ নিজের রূপবতী দুই কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসভ্য প্রাচীন মিশরের ফারাওরা সহোদরাকে বিবাহ করিতেন। সভ্য পেরু প্রদেশের রোকা ইঙ্কার বংশধর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম ইঙ্কা আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ঋষিও তাঁহার ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লঙ্কা-দ্বীপের অসভ্য ভেদারা ছোট বোনকে বিবাহ করা সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করে। সমাজে কুলীন বলিয়া তখন তাহার মান বাড়ে। বৈমাত্র ভগিনী ও বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা ত প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। অথচ ইহাদের কেহই এক অসভ্য ভেদা ছাড়া একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। সকলেই বহুবিবাহ করে। অর্থাৎ, মানুষ ধরেরটাও পরকে দেয় না, এবং পরেরটাও কাড়িয়া আনে। এখানে যদি মনে করা যায়, উপরে যে-সব কথা বলা হইল, তাহা শুধু ওই-সব দেশ ও জাতির সম্বন্ধে খাটে, অসভ্য দেশে খাটে না, তাহা হইলে ভুল বুঝা হইবে। সব দেশে এবং সব জাতির সম্বন্ধেই যে ওই কথা খাটে,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কোথাও ও-প্রথা লুপ্ত হইয়াছে, কোথাও আজিও প্রচলিত আছে। আমাদের এ-দেশে আজ বড় ভাই ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এই দেশের পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এবং ঠিক স্বরণ হইতেছে না, দীর্ঘতমা ঋষিরাও সাত ভাই বুঝি এক স্ত্রী লইয়াই ঋষি-যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন। এবং ইহাকেই মহাভারতের আদিপর্বে সনাতন প্রথা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং যাহাকে অসভ্যদিগের 'marriage by capture' বলা হয়, তাহার যে বহুল প্রচলন এই সভ্য ভারতভূমেও ছিল, সে দৃষ্টান্তেরও অসম্ভাব নাই। নারী লইয়া এই যে ঘরে-বাহিরে টানাটানি, কাড়াকাড়ি, অথচ দুইদিন পরে তাহার কোন দাম নাই—এইটা বুঝাইবার জন্তই নারীর আদিম অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আভিসিনিয়ার লোকেরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে সর্দারকে নিজের মাথার পরিবর্তে যুবতী কণ্ঠা কিংবা স্ত্রী দান করিত, এই মূল্যবান উপহার আবার সর্দার দু'দিন পরে যাহাকে ইচ্ছা বিলাইয়া দিতেন। Captain Speke এই দেশের রাজার সম্বন্ধে একটাদিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন—“next the whole party (King and Queens) took a walk winding through the trees and picking fruit, enjoying themselves amazingly, by some unlucky chance, one of the royal wives, a most charming creature and truly one of the best of the lot, plucked a fruit and offered it to the king, thinking doubtless to please him greatly, but he, like a mad man flew into a towering passion, said it was the first a woman ever had the impudence to offer him anything and ordered the pages to seize, bind and lead her off to execution.” তাহার পরে স্পিক লিখিতেছেন,—“it was too much for my English blood to stand ; and of course I ran imminent risk of losing my own in trying to thwart the capricious tyrant but I saved the woman's life.” নারী লইয়া পুরুষের এই যে পুতুল-খেলা, এই যে স্বার্থপরতা, পাশব বৃত্তির এই যে একান্ত উন্নততা, সে শুধু নারীজাতিকেই অপমানিত ও অবনমিত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, পুরুষ' যে সমাজকে এবং সমস্ত মাতৃভূমিকে ঐ-সঙ্গে টানিয়া নামাইয়া আনিয়াছে। বিভিন্ন দেশের নজির দিয়া দেখাইবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই, তাই আমি শুধু কাপ্তেন স্পিকের আর একটা কথা বলিয়াই থামিব।

নারীর মূল্য

তিনি বলিয়াছেন, আফ্রিকার এতবড় দুর্দশার বারো-আনা হেতু পুরুষের এই উচ্ছ্বলতা। তথায় সর্দারদিগের এবং ক্রমতাপন্ন লোকদিগের মৃত্যুর পরেই একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ওলোটপালট অনিবার্য। সেখানে কে যে কার বৈমাত্র ভাই হয়, কাহার সম্পত্তিতে কাহার যে অধিকার নাই, তাহা গায়ের জোরে এবং বল্লমের ফলা ভিন্ন প্রতিপন্ন করার দ্বিতীয় পথ নাই। আরো একটা কথা। ঐ কাপ্তেন সাহেব যখন তাঁহার একজন ওয়াবিষি নিগ্রো ভৃত্যের মুখে শুনিলেন যে, তাহার নরমাংস আহার করে এবং বড় ভালবাসে, তখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “বাপু নরমাংস এত পাও কোথায়? নিজেদের লোক মারিয়া আহার কর কি?” সে লোকটা জবাব দিয়াছিল, “না, নিজেদের লোক মারি না, আশ-পাশের গাঁ হইতে কিনিয়া আনি।” “অর্থাৎ?” লোকটা বলিল, “যে-সব ছেলে-মেয়েদের বাপ নাই, তাহার খাইতে না পাইয়া প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের জননীরা একটা ছাগল পাইলেই শিশুগুলিকে দিয়া দেয়, আমরা ঘরে আনিয়া মারিয়া খাই।” সুসভ্য দেশেও বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শিশুগুলির তুলনায় প্রথম পক্ষের সন্তানগুলির উপরে যেমন অনেক সময়েই নির্দয় হইয়া উঠেন, এ-ক্ষেত্রে জননীরাও বোধ করি সেইরূপই হয়, তবে অসভ্য বলিয়া কিছু বাড়াবাড়ি করে এবং করাই বোধ করি স্বাভাবিক। আন্দামান দ্বীপের অসভ্যদিগের একটা প্রথা আছে, শিশুর দাঁত না ওঠা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকে, তার পর যে যাহার পথ দেখে। পুরুষটা আর একটি স্ত্রী খোঁজে, তাহার স্ত্রীটিও তাই। সে-সময়ে জননীরা প্রায়ই তাহাদের দাঁত-ওঠা শিশুটিকে কোন একটা জলাশয়ের ধারে ফেলিয়া দিয়া দ্বিতীয় সংসার করিতে যায়। সেইজন্যই ডাক্তার Francis Day রিপোর্ট দিয়াছিলেন, আন্দামান দ্বীপবাসীরা ‘are fast dying out’ এবং অনেক অহুসঙ্কান করিয়াও তিনি এমন একটি জননী খুঁজিয়া পান নাই যাহার একসঙ্গে তিনটি সন্তানও জীবিত আছে। আমেরিকার কুচিল জননীরা সন্তান পীড়িত হইয়া পড়িলেই বনের ভিতর ফেলিয়া দিয়া আসে। হারবার্ট স্পেন্সর *Savage Life and Scenes in Australia and New Zealand* (by G. F. Angas)-এর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, Angas সাহেবের কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সত্যই অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যেরা অভাবে নিজেদের জীবন্ত ছেলেমেয়েদের বঁড়সিতে গাঁথিয়া কুমীর হাঙ্গর ধরিবার টোপ (bate) প্রস্তুত করে এবং চর্কি লইয়া মাছ ধরে। কিন্তু তাঁহার কথা অশিখাস করিবার বিশেষ হেতু নাই। কারণ, অহুসঙ্কান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে-কোন দেশে যে-কোন জাতির মধ্যে সমাজে নারীর স্থান নীচে

শ্রী-সাহিত্য-সংগ্রহ

নামিয়া আসিবার সঙ্গেই শিশুর স্থান আপনি নামিয়া আসে। এ শুধু মানবের নিম্নস্তরের কথা নহে। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরেও চোখ ফিরাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নারী যেখানে উপেক্ষার পদার্থ, জাতির মেরুদণ্ডরূপ শিশুরাও সেখানে উপেক্ষা অবহেলার জিনিস। একথার সত্যতা উদাহরণ দিয়া প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সে-জাতির ভবিষ্যৎ উত্তরোত্তর অন্ধকার হইয়াই আসিতে থাকে। কিন্তু নরনারীর শিথিল বন্ধনই তাহার একমাত্র হেতু বলিয়া ধারণা মনে করেন, তাহার ভুল করেন। নারী উপেক্ষিত ক্রীড়ার সামগ্রী,—এইটিই সর্বপ্রধান হেতু। হারবার্ট স্পেন্সর তাহার Sociology গ্রন্থে আদিম মানবের strong emotion-এর দোহাই পাড়িয়া কি করিয়া এই বিষয়টির মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। রাগের মাথায় “will slay a child for letting fall something it was carrying” ‘ইমোশন’ হইতে পারে, কিন্তু “kill their children without remorse on various occasion”. মাছ ধরিবার টোপের জন্ত ছেলে মারিয়া ধীরে ধীরে তাহার চর্কি বাহির করা, কিংবা desert sick children কি করিয়া ঠিক ‘ইমোশন’ হইতে পারে বলিতে পারি না। আর তাহাও যদি হয়, তাহাতেও আমার কথাটা অস্বীকৃত হয় না। আদিম মানবের যত-কিছু দোষ থাকিবার তাহা ত আছেই, নর-নারীর বন্ধন প্রায় সর্বত্রই শিথিল, সে-কথা ত বটেই, কিন্তু তাহাতেও তাহার সামাজিক অবস্থা উত্তরোত্তর নামিয়া আসে না, দিন দিন সে সংসার হইতে অপস্থত হইয়া যায় না, যদি না সে তাহার নারীর অবস্থা নামাইয়া আনে। টাহিটির কথা দৃষ্টান্তের মত উল্লেখ করিতেছি। কাথেন কুক তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাদের দাম্পত্য বন্ধন অতি কদম্ব very low, very degraded, এমন কি, যে স্ত্রী সুন্দরী, তাহার কিছুতেই একটা স্বামীতে মন ওঠে না; বাপের বাড়ির অবস্থা খণ্ডর-বাড়ির অবস্থা হইতে ভাল হইলে, স্ত্রী “as a right demand and obtain more husbands” এবং পরবর্তী পর্যটকেরাও এ-সব কথা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, এ-সমস্ত থাকা সত্ত্বেও ঐ-দেশের পুরুষেরা নারীকে শ্রদ্ধা-সম্মানের চোখে দেখে। বোধ করি এইজন্যই এ-দেশের শিশু-সম্মানের অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রতিপালিত হয়; এবং সেদিনেও সকলে এ-কথাটা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইহাদের মত শাস্ত সুশীল, অতিথি-বৎসল এবং সং অনেক সভ্য-সমাজেও দেখা যায় না। চুরি-ডাকাতি ইহারা জানিত না। সামাজিক অবস্থা তাহাদের অমুকরণীয় এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহারা কোন-দিন নারীর অসম্মান করে নাই, অসভ্যদের মত রমণীর স্থান টানিয়া নীচে

নারীর মূল্য

নামাইয়া আনে নাই বলিয়াই ১৯০৬ সালে C. L. Wragge 'The Romance of the South Seas' গ্রন্থে টাহিটি দ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন—“And what are the duties of women? To look after the house and mind the children; to be good wives, good mothers, to leave politics alone and darn the clothes. Tahitian woman, in *woman's sphere*, are superior by far, in my opinion, to their sisters in the Bois, and few Belgraviennes can give them points.”

সিলোনের অতি অসভ্য ভেদারা, যাহারা নারীজাতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা-সম্মান করে, প্রাণান্তেও এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে না, এবং কিছুতেই স্ত্রী ত্যাগ করে না, তাহাদের সম্বন্ধে জার্মান বিজ্ঞানার্চায হেকেল বলিয়া গিয়াছেন, সততা ও ঋয়পরতায় ইহারা ইউরোপের অনেক সভ্য জাতিকেই শিক্ষা দিতে পারে। ইহাদের অপত্যম্নেহের মত মধুর বস্তু জগতে দুর্লভ। ডায়েক ও টোডাদের সম্বন্ধেও প্রায় এই কথা খাটে। তিব্বতের রমণীদের চরিত্র-বিষয়ে খুব সুনাম নাই। শুধু যে তাহারা সব কয়টি ভাইকেই স্বামিষে বরণ করে তাহা নহে, করুণা হইলে পাড়া-প্রতিবেশীর আবেদন-নিবেদনও অগ্রাহ্য করে না। তথাপি দেশের পুরুষেরা তাহাদের নারীকে অত্যন্ত সম্মান করে। বোধ করি এইজন্যই রাজা রামমোহন রায় এই তিব্বতী রমণীদের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, “বিপদের দিনে এই তিব্বতের রমণীর দয়াতেই প্রাণ যায় নাই এবং আজিও চল্লিশ বৎসর পরে সেই রমণীগণের কথা স্মরণ করিলে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়”; এবং ইহাদের কাছেই তিনি সারাজীবন ধরিয়া নারীজাতিকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করিতে শিখিয়াছিলেন, এ-কথা তিনি নিজের মুখেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এইখানে আমার পাঠকের কাছে একটা অতি বিনীত নিবেদন আছে। এই-সব দৃষ্টান্ত হইতে আমাকে যেন এমন ভুল না বোঝা হয় যে, আমি অসচ্চরিত্রার গুণ গাহিতেছি। আমি গুণ গাহিতেছি না,—শুধু কথাটা বুঝাইয়া বলিতে চাহিতেছি যে, এমন অবস্থাতেও পুরুষ নারীকে সম্মান দিয়া, তাহার একটা মূল্য দিয়াও ঠকে নাই। তাহার একটা স্বাভাবিক সত্য মূল্য আছে বলিয়াই এমন অবস্থাতেও পুরুষ জিতিয়াছে বই হারে নাই। এইবার একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত লইয়া দেখি। ফিজি দ্বীপের রমণী; এমন পতিব্রতা স্ত্রী আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ—স্বামীর গোরের উপর ইহারা স্বেচ্ছায় উষ্মকনে প্রাণ দেয়, তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পুরুষেরা শুধুই বহুবিবাহ করে না, কথায় কথায় স্ত্রী-হত্যা করে—নারীর স্থান এখানে গৃহপালিত

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

পশুর সমান, বরং নীচে। জননীরা প্রার্থনা করে, তাহাদের সন্তান যেন প্রসিক্ চোর ডাকাত এবং খুনে হয়। পুত্ররাও অনেক সময়ে জননীর প্রাণ বধ করিয়া হাতে-খড়ি দেয়। বাপ গুনিয়া হাসে, বলে, ছেলে আমার বীরপুরুষ হইবে। কিন্তু রমণীগুলির নির্ভুর অন্তঃকরণের উল্লেখ করিয়া অনেক পর্যটকই বলিয়া গিয়াছেন, পুরুষেরা লড়াই করিয়া কাহাকেও বন্দী করিয়া আনিলে তাহাকে আহার করিবার পূর্বে মেয়েদের আমোদের জন্য অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দেয়। তাহার হাত-পা বাঁধা—স্ত্রীলোকদিগের সবচেয়ে বড় আমোদ খোঁচা দিয়া তাহার চোখ তুলিয়া ফেলা। স্ত্রীলোকেরা সেই হতভাগাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কেহ-বা চোখ তুলিতে থাকে, কেহ ছুরি দিয়া পেট কাটিয়া নাড়ি বাহির করিতে থাকে, কেহ পাথর দিয়া দাঁত ভাঙিতে থাকে; সে যত চেষ্টায়, ইহারা ততই আমোদ পায়। এই সে-দেশের নারী, অথচ, অসত্য কেন, স্নসভ্যের মধ্যেও তাহাদের মত পতিভক্তি ও সতীত্ব পাওয়া কঠিন। তবে, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল? সতীত্বে তাহাদের প্রায় সমকক্ষ নাই, কি দোষে, কাহার পাপে সেই নারী-হৃদয় এমন পাথরের মত হইয়া গেল।

নারী-সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা ও শ্রয়পরতার পরিচয় দিতে গিয়া অনেক নজির এবং অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আর বলিতে চাহি না। কারণ, ইহাতেও যদি যথেষ্ট না হইয়া থাকে ত আর হইয়াও কাজ নাই। অতঃপর আর দুই-একটা মূল কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ করিব। আগে নর-নারীর নানাবিধ সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া প্রথমেই দাম্পত্য সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছি। তাহার হেতু শুধু ইহাই নহে যে, যেখানে অশান্ত সম্বন্ধ অস্পষ্ট, সেখানেও ইহা স্পষ্টতর, অপিচ, জীবমাত্রেরই সমস্ত সম্বন্ধ হইতে ইহার আকর্ষণও যেমন দৃঢ়তর, স্পৃহা ও মোহও তেমনি দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানেরাও বলিয়াছেন, ছয়টা রসের মধ্যে মধুর রসটাই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি মানবের যৌন বন্ধন হইতে। বস্তুতঃ সামাজিক মানব যত প্রকারের সম্বন্ধে রস-ভোগ করিতে শিখিয়াছে, সর্বশ্রেষ্ঠ এই মধুর রসের মধ্যেই যাবতীয় রসের সমাবেশ ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং এইজন্যই একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই চোখে পড়ে, যে-কোন দেশে এই রসের ধারণা যত ক্ষীণ, বন্ধন যত ক্ষণস্থায়ী ও ভগ্নপ্রবণ, নর-নারীর অপরাপর সম্বন্ধেও সেখানে সেই অল্পপাতে হীন। জগতের যে-কোন দেশ বা জাতির সম্বন্ধে স্ত্রী অপেক্ষা জননী বা ভগিনী প্রিয়তর, এমন কথাটা বলিতে পারিলে হয়ত ভালই শোনায়, কিন্তু সেটা মিথ্যা বলা হয়। তবে এইখানে একটা বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করাও আবশ্যিক। যেহেতু

নারীর মূল্য

এমন কয়েকটা দৃষ্টান্ত আছে যেখানে তলাইয়া না দেখিলেই উল্টা ব্যাপার ঘটিতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কয়েকটা অসভ্য বা অর্ধ-সভ্য জাতির মধ্যে একদিকে নারীর যেমন দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নাই, অন্যদিকে তেমনি ইহাকেই বাটীর, এমন কি সমাজের কর্তা হইতেও দেখা যায়। অসভ্য ফিউজিয়ানদের মধ্যে 'oldest women exercise great authority', মেক্সিকোর আদিম জাতির মধ্যেও তাই, হায়দাদিগের মধ্যেও তাই। চীনাদের মধ্যে বৃদ্ধা পিতামহী বাটীর কর্তা। সুমাত্রা, ম্যাডাগাস্কার এমন কি কঙ্গোতেও রমণীকে রাণী হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু, তাহাতে কি? একটুখানি ভিতরে প্রবেশ করিলেই সংশয় জাগিয়া উঠে, যে-দেশে রমণী ভারবাহী জীব, বিবাহের সময় যাহার মূল্য গরু-বাছুরের তুলনায় নিরূপিত হয়, সম্মান-প্রসবে অক্ষম হইলে যাহাকে পুনরায় বাজারে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, slave বলিতে যেখানে শুধু নারীই বুঝায়, সেই নারীর কর্তৃত্ব কেমন করিয়া একটা বাস্তব ব্যাপার হইতে পারে! ঠিক এই কথাটার উপরেই Boncroft একস্থানে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব-বোধ করি নামমাত্র। আমি নিজেদের ঘরের কথা ভাবিতে-ছিলাম। এদেশেও কর্তার অবর্তমানে বৃদ্ধা জননী বা পিতামহীকেও কর্তা বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু তার পরে? মনের অগোচরে পাপ নাই,—কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিতে চাহি না। এদেশেই সম্পত্তির লোভে গুরুজনকে বাঁধিয়া পোড়ানো হইত। অথচ পুরুষের নানাবিধ জবাবদিহির মধ্যে একটা চমৎকার জবাবদিহি Spencer সাহেবের পুস্তকে লেখা আছে, "It was adopted as a remedy for the practice of poisoning their husbands, which had become common among Hindu women!" খবরটি কোন্ পণ্ডিত তাঁহাকে দিয়াছিল জানি না, কিন্তু পোড়ানোর ধরণ-ধারণ দেখিয়া সে-বেচারি বিদেশীর চোখে বোধ করি নারীর এমনি একটা কিছু গুরুতর অপরাধের কথাই সম্ভবপর বলিয়া ঠেকিয়াছিল। হায় রে, পুড়িয়া মরিয়াও নিষ্কৃতি নাই! যাই হোক, কথাটা মিথ্যা,—সে নিজেই বানাইয়াছিল। কারণ, এদেশের টুলো পণ্ডিতদের তরফ হইতে পোড়াইয়া মারার স্বপক্ষে বিলাতে যে আপীল রজু করা হইয়াছিল, তাহাতে বিধবার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের উল্লেখ নাই। যাক এ-কথা।

কথা হইতেছিল, ঐ কয়েকটি স্থানে অবস্থাবিশেষে নারীর কর্তৃত্বের বস্তুগত্যা অস্তিত্ব আছে কি না। থাকিলেও কিভাবে থাকা অধিক সম্ভবপর। কিন্তু নর-নারীর যাবতীয় সম্বন্ধের স্তায়সঙ্গত দাবী নারীর যাহাই হোক, পুরুষ স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে যে-মূল্য তাহাকে দিয়া আসিতেছে, সেই তাহার প্রাপ্য মূল্য কি না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

কারণ, পুরুষ এই বলিয়া একটা বড়-রকমের উত্তর করিতে পারে যে, অবস্থা-ভেদে সে যে-মূল্য রমণীকে দিয়া আসিয়াছে তাহা ঠিকই হইয়াছে। যেমন, এদেশের কোন এক পণ্ডিত তাঁহার বইয়ে লিখিয়াছেন যে, মনুর সময়ে ব্যভিচার-শ্রোত অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়াই অমন হাড়-ভাঙ্গা আইন-কানুন নারীর উপর জারি করা হইয়াছিল। বোধ করি ইহার ধারণা যে, ব্যভিচারের জন্ত শুধু নারীই দায়ী—পুরুষের তাহাতে নামগন্ধও ছিল না। সে যাই হোক, এই উত্তরটারও কোন বনিয়াদ আছে কি না, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যিক। ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছি, সংসারে নারী যদি বিরল হইতেন, তবেই নারীর যথার্থ মূল্য স্থির করা সহজ হইত; কিন্তু, 'যদি'র কথা ছাড়িয়া দিয়া ইহার বর্তমান অবস্থার ঠিক দামটি পুরুষ দিয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিতেছি।

আডাম স্মিথ যখন প্রথম প্রচার করেন, জগতের সমস্ত বস্তুই যেমন নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, তাহাদের মূল্যও সেই নিয়মেরই অধীন। তখন সকল লোকে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছিল, তাহাদের জিনিস তাহারা যদৃচ্ছা বেচিবে কিনিবে—সে-মূল্য ধার্য্য করিয়া দিবার মালিক তাহারা ছাড়া আর কেহ নাই। এই অহঙ্কারে মানুষ প্রায় শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত এই সত্যকে অস্বীকার করিয়াই চলিয়াছিল। এখনই যে সকলে একবাক্যে মানিয়া লইয়াছে তাহা বলি না, কিন্তু যাহারা মানিয়াছে তাহারা এটা বেশ দেখিতে পাইয়াছে, এই স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিলে শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সফল ফলে না। তাহাদেরও না, আর পাঁচজনেরও না; ধান-চালের বাজারেও না, ছেলে-মেয়ে বেচাবেচির বাজারেও না। এই অন্ধতার একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত, গায়ের জোরে দাম বাড়ানোর একটা জীবন্ত সাক্ষী আমাদের দেশের কোলীন্ড বংশগত করাটা। তা যদি না হইত, তাহা হইলে আজ কুলীন বামুন বলিলে লোকে গালাগালি মনে করিত না। বামুনের ছেলে খণ্ডরবাড়ি গিয়া পয়সা লইয়া রাত্রি যাপন করে, এবং পরদিন সেই পয়সায় গাঁজা-গুলি খায়, এটা হইতে পারিত না। মানুষ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান, কতটা হীন হইবার পরে তবে যে এই কাজ করিতে সমর্থ হয় তাহা বুঝাইয়া বলিতে যাওয়াই বাড়াবাড়ি। এই কুলীনের ছেলে কুলীনকে ভ্রাস্ত সমাজ যে মূল্য দিতেছিল, সে তাহার যথার্থ প্রাপ্য মূল্য হইলে কিছুতেই তাহারও এতবড় অবনতি ঘটত না, সমাজও এমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অগণিত নিরুপায় বঙ্গ-রমণীর নিষ্পাপ রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া, তাহাদের ব্যর্থ-জীবনের দীর্ঘশ্বাস ও অভিসম্পাত বহিয়া, ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া এমন পঙ্গু এমন মিথ্যা হইয়া পড়িতে পারিত না। আজ বোধ করি কতকটা চক্ষু খুলিয়াছে। যাহার সত্য মূল্য

নারীর মূল্য

নাই, রাজাজ্ঞাতেই হোক, বা সমাজের ইচ্ছাতেই হোক, তাহার মূল্য অথবা বাড়াইয়া তুলিলে পরিণামে মঙ্গল হয় না। এই সত্য অপরদিকেও ঠিক এমনি প্রযুক্ত। যাহার যতটা মূল্য তাহাকে ঠিক ততটা দিতেই হইবে, অজ্ঞানেই হোক বা অহঙ্কারেই হোক, বঞ্চিত করিয়া কিছুতেই কল্যাণ লাভ করা যাইবে না। মিথ্যা কথনও জয়ী হইবে না। এই হিসাবে যাচাই করিয়া যদি দেখা যায়, পুরুষ নারীকে যে মূল্য দিয়া আসিয়াছে তাহাতে উত্তরোত্তর ভালই হইয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহাই তাহার প্রাপ্য মূল্য, অন্যথা স্বীকার করিতেই হইবে, বঞ্চনা করিয়াছে, পীড়ন করিয়াছে এবং সেইসঙ্গে সমাজে অকল্যাণ টানিয়া আনিয়াছে। প্রথমে একটা অবাস্তুর কথা বলিব। আমার এই প্রবন্ধের কতকটা পাঠ করিয়াই সেদিন আমার এক আত্মীয় 'morbid mind'-এর পরিচয় পাইয়াছেন; আর এক আত্মীয় নর-নারীর বিসদৃশ সম্বন্ধের আলোচনা করা অপরাধে এমনিই কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। পুরুষেরা যে এ-কথা বলিবেন তাহা জানিতাম। কিন্তু এ-সকল কথার উত্তর দিতে আমার লজ্জা বোধ হয়।

আগে আদিম ও অসভ্য মানব-জাতির সামাজিক ও সাংসারিক আচার-ব্যবহারের উল্লেখ করিতে গিয়া এমন অনেক কথা বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে যাহা পাঠ করিলেও মানুষ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ও-সব উল্লেখের প্রয়োজন শুধু যে পুরুষের দোষ দেখাইবার জন্মই হইয়াছিল তাহা নহে। সামাজিক মানব-সম্বন্ধে এই যে একটা উক্তি আছে যে, perhaps in no way is the moral progress of mankind more clearly shown than by contrasting the position of *women* among savages with their position among the most advanced of the civilized, ইহা সত্য বলিয়া মনে করি বলিয়াই ঐ-সব দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক হইয়াছিল। বস্তুতঃ মানবের নৈতিক উন্নতি-অবনতি বুঝিয়া লইবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না জানি না বলিয়াই অত কথা বলিয়াছি, তা আমার আত্মীয় দুটি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।

আর একবার মধুর রসের কথাটা পাড়িব। কারণ, এই রস মানুষকে কতভাবে, কত দিক দিয়া যে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যিক। সুতরাং একবার যাহা বলিয়াছি পুনরায় তাহার আবৃত্তি করিতেছি,—এই রস-বোধ যেখানে যত কম, এদিকে দৃষ্টি যাহার যত ক্ষীণ, সে ততই অমানুষ। এই রস অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াসেই মানবের অজ্ঞাতসারে সতীত্বের সৃষ্টি, এই রস-মাহাত্ম্য গাহিয়াই মানুষ কবি। এই রসের অবমাননা করিয়াই ভারতের যুগ-বিশেষ, এবং মধ্যযুগের ইউরোপ,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নারীকে peculiar representative of sexuality বলিয়া ভুল করিয়া যে অধঃপথে গিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। এই রস-বোধের প্রধান উপাদান নারীর সৌন্দর্য। পুরুষ যত বর্করই হোক, রূপের সম্মান সে না করিয়াই পারে না, এমন কি পটুয়ারা, যাহারা গরুর অভাবে জীলোকদিগের কাঁধে লাঙ্গলের জোয়াল তুলিয়া দিয়া জমি চাষ করে, তাহাদের মধ্যেও দেখা যায় যে, যে রমণীগুলি অপেক্ষাকৃত সুন্দরী তাহারা লাঙ্গল কম টানে। আবার সৌন্দর্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেই বেশি করিয়া লাঙ্গল টানিতে হয়। রেভঃ জন রস্ কোরিয়ার ইতিহাসে, কোরিয়াবাসীদের সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ব্যবহার অনেকস্থানেই লিখিয়া গিয়াছেন।

তবেই দেখা যায়, তা যত অল্পই হউক, রূপের একটু সুবিধা আছেই, এবং এই সুবিধা শুধু তাহার একার নহে, পুরুষেরও হৃদয়-বৃত্তি উচ্চ করিবার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। নিজের নির্ভুরতা সে দুটোদিনের জগুও দমন করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু এই শিক্ষা তাহার নিজের দোষেই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পায় না। দেখা যায়, সমাজ বাহার যত নীচ, নারীর সৌন্দর্য্যও সেখানে তত অল্প, এবং ততোধিক ক্ষণস্থায়ী। নিজের তুলিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না, কিন্তু প্রায় পর্যটকেই লিখিয়া গিয়াছেন, যাহাদের মধ্যেই নারীর status অত্যন্ত low, তাহাদের মধ্যেই পুরুষেরা বরং দেখিতে ভাল, কিন্তু রমণীরা এতই কুৎসিত কদাকার যে চাহিয়া থাকিতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু ইহাই কি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত নয়? নিদারুণ পরিশ্রম, দিনের অধিকাংশ সময় রুদ্ধ দুষ্ট বায়ুতে চলা-ফেরা, অতি অল্প বয়সেই সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন করা, পুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট কদর্য্য আহাৰ্য্য ভক্ষণ করা,—কেমন করিয়া তাহার রূপ দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে? আবার, রূপ মানে শুধু রূপ নহে, রূপ মানে স্বাস্থ্য। তাহার রূপ যায়, স্বাস্থ্য যায়, যৌবন দু'দিনেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; অতঃপর এই দুর্বল, বিগতযৌবনা রমণীর নিকট হইতে পুরুষ যা-কিছু বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া লইতে থাকে, তাহাতে চারিদিকেই অমঙ্গল বাড়িয়া যায়। স্থান ও সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই নরনারীর উভয়েরই বাঁচিয়া থাকিবার মিয়াদও কেমন করিয়া কমিয়া আসে। এইজগুই বোধ করি সমস্ত অসত্য বা অর্ধ-সত্যেরাই অঙ্গায়ু। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি নিজেদের ঘরের দিকে 'চোখ ফিরাইয়া দেখি, এবং দেখিতে পাই উহাদের সহিত আমাদের কিছুই মিলে না, উহাদের মত আমাদের রমণীরা অল্পদিনেই স্বাস্থ্য এবং যৌবন হারান না, তাঁহাদের গর্ভের সন্তানও রুগ্ন বা অঙ্গায়ু হয় না, অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখীর সংসার আরো ভারাক্রান্ত করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের সং ও স্বাধীন

নারীর মূল্য

জীবিকা অর্জনের পথ-ঘাট আমরা বন্ধ করিয়া দিই নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে, যে মূল্য আমরা নারীকে দিয়া আসিতেছি তাহাই ঠিক হইয়াছে। অন্যথা বলিতেই হইবে আমাদের ভুল হইয়াছে এবং ধর্মতঃ সে ভুল অপনোদন করিতে আমরা বাধ্য। শুধু এই কথাটা একটু সাহস করিয়া দেখিলে অনেক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে যে, যে-সব বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল নারী-দেহে পরাইয়া রাখিয়া আমরা নিজেদের সুখ্যাতি নিজেরাই গাহিয়া বেড়াইতেছি তাহাতে সুফল ফলিতেছে কি না। ভালো-মন্দ দেখিতে পাওয়া শক্ত কাজ নয়, স্বীকার করিতে পারাই শক্ত কাজ। এই শক্ত কাজটাই নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া ফেলিতে আমি দেশের পুরুষকে অমুরোধ করি। তাহা হইলেই কি বিধি-নিষেধ থাকিবে, বা থাকিবে না, কোন্টা সময়োপযোগী, এবং তখন কিসে বর্তমানকালে কল্যাণ হইবে তাহা আপনিই স্থির হইয়া যাইবে। তখন মধুর সময়ে ব্যভিচার-শ্রোত প্রবল ছিল কি ছিল না, এ-তর্কের মীমাংসা না হইলেও চলিবে। মধুর রসের সমস্ত রসটুকু নারীর নিকট হইতেই নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইব, নিজেরা কিছুই দিব না, এটা চালাকি হইতে পারে, কিন্তু এ চালাকি চিরদিন চলে না, বিগ্নেশ্বরের অলজ্বা আদালতে একদিন ধরা পড়েই। তখনো রসটা মধুর থাকিতে পারে, কিন্তু ফলটা আর মধুর হয় না।

আরো একটা কথা। সামাজিক নিয়ম-সম্বন্ধে ঠাঁহারাই আলোচনা করিয়া ঠাঁহাদের পরিশ্রমের ফল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ঠাঁহারা এ সত্যটাও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন যে, সমাজে নারীর স্থান অবনত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্থান আপনি নামিয়া আসে। কেন হয়, এবং হওয়া স্বাভাবিক কি না, এ-কথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। আমিও ইতিপূর্বে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি, শিশুর জননীর সহিত যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পিতার সহিত তত নয়। এই কারণেই সংসারে কৃতী লোকের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঠাঁহারা সকলেই এমন মা পাইয়াছিলেন যাহাতে সংসারে উন্নতি করা অসম্ভব হইয়া উঠে নাই। কিন্তু এই মায়ের অবস্থাটা সাধারণতঃ যদি দিন দিন নামিয়া পড়িতে থাকে, এবং তাহার অবশ্যস্বাবী ফলে দেশের কৃতী সম্ভানের সংখ্যা কমিয়া আসিতেই থাকে, এই প্রতিযোগিতার দিনে সে জাতি আর জাতির মত জাতি হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে এতকাল টিকিয়া রহিল কিরূপে? এই বলিয়া জবাবদিহি করিতে ঠাঁহারা চান ঠাঁহাদের শুধু এইটুকুমাত্রই বলিতে চাই যে, কোনমতে কেবল প্রাণধারণ করিয়া থাকাটাই মানুষের বাঁচা নয়।

সমাজে নারীর স্থান নামিয়া আসিলে নর-নারী উভয়েরই অনিষ্ট ঘটে, সে-সম্বন্ধে বোধ করি মতভেদ থাকিতে পারে না, এবং এই অনিষ্টের অমুসরণ করিলেই যে নারীর

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহাও বুঝিতে পারা কঠিন ব্যাপার নয়। সমাজ মানে নর-নারী। শুধু নরও নয়, শুধু নারীও নয়। উভয়েরই কর্তব্য সম্যক্ প্রতিপালিত হইতেছে কি না। কর্তব্য বলিতে শুধু নিজের কাজটাই বুঝায় না, অপরকেও ঠিক ততটা কাজ করিবার অবকাশ দেওয়া হইতেছে কি না, তাহাও বুঝায়। সেইটুকুই বুঝিতে বলিতেছি।

আরও একটা কথা এই যে, পুরুষের সমস্ত কাজ নারী করিতে পারে না, নারীর সমস্ত কাজও পুরুষে করিতে পারে না; কিংবা যে কর্তব্য দু'জনে মিলিয়া করিলে তবেই সুসম্পন্ন হয়, তাহাও শুধু একার দ্বারা সর্বানুন্দর হইতে পারে না। অতএব, সমস্ত সমাজেরই দেখা উচিত তথায় নারীর কর্তব্য প্রতিপালিত হইতেছে কি না। এবং কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা ও প্রশস্ত স্থান তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে কি না। জেলের কয়েদীদিগের কাছেও ভাল কাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে তাহাদের শৃঙ্খলের ভার লঘু করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না—তাহাতে আমেরিকার মেয়েদের দশা ঘটে। তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যাবসিত হইয়াছে। একদিন প্রাচীন রোমে আইন পাশ করিতে হইয়াছিল, “to prevent great ladies from becoming public prostitutes.” কোথায় একবার পড়িয়াছিলাম, তিব্বতের এক স্ত্রীর বহুস্বামিত্বের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বোধ করি একটুখানি পরিহাস করিয়াই বলিয়াছেন—এ-সব কথা লিখিতে ভয় হয়, পাছে আমেরিকার নারীরাও খেয়াল ধরিয়া বসে, আমরাও ওই চাই। তাহাদের ব্যাপার দেখিয়া প্রায় সমস্ত পুরুষেরই হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া যাইবার মত হইয়াছে। তাই কতকটা শৃঙ্খলের প্রয়োজন। অপর পক্ষে শৃঙ্খল একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলে পুরুষেরাও যে কত অবিচারী, উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, এই ভারতবর্ষেই সে দৃষ্টান্তের অসম্ভাব নাই।

যাই হোক, কথা হইতেছিল কাজ করিবার ন্যায্য স্বাধীনতা এবং ন্যায্য স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, এবং কোন্ কাজটা কাহার, এবং কোন্ কাজটা উভয়ের এই মীমাংসা করিয়া লওয়া। মানব-সমাজের যত নিম্নস্তরে অবতরণ করা যায় ততই চোখে পড়িতে থাকে, এই ভুলটাই তাহারা ক্রমাগত করিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাতে কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ শুধু লড়াই করে, এবং শিকার করে,—আর কিছু করে না। জীবন-ধারণের বাকী কাজগুলো সমস্তই একা নারীকে করিতে হয়। তাহারা জল তোলে, কাঠ কাটে, মোট বয়, জমি চাষ করে, সন্তান প্রসব করে, রান্না-বাড়া সমস্তই করে। এমন কি, শিকারলব্ধ পশুটাকেও বহিয়া

নারীর মূল্য

আনিবার জন্ত বনে-জঙ্গলে পুরুষের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এবং ইহার অনিবার্য ফলও যাহা হইবার ঠিক তাই হয়। অবশ্য স্বীকার করি, সব দেশেই কিছু নর-নারীর কাজের ধারণা এক হইতে পারে না,—হয়ও না। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই টের পাওয়া যায় সভ্যতার অল্পপাতে কর্তব্য বিভাগের একটা সাদৃশ্য আছে, এবং এই অল্পপাত যত বাড়িতে থাকে সাদৃশ্যও তত কমিয়া আসিতে থাকে। যেমন, ব্যবহারের নিমিত্ত দূর হইতে জল আনিবার আবশ্যক হইলে একজন ফরাসী কিংবা ইংরাজ হয়ত তাহা নিজেরাই করিবেন, কিন্তু আমরা লজ্জায় মরিয়া যাইব ; এবং তাহার পরিবর্তে গর্ভবতী স্ত্রীর কাঁকালে একটা মস্ত ঘড়া তুলিয়া দিয়া জলাশয়ে পাঠাইয়া দিয়া লজ্জা নিবারণ করিব। পেরুর উন্নত অবস্থার দিনে পুরুষ চরকা কাটিত এবং কাপড় বুনিত, স্ত্রীলোক লাঙ্গল ঠেলিত। এখনো সামোয়ার অধিবাসীরা রাঁধা-বাড়া করে, স্ত্রীলোক হাতে বাজারে যায়। আভিসিনিয়ার পুরুষদের বাজারে যাইতে মাথা কাটা যায়, কিন্তু প্রফুল্ল-মুখে ঘাট হইতে নর-নারী উভয়েরই কাপড় কাচিয়া আনে। এইরূপ কাজকর্মের ধারণা সব দেশে এক নয়, এবং ছোট-খাটো বিষয়ে এক না হইলেও বেশি কিছু আসিয়া যায় না সত্য, কিন্তু এই ধারণা স্বাভাবিক নিয়মকে অতিক্রম করিয়া গেলে অমঙ্গল অনিবার্য। অর্থাৎ, পুরুষ সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের কাজ করিতে গেলে যেমন করডোদের মত অকর্মণ্য হীন হইয়া পড়ে, তেমনি ডাহোমি রাজার স্ত্রীসৈন্তও যথার্থ unsexed হইয়াই তবে লড়াই করিতে পারে। তাহাতে নিজেরও কল্যাণ হয় না, দেশেরও না। কিন্তু, এই-সমস্ত পুরুষোচিত কাজ-কর্মের দরুণই একদল পণ্ডিতের এমন বিশ্বাসও জন্মিয়া গিয়াছে যে, আদিম যুগে নর-নারীর মধ্যে নারীর স্থানই উচ্চ ছিল। তাহারাই leader of civilization ; অথচ কেন সংসারে নারীর স্থান এমন উত্তরোত্তর নামিয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া স্পেন্সর সাহেব স্থির করিয়াছেন, দেশের লোক যত যুদ্ধপ্রিয়, অন্ততঃ আত্মরক্ষার জন্ত যাহাদিগকে ঘরে বাহিরে যত বেশি লড়াই করিতে হইয়াছে তাহারাই তত বেশি নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, তত বেশি গায়ের জোর খাটাইয়াছে। নারী যে স্বাভাবিক কোমলতা ও নম্রতার জন্তই স্বেচ্ছায় এত নির্যাতন এবং অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তাহা নয়। তাহারা গায়ের জোরে পারিয়া উঠে নাই বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে, পারিলে স্বীকার করিত না। কারণ, দেখা গিয়াছে যেখানে সুবিধা এবং সুযোগ মিলিয়াছে সেখানে নারী পুরুষ অপেক্ষা একতিলও কম নিষ্ঠুর বা কম রক্তপিপাসু নয়। এখানে এইটাই দেখিবার বিষয় যে, পুরুষ যদি এই বলিয়া জবাবদিহি করে, সে ছুর্কলের উপর গায়ের জোর খাটাইয়া কর্তৃত্ব করে নাই, বুঝিয়া

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সুবিয়া, ধীর-স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া, কর্তব্য এবং মঙ্গলের খাতিরেই বাধ্য হইয়া নারীর এই নিয়ন্ত্রান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে সে-কথা সত্য নয়।

অবশ্য স্পেন্সরের এই মত সকলেই যে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু যতগুলি বিভিন্ন প্রতিবাদ অন্ততঃ আমার চোখে পড়িয়াছে তাহাতে স্পেন্সরের মতটাই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, “militancy implies predominance of compulsory co-operation” এবং তাহার অবশ্যস্বাবী ফলের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, “Hence the disregard of women's claims shown in stealing and buying them ; hence the inequality of *Status* between the sexes entailed by polygamy, hence the use of women as labouring *Slaves* ; hence the life-and-death power over wife and child ; and hence that constitution of the family which subjects all its members to the eldest male. Conversely, the type of individual nature developed by voluntary co-operation in societies that are predominantly industrial, whether they be peaceful, simple tribes, or nations that have in great measure outgrown militancy, is a relatively—altruistic nature.”

বাস্তবিক এই compulsory co-operation যেখানে এত ‘binding’, তা লড়ায়ের জন্মই হোক, আর পরকালের জন্মই হোক, নারীর অবস্থা সেখানেই তত হীন। ধর্মের গোঁড়ামী, অধর্মের অত্যাচার নারীকে যে কত নীচু করিয়াছিল ইউরোপের মধ্যযুগ তাহার বড় প্রমাণ। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তাহার কতকটা ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছি, এবং আবশ্যক হইলে আরও শত-সহস্র দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সে আবশ্যক আশা করি নাই। ধর্মের গোঁড়ামি কেন নারীকে হীন করিল, সে আলোচনা এ প্রবন্ধে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে, সুতরাং তাহাতে বিরত রহিলাম। শুধু এই স্থল কথাটা বলিয়া রাখিব যে, ধর্মের বাড়াবাড়ির প্রধান উপাদান বিরক্তি। যা-কিছু সাংসারিক লোকের প্রার্থিত তাহাতেই আসক্তি নাই, এই ভাবটা দেখানো। বিষয়-আশয় টাকা-কড়ি অতি বদ জিনিস—নারীও তাই। ‘The devil's gate’, ‘নরকস্থ দ্বারো নারী’ এইজন্মই শ্রেষ্ঠ ধর্মচর্চার বীজমন্ত্র। অর্থাৎ, যদি পরকালের কাজ করিতে চাও ত তাহাকে নরকের দ্বারস্বরূপ জ্ঞান কর, আর যদি ইহকালের কাজ করিতে চাও ত, আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা ছিল তাই কর।

নারীর মূল্য

যতগুলো পার বিবাহ কর,—তার আট-দশ রকম পথ আছে, এবং মরিলে যেমন করিয়া পার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। না পার অন্ততঃ জুজুর ভয় দেখাইয়া তাহাকে জড়ভরত করিয়া রাখিয়া যাও। Monogamy যাহা নারীর যথার্থ সম্মানের ঠাই, এবং যাহা একমাত্র নর-নারীর প্রকৃত স্বাভাবিক বন্ধন, সে ধারণাই প্রায় এদেশে নাই। অথচ, সতীত্বের এত অপৰ্যাপ্ত রীতি-নীতি, এটা বজায় রাখিবার এত অদ্ভুত ফন্দি আর কোন দেশে কোনদিন উদ্ভাবিতও হয় নাই। মনে হইতেছে, কোন এক মস্তবড় লোকের লেখায় পড়িয়াছি, আমাদের দেশ সমস্ত রকম সামাজিক প্রশ্নের যে একটা বড় রকম উত্তর দিয়াছেন, তাহা এখনও জগতের সম্মুখে আছে, এবং তাহার সফলতা অনিবার্য, না কি এমনি একটা কথা। কি জানি আমাদের দেশ কি বড় উত্তর দিয়াছিল, এবং জগতের কাহারো সে-জ্ঞান হাঁ করিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু ফল যে তাহার অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা টের পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার দেখাদেখি আরো অনেকে—যাঁহারা সামাজিক ইতিহাসের কোন ধার ধারেন না, তাঁহারাও এইসমস্ত কল্পনার ধূয়া গাহিতে শুরু করিয়াছেন। ‘বড় রকম উত্তর দিয়াছিল’, ‘সমস্ত সামাজিক প্রশ্ন’, ‘জগতের সম্মুখে আছে’, ইত্যাদি বুলির অর্থ বোঝাও যেমন শক্ত, এই-সব সাহিত্যিক verbiageএর প্রতিবাদ করিতে পারাও ততোধিক কঠিন। অন্যান্য জাতি চোখের উপর দিন দিন বড় হইয়া যাইতেছে, নর-নারী মিলিয়া পতিত সমাজটাকে দুইদিনে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া ধরিতেছে, যে যাহার ঞ্চাধ্য অধিকারের মধ্যে চলা-ফেরা করিয়া উন্নত হইয়া উঠিতেছে—তবু সে-সব কিছুই নয়। আর আমাদের দেশের সেই অবোধ্য বড় উত্তরটাই মস্তবড় এবং তাহার ভবিষ্যৎ কাল্পনিক সফলতাটাই সর্বোপরি বাঞ্ছনীয়। সেই জাতিভেদের অসংখ্য সঙ্কীর্ণতা, বালিকা-বিবাহ, বিবাহ না দিলে জাত যাওয়া, বারো বছরের বিধবা মেয়েকে দেবী করার বাহাহুরি, পঞ্চাশ বছরের বুড়ার সহিত এগারো বছরের মেয়ের বিবাহ এবং তাহার বছর-দুই পরেই তাহার গর্ভের সন্তান—এইসমস্তই বড়-রকমের উত্তর। অথচ কথাটি বলিবার যো নাই। পণ্ডিতেরা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিবেন, “তুমি আমাদের মুনি-ঋষিদের চেয়ে বেশি বোঝ?” মনে পড়ে, সেই আম কেনার কথা। লোকটা বলিল, “চেখে নিন—মিষ্টি গুড়”। খেয়ে দেখি তত টক আমার জীবনে খাই নাই। কিন্তু লোকটাকে কিছুতেই স্বীকার করাইতে পারিলাম না। সে ক্রমাগত চেষ্টাইয়া বলিতে লাগিল, “টক বললেই গুনব? আমার গাছের আম আমি জানিনে!” এর আর উত্তর কি? -

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

ইংরাজীতে বাহাকে ethics বলে, তাহার একটা গোড়ার কথা এই যে, বিসদৃশ হেতু না থাকিলে আমার স্বাধীনতাটা কেবল ততদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারি যতক্ষণ না তাহা আর একজনের তুল্য স্বাধীনতায় আঘাত করে। এই দুটো কথার দ্বারা মানুষের প্রায় সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে, এবং আমার বিশ্বাস, যে-কোন সামাজিক প্রণের স্থানও ইহারই মধ্যে সঙ্কুলান হয়। ইহাকে যে সমাজ যত বেশি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছে, সে তত বেশি নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নারীকেও নত করিয়াছে, নিজেরাও অবনত হইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। একটা কণ্ঠা হয়ত রুগ্না, দুর্বল, অশিক্ষিতা এবং অপটু, তত্রাচ একটা বিশেষ বয়সে তাহার বিবাহ দিতে হইবে, অর্থাৎ মাতৃত্বের গুরুত্ব তাহাকে মাথায় তুলিতেই হইবে; অথচ আর একটা বিধবা মেয়ে হয়ত সবল সুস্থ, শিক্ষিতা এবং মাতৃত্বের সম্পূর্ণ উপযোগিনী—আদর্শ জননীর সমস্ত সদগুণে হয়ত ভগবান তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন, তবুও তাহাকে তাহার স্বাভাবিক স্বেচ্ছাসিদ্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। ইহাতে শাস্ত্রকারের মর্যাদা যদি-বা বজায় থাকে, ধর্মের মর্যাদা যে বজায় থাকে না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। প্রথমটাতেও না, পূরেরটাতেও না।

সুসভ্য মানবের সুস্থ সংঘত শুভ-বুদ্ধি যে অধিকার রমণীজাতিকে সমর্পণ করিতে বলে, তাহাই মানবের সামাজিক নীতি এবং তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হয়। কোন একটা জাতির ধর্মপুস্তকে কি আছে না আছে, তাহাতে হয় না। নারীর মূল্য বলিতে আমি এই নীতি ও অধিকারের কথাই এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছি। Supply এবং demand-এর মূল্যও বলি নাই, কবে পুরুষ বাড়িয়া উঠিবে, কবে নারী বিরল হইবে, সে আশাও করি নাই। নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ, সহানুভূতি ও স্বেচ্ছা-ধর্মের উপরে। ভগবান তাহাকে দুর্বল করিয়াই গড়িয়াছেন, বলের সেই অভাবটুকু পুরুষ এইসমস্ত বৃত্তির মুখের দিকে চাহিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারে, ধর্মপুস্তকের খুঁটিনাটি ও অবোধ্য অর্থের সাহায্যে পারে না। ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জাপান। সে কেবল তাহার নারীর স্থান উন্নত করিতে পারিয়াছে সেইদিন হইতে যেদিন হইতে সে তাহার সামাজিক রীতি-নীতির ভালো-মন্দর বিচার ধর্মের এবং ধর্ম-ব্যবসায়ীর আঁচড়-কামড়ের বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেও সেখানে চীনাঙ্গের মত নারীর দুর্দশার সীমা-পরিমিতা ছিল না। শুধু ইউরোপ সম্বন্ধেই 'the clergy have been the worst enemies of women,

নারীর মূল্য

women are their best friends' নয়, অনেক দেশের সম্বন্ধেই ঠিক তাই। নারীর স্থান অবনত করিবার জন্ত ধর্ম-ব্যবসায়ীর স্পর্ধা যে কতদূর বাড়িতে পারে, তাহা St. Ambroseএর একটা উক্তি হইতে জানা যায়। তিনি অসংশয়ে প্রচার করিয়াছিলেন, "marriage could not have been God's original theme of creation"; 'গডে'র অভিপ্রায়টুকু পর্যন্ত তাহাদের অগোচর থাকে না, কিন্তু কাহার সাধ্য তাহাকে অবিখ্যাস করে।

ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইসলাম-ধর্মে। যদিও নারীর স্থানটা কোরানের মতে ঠিক কোন্‌খানে, তাহা বুঝাইয়া বলা অতি কঠিন, তথাপি মহম্মদ নারী-জাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, পুত্র-কন্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিধবাকে—যাহার অবস্থা আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরুপায় ছিল—তাহাকে দয়া ও স্নানের দৃষ্টিতে দেখিতে হুকুম করিয়া গিয়াছেন, এ-সব কথা অস্বীকার করা যায় না; বস্তুতঃ তদানীন্তন আরব-রমণীর ভয়ঙ্কর অবস্থার তুলনায় আরবের নব-ধর্ম যে নারীকে সহস্র-গুণে উন্নত করিয়াছে তাহাতে লেশমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। Hornbeck, Ricaut প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা কি ভাবিয়া যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, মুসলমানদের মতে নারীর আত্মা নাই এবং নারীকে তাহার পশুর মত মনে করে, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত কোরানের কোথাও এমন কথা দেখিতে পাই নাই। বরং কোরানের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে এই যে একটা উক্তি আছে, মৃত্যুর পর দুঃস্থকারীকে ঈশ্বর শাস্তি দেন—তিনি নর-নারীর প্রভেদ করেন না—তাহা দেখিয়া মনে হয়, মহম্মদ নারীর আত্মা অস্বীকার করেন নাই। কোরানের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং আরও অনেকস্থানেই নারীর প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা ও তাহার স্নাত্য অধিকারের বিষয় এই ধর্ম-গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে। তথাপি অনেকের বিশ্বাস, ইসলাম-ধর্মে নারীর স্থান বড় নীচে। এটা বোধ করি পুরুষের বহু-বিবাহের অসুখমতি আছে বলিয়াই। চতুর্থ অধ্যায়ের গোড়াতেই আদেশ আছে, "take in marriage of such other women as please you, two or three or four and no more." এ-ছাড়া বিশ্বাসী এবং সাধু লোকেরা স্বর্গে গিয়া কিরূপ সুখ-সম্পদ আমোদ-আহ্লাদ ভোগ করিতে পাইবেন, সে-সম্বন্ধে মহম্মদ অনেক আশা দিয়া গিয়াছেন। স্বর্গে প্রতি বিশ্বাসীর নিমিত্ত কিরূপ ও কতগুলি করিয়া ছরানি নির্দিষ্ট হইবে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা আছে, কিন্তু মর্ত্যের মানবীর অবস্থাটা স্বর্গে কিরূপ দাঁড়াইবে এবং সেইরূপ দাঁড়ান বাঞ্ছনীয় কি না তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

Sale সাহেব তাঁহার কোরানের অনুবাদের একস্থানে লিখিয়াছেন, "but that good women will go into a seperate place of happiness, where they will enjoy all sorts of delights ; but whether one of those delights will be the enjoyment of agreeable paramours created for them, to complete the economy of the Mahamedan system, is what I have found no-where decided." এই যদি হয়, এত করা সত্ত্বেও যে নারীর যথার্থ অবস্থা-সম্বন্ধে লোকের দারুণ সংশয় ও মতভেদ ঘটিবে, তাহা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া মহম্মদ নিজেও একস্থানে বলিয়াছেন, "when he took a view of paradise, he saw the majority of its inhabitants to be the poor, and when he looked down into hell, he saw the greater part of the wretches confined there to be women !"

যাঁহারা মনে করেন সংসারে নারী প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকার জন্তই স্বভাবতঃ তাহার হীন মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা যে সম্পূর্ণ ভুল করেন এ-কথা বলি না। কারণ, যে-দেশেই মানুষ লড়াই করাটাই পুরুষের পরম গৌরবের বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে এবং সেই হিসাবে লড়াই করিয়াছে এবং লোককন্ম করিয়া বাহ্যতঃ নিজেদের নারীর অনুপাত বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই দেশেই নারীর মূল্য হ্রাস হইয়াছে। এ-কথা সত্য হইলেও, এ-কথাটাও বুঝিয়া দেখিবার বিষয়, বাস্তবিক নারীর অনুপাত তাহাতে বৃদ্ধি হয় কি না। কারণ, এই কথাটা অনেকেই গণনার মধ্যে আনেন না যে, প্রায় সমস্ত যুদ্ধপ্রিয় জাতিই নিজেদের নারীর অনুপাত বৃদ্ধি না পাইবার দিকে প্রথর দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। প্রধান উপায় নিজেদের শিশু-কন্যা হত্যা করিয়া। প্রায় সমস্ত আদিম অসভ্য জাতির শিশু-কন্যা বধ করিয়া ফেলিত। রাজপুত্রেরা করিত, আরব-শেখেরা কন্যা জন্মিবামাত্রই গর্ভ কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিত, কেঁধা প্রদেশের আরবেরা শিশু-কন্যার পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বে কন্যার জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিত, এইবার মেয়েকে গন্ধ মাখাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ সে তার মায়ের ঘরে যাইবে। অর্থাৎ, কুপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোরিশের লোকেরা নকার নিকটবর্তী আবুদেলামা পাহাড়ে নিজেদের কন্যা বধ করিত। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলিয়া গিয়াছেন, "the practice of exposing female infants and putting them to death being so common among the ancients, that it is remarked as a thing very extra-ordinary in the Egyptians, that they brought up all their children." চীনাদের মধ্যে

নারীর মূল্য

শুনিয়াছি এ-প্রথা আজও আছে। গ্রীকদের সহক্রে Posidippusএর একটা প্রচলিত উক্তি Sale উদ্ধৃত করিয়াছেন, “a man, though too poor, will not expose his son ; but if he is rich, will scarce preserve his daughter.”

সুতরাং লড়াই করিয়া নিজেরা মরিলে বা কণ্ঠা হত্যা করিলে নারীর অহুপাত বাড়ে না, কমেও না, অহুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান (মূল্য) নির্ভরও করে না। করে পুরুষের এই ধারণার উপর—নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু ! তাই নিজের কণ্ঠা বধ, তাই পরের কণ্ঠা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা ! নিজের কণ্ঠা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহা গৌরব ! এইজন্যই এক পুরুষের বহু-স্ত্রী সম্মান ও বলের চিহ্ন। Burckhardt বলিয়াছেন, এই ধারণা ওয়াহাবিদের মধ্যে আজও এত প্রবল যে, তাহারা ইউরোপের এক পুরুষের একটীমাত্র স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হাঁ করিয়া থাকে। কথাটা সত্য বলিয়া তাহারা মনের মধ্যে বিশ্বাস পর্যন্ত করিতে পারে না।

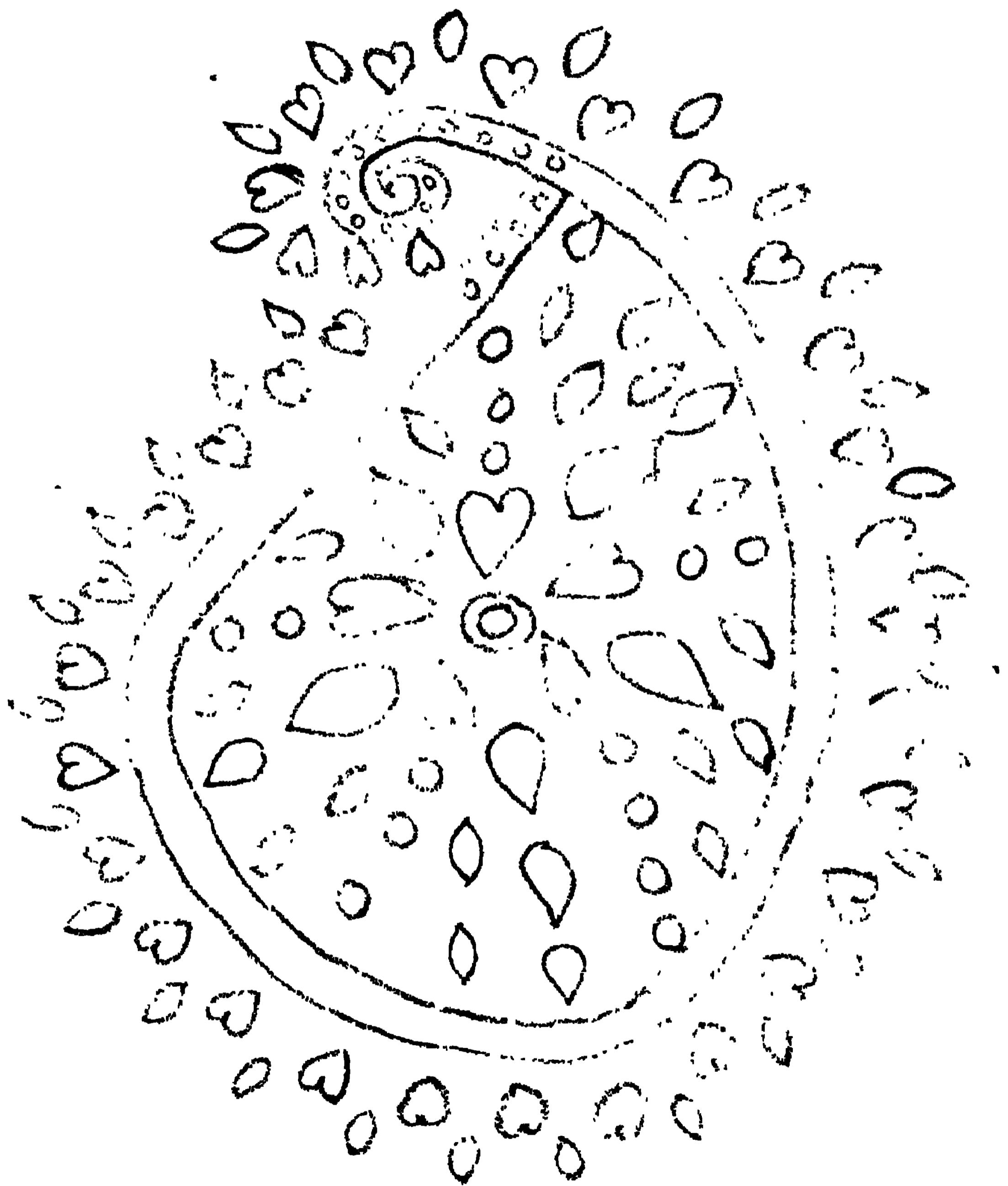
আর না। এ প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া গেল, এইবার শেষ করি। জানি না, পুরুষে এ প্রবন্ধ পড়িয়া কি মনে করিবেন, কিন্তু যাহা সত্য বলিয়া অকুপটে বিশ্বাস করিয়াছি, নারীর মূল্য কেন হ্রাস পাইয়াছে এবং বাস্তবিক পাইয়াছে কি না, এবং মূল্য হ্রাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে, এবং নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি—এইমাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের অসম্মান করা হইয়াছে, কি হয় নাই, দেশাচারের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, কি হয় নাই—এ-কথা মনে করিয়া কোথাও থামিয়া যাইতে পারি নাই। যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও, অবশ্য ফলাফলের বিচার-ভার পাঠকের উপর।

নর-নারীর পবিত্র বন্ধনের সীমা ও পরিণতি সম্ভবতঃ একদিন কি হইবে এবং কি হওয়া উচিত উপসংহারে শুধু সেই কথাটাই হারবার্ট স্পেন্সরের ভাষায় ব্যক্ত করিব। “As monogamy is likely to be raised in character by a public sentiment requiring that the legal bond shall not be entered into unless it represents the natural bond ; so, perhaps it may be, that maintenance of legal bond will come to be held improper if the natural bond ceases. Already increased facilities for divorce point to the probability that whereas, while permanent monogamy was being evolved, the union by law (originally the

शररु-सलरुतु-संगुइ

act of purchase) was regarded as the essential part of marriage and the union by affection as non-essential, and whereas at present the union by law is thoughtt he more important ; and the union by affection the less important, there will come a time when the union by affection will be held of primary moment and the union by law as of secondary moment ; whence reprobation of marital relations in which the union by affection has dissolved. That this conclusion will be at present unacceptable is likely— I may say, certain..... Those higher sentiment accompanying union of the sexes, which do not exist among primitive men and were less developed.in early European times than now, may be expected to develop still more as decline of militancy and growth of industrialism foster altruism ; for sympathy which in the root of altruism, is a chief element in these sentiments.”

অপ্রকাশিত রচনাবলী



ক্ষুদ্রের গৌরব

সে-রাত্রে চাঁদের বড় বাহার ছিল। শুভ্র, নিখুঁ, শান্ত কোমুদী স্তরে স্তরে দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশ বড় নিখুঁ, বড় নীল, বড় শোভাময়। শুধু হৃদয় প্রান্তস্থিত দুই-একটা খণ্ড শুভ্র মেঘ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। মেঘলা বড় লঘু-হৃদয়; কাছে আসিয়া, আশে-পাশে ছুটিয়া বেড়াইয়া চাঁদকে চঞ্চল করিয়া দেয়। আজ তাহা পারে নাই, তাই চন্দ্রমা কিছু গভীর-প্রকৃতি। সে স্থির গাভীর্যের যে কি সৌন্দর্য্য তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

আকাশে স্থান গ্রহণ করিলেই তাঁহার এ শোভা হয় না। তবে মনে হয়, যেদিন কবি তাঁহার রূপ দেখিয়া প্রথম আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, আজ বুঝি তাঁহার সেই রূপ। যে রূপ দেখিয়া বিরহী তাঁহার পানে চাহিয়া প্রিয়তমের জন্ম প্রথম অশ্রমোচন করিয়াছিলেন, আজ বুঝি তিনি সেই রূপে গগনপটে উদ্ভিত হইয়াছিলেন; আর যে রূপের মোহে ভ্রান্ত চকোরী সুধার আশায় প্রথম পথে ছুটিয়া গিয়াছিল—আজ বুঝি তিনি সেই সুধাকর! নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া সত্যই মনে হয়, কি শান্ত, কি নিখুঁ, কি শুভ্র! শুভ্র জ্যোৎস্না উন্মুক্ত বাতায়নপথে সদানন্দের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহে দীপ নাই। শুধু সমানন্দ নীচে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতেছে ও রোহিণীকুমার মুখপানে চাহিয়া আছে। আর অদূরে কে একজন গাহিয়া চলিতেছে, “যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী”। সদানন্দ ধীরে ধীরে গাঁজার কলিকা নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “আহা!”

তাহার পর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আর একবার সে মাথা নাড়িয়া মনে মনে সেই অসম্পূর্ণ পদটি আবৃত্তি করিয়া লইল—“কাঁদে রাধা বিনোদিনী”।

কবে কোন্ স্নেহ-রাজ্যে বিরহ-ব্যথায় রাধা বিনোদিনী যমুনা-পুলিনে বসিয়া প্রিয়তমের জন্ম অশ্রমোচন করিয়াছিলেন সে-কথা ভাবিয়া আজ সদানন্দের চক্ষে জল আসিয়াছে। সে গাঁজা খাইতেছিল—কাঁদিতে বসে নাই। শুধু একটা গ্রাম্য, অতি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ পদ অসময়ে তাহার চক্ষে জল টানিয়া আনিয়াছে।

সদানন্দের মুখে ঈষৎ চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। সে আলোকে রোহিণীকুমার সদানন্দের চক্ষের জল দেখিতে পাইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, “সদা, তোর নেশা হয়েছে, কাঁদচিস্ কেন?”

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

সদানন্দ গাঁজার কলিকা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। এবার রোহিণী বিরক্ত হইল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, “ঐ ত তোর দোষ—মাঝে মাঝে বেঠিক হয়ে পড়িস্!” সদানন্দ কথা কহিল না দেখিয়া বিরক্ত অন্তঃকরণে রোহিণী নিজেই কলিকার অশ্বেণে বাহিরে আসিল। আর একবার জানালা দিয়া দেখিল—সদানন্দ পূর্বের মত মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-ভাব রোহিণীর নিকট নূতন নহে—সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল আজ অল্প আশা নাই। তাই গম্ভীরভাবে কহিল, “সদা, শুগে যা—কাল সকালে আবার আসব।”

রোহিণী একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া বাইতেছিল, কিন্তু পথে আসিয়াই তাহার মনে পড়িল—সেই কোমল করুণ ‘আহা!’ তখন সে হাততালি দিয়া গান ধরিল, “ঘমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাখা বিনোদিনী—বিনে সেই, বিনে সেই—”

কিছুক্ষণ বিরামের পর আবার সেই গান সদানন্দের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে মুক্তকণ্ঠে উচ্চনেত্রে কাঁদিয়া কহিল—“দয়াময় তুমি কিরিয়া এস।”

রাখার ছঃখ সে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাই কাঁদিয়াছে; ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষুদ্র একটি চরণ তাহার সমস্ত হৃদয় মগ্ন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই নিশ্চল নীল ঘমুনা; সেই পিককুহরিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সখী-পরিবৃত কুঞ্জবন, সেই বকুল, তমাল, কদম্বমূল; সেই মৃত-সঞ্জীবনী বংশী-স্বর; মান অভিমান মিলন, তাহার পর শতবর্ষব্যাপী সেই সর্বগ্রামী বিরহ! আর ছায়ার মত সেই ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃপ্রেম—দয়া, ধর্ম, পুণ্য—এবং তাহার সর্বনিয়ন্তা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ!

এত কথা, এই দীপ্ত অথচ নিষ্ক ভাব, এত মাধুরী প্রণোদিত করিবার গৌরব কি এই অসম্পূর্ণ নিতান্ত সাধারণ পদটির? রচয়িতার, না গায়কের? কিন্তু পদটি যদি ‘ঘমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাখা বিনোদিনী’ না হইয়া—‘কাঁদে শরৎ-শশী’ হইত, তাহা হইলে সদানন্দের চক্ষে এত শীঘ্র এমনি করিয়া জল আসিত কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ। সে হয়ত বিরহ-বেদনাটা ছাড়িয়া দিয়া প্রথম শরৎ-শশীর বাস্তব নির্ণয় করিতে রসিত। শরৎ-শশী রাখার বিশেষণ হইতে পারে কি না তাহা বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া পরে অশ্রুজল সঘন্থে মীমাংসা করিত। কিন্তু গায়ক যদি গাহিতেন ‘ঘরের কোণেতে বসে কাঁদে শরৎ-শশী’, তাহা হইলে অনুমান হয় করুণ রসের পরিবর্তে হাশ্ব-রসেরই উদ্বেক হইত। ঘের কোণেতে বসিয়া ক্রন্দনটা ক্রন্দন নামের যোগ্য হইতে পারে না, কিংবা শরৎ-শশীর বিরহ হইতে নাই—অথবা হইলেও কাহ্নাকাটি করা তাহার পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা গেল যে, বিরহ-বেদনাজনিত ছঃখই সদানন্দের অশ্রুজলের পূর্ণ হেতু মনে। তাহা যদি

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

নিত্য উপাসিত, তাঁহারই ছায়া শ্রীরাধার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। অস্ত্রের তাহাতে স্থান হয় না, তাহাই সদানন্দের অশ্রুজলের কারণ, আকর, মূল—কিন্তু সোপান বা পথ নহে। অগাধ সমুদ্র ঝঞ্জাবাতের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু ঘোষণা করিয়া বেড়ায় না। শুধু ক্ষুদ্র তরঙ্গের দল তটপ্রান্তে আসিয়া ঘাতপ্রতিঘাতে পৃথিবীর বক্ষস্থল পর্যন্ত কম্পিত করিয়া বলিয়া যায়—“দেখ আমাদের কত প্রতাপ!” কুপের জল তাহা পারে না। সাগর-উর্ষির ইহাই গর্ব যে, সে অগাধ শক্তিশালী সমুদ্রের আশ্রিত। সূর্যের তেজ জননী বসুমতী প্রতিফলিত করেন, তাই তাঁহার রুদ্র প্রতাপ বুঝিতে পারি। আর সেই অনন্ত জ্যোতির্শয়ী বিশ্বপ্রাণিনী রাধাপ্রেমের কথা বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখিবৃন্দ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। যাহারা জানিতে পারিয়াছিল তাহারা মহৎ হইয়াছিল, যাহারা গুনিয়াছিল তাহারা ধন্ত হইয়াছিল। তার পর কালক্রমে লোকে হয়ত সে-কথা ভুলিয়া যাইত। একেবারে না ভুলিলেও তাহাতে এমন জীবন্ত মোহিনী শক্তি থাকিত না। এ মাধুরী যাহারা ধরিয়া রাখিয়াছেন, এ মহত্ব নখর জগতের এ-সার বস্তু যাহারা পৃথিবীর স্তায় প্রতিফলিত করিয়া জনসাধারণকে উচ্ছে তুলিয়াছেন,—তাঁহারা, ঐ অজর চিরপ্রিয় বৈষ্ণব কবিগণ। সে-রাধাপ্রেমের ছায়া তাঁহারা হৃদয়ে ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং সরস প্রেমপূর্ণ সুধামাথা ছন্দোবন্ধে জগৎসমক্ষে প্রতিভাত করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় বসেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিয়াছেন—‘এ জগতে বিশেষণের বাহুল্য’। এ-কথা বড় সত্য। বিশেষণ না থাকিলে বিশেষকে কে চিনিত! তাই মনে হয় এই অমর কবিতাগুলি রাধাপ্রেমের বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাকে দেখিলে তাহার বিশেষকে মনে পড়ে, বিশেষের সেইটিই বিশেষণ, সেইটিই প্রতিবিশ্ব, সেইটিই ছায়া।

যে বিরহ—শোকগাথা গাহিয়া অতীত দিবসের বৈষ্ণব-কবিগণ আপামর সকলকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন, তাহারই একটি হস্তপদহীন পরিত্যক্ত মৃৎপুত্তলিকার মত, মৃত-পুত্রের ছায়ার মত, এই ক্ষুদ্র ‘যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী’ পদটি সদানন্দের অশ্রু টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। ক্ষুদ্র কবির ইহাই গৌরব,—ক্ষুদ্র কবিতার ইহাই মহত্ব। ক্ষুদ্র ছায়া সদানন্দকে বশ করিতে পারিবে, কিন্তু রোহিণীকুমারের নিকটেও হয়ত যাইতে পারিবে না। তাহাতে ছায়ার অপরাধ কি?

মলিন বর্ষার দিনে আকাশের গায় নিবিড় জলদজাল বায়ুভরে চালিত হইতে দেখিলে মনে পড়ে সেই ষকের কথা। মনে হয় আজিও বুঝি তেমনি করিয়া উন্মত্ত যক্ষ ঐ মেঘপানে চাহিয়া প্রাণমিনীর সহিত কথা কহিতে চাহিতেছে। স্মরণ হয়, যেন যক্ষ-বধুর বিরহক্লিষ্ট মন মুখশোভা কোথায় কোন্ মায়ার দেশে দেখিয়া আসিয়াছি।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

হইত, তাহা হইলে শরৎ-শরীর দুঃখে তাহাকে অশ্রুজল লইয়া একুপ মারামারি করিতে হইত না।

কিন্তু রাখারই জন্ম এত মাথা-ব্যথা কেন? একটু কারণ আছে, তাহা ক্রমে বলিতেছি।

উত্তরু হিমালয়-শিখরের ধবল নগ্ন শোভা কেবল চক্ষুস্থান অমুভব করিতে পারে— অন্ধে পারে না। অন্ধের নিকট হিমাচল শরীর সঙ্কুচিতও করে না, সম্পদ-শোভাও আবৃত রাখে না। তথাপি অন্ধ সে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। এ অক্ষমতার কারণ তাহার চক্ষুহীনতা। যে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে হিমালয়-শিখর কি উচ্চ, কি মহান, কি গভীর, কি সৌন্দর্যে সুশোভিত, সে তাহার নাই। তাহার পর যে-কেহ পর্বতের শোভা হৃদয়ে একবার অমুভব করিয়াছে সে-ই কেবল ছই-চারিখানা শিলাখণ্ডের কৃত্রিম সন্নিবেশ দেখিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে। যে কখন দেখে নাই সে পারে না। যে দেখিয়াছে তাহাকে এই ছই-চারিটি শিলাখণ্ডই স্মৃতি-মন্দিরের রাজদ্বার উন্মোচিত করিয়া পূর্বদৃষ্ট পর্বতের সন্নিবন্ধে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। এই সক্ষমতাই ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের গৌরব। সে যে স্নানঘোর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, মহত্তের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্বের ইহাই স্নানঘা—ছায়ার ইহাই মহত্ব।

ভক্তের নিকট বৃন্দাবনের একবিম্ব বালুকণাও সমাদরে মস্তকে স্থান পায়, সে কি বালুকণার বস্তুগত গুণ, না বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য? তাহার মহত্বের স্মৃতি লইয়া, ভক্ত কল্পিতের ছায়াস্বরূপিনী হইয়া মর্মে উপস্থিত হয়, তাই তাহাদের এত সম্মান, এত পূজা।

সম্মানহারা জননী নিকট তাঁহার মৃত-শিশুর পরিত্যক্ত হস্তপদহীন একটা মৃতপুত্রলিকার হস্ত বক্ষে স্থান-প্রাপ্তি ঘটে। কেন যে তুচ্ছ মৃতপিণ্ডের এতটা গৌরব, সে-কথা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? বক্ষে স্থান দিবার সময় জননী মনে করেন না যে, ইহা একটা তুচ্ছ মাটির ঢেলা। তাঁহার নিকট সে তাঁহার মৃত পুত্রের ছায়া। যদি কখন পুত্রলিকার কথা মনে হয়—সে মুহূর্তের জন্ম। তাহার পর সমস্ত প্রাণমন, গত জীবন, পুত্রের স্মৃতিতে ভরিয়া উঠে। তুচ্ছ মৃতপিণ্ডের ইহার অধিক আর কি উচ্চাশা থাকিতে পারে? সে একটি হৃদয়েও স্মৃতি দিয়াছে ইহাই তাঁহার স্নানঘা।

আর রাখার বিরহ-ব্যথায় সদানন্দের অশ্রুজল! যমুনাভীরে বসিয়া যখন বিরহবিধুরা স্ত্রীরাম মর্মান্বিতিক যন্ত্রণায় হৃদয়ের প্রতি শিরা সঙ্কুচিত করিয়া তপ্ত অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছিলেন, তাঁহার কি মনে হইয়াছিল কবে কোন্ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তাঁহার দুঃখে সমতুঃখী হইয়া সদানন্দ চক্ষুজল বিসর্জন করিবে? যিনি ধোয়, যিনি

অপ্রকাশিত রচনাবলী

কিন্তু যে মনস্বী এই জীবন্ত মূর্তিধর মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, জলদজাল সেই মহান্ প্রতিভার ছায়ামাত্র। আপনার শরীরে সেই উজ্জল জ্যোতির প্রতিবিম্ব বহিয়া লইয়া বেড়ায়, মেঘের ইহাই গর্ভ। তাহার আনন্দ যে, সে মহতের আশ্রিত।

তাই পূর্বে বলিতেছিলাম, সমুদ্রের জল যাহা পারে, কূপের জল তাহা পারে না। যে-দুঃখে সদানন্দ রাখার জন্ত কাঁদিতে পারিয়াছিল, সে-দুঃখে হয়ত শবৎ-শশীর জন্ত কাঁদিতে পারিত না। ইহাতে সদানন্দের দোষ দিই না—শবৎ-শশীর অদৃষ্টের দোষ দিই। শবৎ-শশীর দুঃখে কাঁদাইতে হইলে আর কোন মনস্বীর প্রয়োজন—ক্ষুদ্র ছায়ার কর্ম নহে। ছায়ার নিজের মহত্ব কিছুই নাই, সে যখন মহতের আশ্রিত হইতে পারিবে তখনই তাহার মহত্ব। হইতে পারে সে রাজপথের ধূলা, কিন্তু বৃন্দাবনের পবিত্র রজঃ হইবার আকাঙ্ক্ষা যে তাহার একেবারে ছরাশা তাহাও মনে হয় না।

কিন্তু কথায় কথায় দরিদ্র সদানন্দের কথা ভুলিয়াছি। সে-রাত্রে সে আর উঠে নাই। প্রভাত হইলে রোহিণীকুমার জানালায় আসিয়া দেখিল, সদানন্দ তেমনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, সদানন্দ কি বসিয়া ঘুমাইতে পারে? তাহার পরে ডাকিল, “সদা—ও সদানন্দ!”

সদানন্দ জাগ্রত ছিল, উত্তর দিল, “কি?”

“জেগে আছ?”

“আছি।”

“সমস্ত রাত?”

“বোধ হয়।”

রোহিণীকুমার বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, এ কিরূপ নেশা? তাহার পর একটু থামিয়া—একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সদানন্দ, মনে করিতেছি এ কু-অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিব। তুমি শোও গে—আমি যাই। আর একদিন দেখা হবে।”*

* শবৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ‘দীপালি’ সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-লিখিত ‘শবৎ-শশিত্তি’ নিবন্ধে (৩রা চৈত্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) শবৎচন্দ্রের লিখিত ‘ক্ষুদ্রের গৌরব’ নামক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ‘ক্ষুদ্রের গৌরব’ রচনাটি ভাগলপুর সাহিত্য-সভার হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা ‘ছায়ার’ (শ্রাবণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) জন্ত লেখা হইয়াছিল। ইহা আবার ৮ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত ‘যমুনা’ মাসিক পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ‘যমুনা’র শবৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতে শেষে নামের স্থানে লেখা ছিল ‘শ্রী—চট্টোপাধ্যায়’।

সত্য ও মিথ্যা

১

পিতলকে সোনা বলিয়া চালাইলে সোনার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটারও জাত যায়। অথচ সংসারে ইহার অসম্ভাব নাই। জায়গা ও সময়-বিশেষে ছোট মাথায় দিয়া খাতির আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটুখানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে, একদিকে এই খাতিরটাও যেমন ফাঁকি, মানুষটার লাহুনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্য গোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিয়া দেখানো, এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয় মানুষ যখন নিজের দৈন্ত জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী-দাওয়া নাই। এই অসত্য অধিকার যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের স্তূপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার যো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা ‘সিডিশন’। অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে সুরু করিয়া কনেষ্টবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন—সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, সত্যসঙ্গত সমালোচনা—এমন কি তীব্র ও কটু হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই যাহাতে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়, চিন্তের কোন প্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এমনি। অর্থাৎ, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই যাহাতে প্রজাপুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্নত হইয়া উঠে, অশ্রায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্তের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়। ঠিক এমনিটি না ঘটিলেই তাহা রাজ-বিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? দুইজন পাকা ও অত্যন্ত হুঁসিয়ার এডিটরকে একদিন প্রশ্ন করিলাম। একজন মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন,—ওটা ভাগ্য। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে ‘সিডিশন’ হয় না—ওটা বিগড়াইলেই হয়। আর একজন পরামর্শ দিলেন,—একটা মজা আছে।* লেখার গোড়ায় ‘যদি’ এবং শেষে ‘কি না’ দিতে হয়, এবং এই দুটা কথা নির্বিচারে সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে আর সিডিশনের ভয় থাকে না। হবেও বা, বলিয়া নিখাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম; কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শ যেমন দুর্কোধ্য, অপরের উপদেশও তেমনি অন্ধকার ঠেকিল।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

লিখিয়া লিখিয়া নিজের বৃদ্ধা হইলাম, নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক-মতই কোন একটা বিষয় স্মায়সঙ্গত কি না স্থির করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি' ও 'কি না' বিকীর্ণ করিয়া 'সিডিশন' বাঁচাইব, ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব, সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, ইহার কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ-দেশ সত্যবাদিতার জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দশার অন্ত নাই। সত্য-বাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি-বা কেহ লেখে, ছাপা-ওয়ালারা ছাপিতে চায় না;—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা বাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্ম দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা বাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শত-কোটি নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাঁহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয়, রাজ-রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁকে ফাঁকে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিকৃত বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্বল, শক্তি, সত্য যেদেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে-রাজ্যে লেখকের দল এতবড় উৎসুকি করিতে বাধ্য হয়, সেদেশে রাজনীতি, ধর্ম-নীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দ্বায়ে সিঁদ কাটিতে শুরু করে, তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে, তাহার মহত্ব বাড়ে না, এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতার দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূঁচ বিধিতে থাকে।

দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আরও একটু পরিষ্কৃত হইবে।

সর্বদেশে সর্বকালে থিয়েটার জিনিসটা কেবল আনন্দ নয়, লোক-শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা একসময় বাঙলার ষ্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইংরাজ নীলকর অতিশয় কদাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল ইহাতে ‘ক্লাস হেটরেড’ না কি এমনি একটা ভয়ানক বস্তু তাহা হইতে অরাজকতা ঘটিতে পারে। অতএব অবিলম্বে বইখানা ষ্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটার-ওয়ালারা দেখিলেন ঘোর বিপদ। তাহারা কর্তাদের দ্বারে গিয়া ধর্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন হজুর, কি অপরাধ? কর্তারা বলিলেন, লরেন্স ফষ্টর নামটা কিছুতেই চলিবে না, ওটা ইংরাজী নাম। অতএব, ওটা ‘ক্লাস হেটরেড’। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞা প্রভু! ইংরাজী নামটা বদলাইয়া এখানে একটা পর্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ, না ডিসিল্ভা, না কি এমনি একটা—যা মনে আসিল, অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন, এই নিন।

কর্তা দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, আর এই ‘জন্মভূমি’ কথাটা কাটিয়া দাও—ওটা ‘সিডিশন’।

ম্যানেজার অবাক হইয়া বলিলেন, সে কি হজুর, এদেশে যে জন্মিয়াছি!

কর্তা রাগিয়া বলিলেন, তুমি জন্মাইতে পার, কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।

‘তথাস্তু’ বলিয়া ম্যানেজার শব্দটা বদলাইয়া দিয়া প্লে পাশ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় শুরু হইয়া গেল। ‘ক্লাস হেটরেড’ হইতে আরম্ভ করিয়া মায় ‘সিডিশন’ পর্যন্ত বিদেশী রাজ-শক্তির যত-কিছু ভয় ছিল দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন। যাহারা পয়সা ধরচ করিয়া তামাসা দেখিতে আসিল, তাহারা তামাসার অতিরিক্ত আরও যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহির হইতে কোথাও কোন ক্রটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া হয়ত কেহ ছিল না, ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভুত পর্তুগীজ নামটিও মিথ্যা। ব্যাপারটাও তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ফল কোনমতেই তুচ্ছ নয়। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের বোধ করি ইচ্ছা ছিল, সে-সময় বাঙলাদেশে ইংরাজ নীলকরের দ্বারা যে-সকল অত্যাচার ও অনাচার

অপ্রকাশিত রচনাবলী

অল্পস্থিত হইত তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহারই অভিনয়ে 'ক্লাস হেটরেড' জাগিতে পারে, রাজ-শক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক এ আমার আলোচ্য নয়, কিংবা ইংরাজ নামের পরিবর্তে পর্তুগীজ নাম বসাইলে 'ক্লাস হেটরেড' বাঁচে কি না সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে, যাহাতে 'ক্লাস' বলিয়া কোন বস্তু নাই, তাহার নিরপেক্ষ বিচারে একের অপরাধ অপরের স্বক্কে আরোপ করিলে যে বস্তু মরে, তাহার দাম 'ক্লাস হেটরেডে'রও অনেক বেশী। সেদিন দেখিলাম, এই ছোট ফাঁকিটুকু হইতে ছোট ছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের সামান্য পাঠ্য পুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন গ্রন্থকার আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—এই আশ্চর্য নামটি আপনি সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? গ্রন্থকার সলজ্জ কহিলেন—প্রাণের দায়ে করিতে হয়, মশায়! জানি সব, কিন্তু গরীব, পয়সা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়াছি, তাই ওই ফন্দিটুকু না করিলে কোন স্থলে বই চলিবে না।

তাঁহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম—যে-রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যেদেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়,—লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে-দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন? সেদেশের অসত্য-সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল বুড়ি বুড়ি আবর্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গমঞ্চ ভদ্র-পরিত্যক্ত, পঙ্গু, অকর্মণ্য। সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের রক্তের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা-ভরসার সে কেহ নয়—সে যেন কোন্ অতীত যুগের মৃতদেহ। তাই পাঁচশত বছর পূর্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে জব্দ করিয়াছিল, এবং কখন কোন্ স্বযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে খোঁচা মারিয়াছিল, সে শুধু ইহারই সাক্ষী, এ-ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছু নাই। দেশের নাট্যকারগণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে, রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে; তাই সত্যবঞ্চিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। 'রুল ব্রিটানিয়া' গাহিতে ইংরাজের বন্ধ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু 'আমার দেশ' আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র-হিমাচল ব্যাপিনী ভাবের বন্যা, কর্ম ও উন্মের স্রোত বহিতেছে, নাট্যাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন

শরণ-সাহিত্য-সংগ্রহ

এতটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা-জানালা ভয় ও মিথ্যার অর্গলে আজ এমনি অবরুদ্ধ যে, দেশ-জোড়া এতবড় দীপ্তির রশ্মিকণাটুকুও তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটতে পারিত? আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বৃকের রক্ত ঝাঁহারা এমনি করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন্ দেশের নাট্যশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ এমনি করিয়া বারিত হইতে পারিত? অথচ সমস্তই দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত। দেশের কল্যাণের জন্তই আজ দেশের নাট্যকারগণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁস বাঁধা। এবং এমনি কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে, দেশের কবি, দেশের নাট্যকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে, দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শান্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ-কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু এই নির্কিচারে মানিয়া চলার লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে সে ছোট হয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখ-ভোগ সে-ই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে? ঋণ-পরিশোধের দুঃখ আছে,—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু দেনা শোধ করিবার তুলব যেদিন তাহারও ভাগ্যে আসিবে, সেদিন তাহারই কি মুখে হাসি ধরিবে না!

ব্যাপারটা কাগজে-কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিতেছে ঠিক জানি না। হয়ত এই বাঙলাদেশেই এমনি মানুষও আছেন ঝাঁহাদের কাছে আগাগোড়া তুচ্ছ মনে হওয়াও বিচিত্র নয়; এবং যদি তাই হয়, তবুও আরও এমনি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এ প্রসঙ্গ এবারের মত বন্ধ করিব। সেদিন University Institute এ ছেলোদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তির একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্বদেশে পূজিত কবির শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “এবার ফিরাও মোরে” শীর্ষক কবিতাটি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। ঝাঁহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই-একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে, এই সুদীর্ঘ কবিতাটির যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দশার কাহিনী যেখায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য কে করিল?

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্বাচনের ভার ঝাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, রক্ত ঝাঁহারা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই ছোবড়া-আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার তুল ভাদিয়া দিল।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কি-না ওতে দেশের দুঃখ-বৈশ্বের কথা আছে, তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা 'সিডিশন'।

কহিলাম—কে বলিল ?

ছেলেটি জবাব দিল—আমাদের কর্তৃপক্ষরা।

যাক,—বাঁচা গেল। কর্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্কাটীন শিশুগুলার মঙ্গল-চিন্তা করিতে এ-পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না ?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন, পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্মল—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উথিত হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় তাহার আবৃত্তি 'সিডিশন'—তাহা অপরাধের ! এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং কর্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে,—ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

রস-সেবায়ত

শ্রীযুক্ত 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনার ৩০শে ভাদ্রের 'আত্মশক্তি' কাগজে মুসাফির-লিখিত 'সাহিত্যের মামলা' পড়িলাম। একদিন বাঙলা-সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতির আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের 'রসে'র আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমনিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্তে সেবায়তের সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়, এবং মামলা ত থাকেই।

আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্য-কর্মে যাহারা নিযুক্ত, আমিও তাঁহাদের একজন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্ৰহ

মুসাফির-রচিত এই 'সাহিত্যের মামলা'র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র 'কল্লোল', 'কালি-কলম' বা বাঙলার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অল্পমানটি নিতুল নয়। তবে এ-কথা মানি যে, সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি, এ দাবী আমি করি না।

এ ত গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুক্ত করিয়া যে কিরূপে তাহার সীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া, এবং নরেশ দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনই যুক্তি, পড়িয়া যুক্ত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি-ঠাঙ্গা উত্তত হইয়া উঠিবে! আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় 'সীমানা বিচারে'র রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব! যেমন গভীরতা, তেমন বিস্তৃতি, তেমন পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, শ্রায়, গীতা, বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জলনীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্য্যন্ত। বাপূরে বাপু! মাহুষে এত পড়েই বা কখন, এবং মনে রাখাই বা কি করিয়া!

ইহার পার্শ্বে 'লাল শালু-মণ্ডিত বংশধর-নির্মিত ক্রীড়া-গাণ্ডীব-ধারী' নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব-নাট্যসমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিংবাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁর নাম রাম-নরসিংবাবু। আরও বড় অ্যাক্টর! যেমন দরাজ গলার ছকার, তেমনি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম। যেন মত্ত হস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিংবাবুর দাপটে আমাদের শুধু নরসিংবাবু একেবারে তৃতীয়ার শশিকলার শ্রায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তিনি যুক্ত-হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।

বিজেন্দ্রবাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেমনি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এমনি সতর্কতা। যেন

অপ্রকাশিত রচনাবলী

বেড়াঝালে ঘেরিয়া রুই-কাতলা হইতে শামুক-গুগলি পর্যন্ত ছাকিয়া তুলিতে বন্ধপরিষ্কর ।

হায় রে বিচার! হায় রে সাহিত্যের রস! মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান-তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।

কিন্তু ততঃ কিম্?

এই কিম্বটুকুই কিন্তু ঢের বেশী চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইঁহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইঁহাদের ভাব-বিনিময় ও প্রীতি-সম্ভাষণ বুঝা যায়। কিন্তু এইসকল আদর-আপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া যখন বাহিরের লোকে আসিয়া উৎসবে যোগ দেয়, তখন তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্য থামাইবে কে?

একটা উদাহরণ দিই। এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজহর্ষভ হাজারা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, "এখন যেক্রম রাজনীতির চর্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত", সেইরূপ অর্থোপার্জনের জন্তই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই যে, "ইঁাড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।"

এই ব্যক্তি ডেপুটিগিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইঁহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে, দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে ইঁহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজহর্ষভবাবু না জানিতে পারেন, কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ-কথা অজানা নয় যে, সাহিত্যের ভালো-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের ইঁাড়ি-চড়া না-চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এতবড় কটুক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মাহুষের দৈন্তকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্র-সমাজের নয় এবং ঘটি-চুরির বিচারে পরিপক্বতা অর্জন করিলেই সাহিত্যের 'রসে'র বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে,—কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না। ইতি এই আশ্বিন, ১৩৩৪।

আমার আশায়

জীবনটাকে কি গানের সঙ্গে তুলনা করা যায় না? ক্ষতি কি? গানের মত জীবনেরও একটা লয় থাকে। সেই লয় কোনটায় দ্রুত—কোনটায় চিমে। কেউ যুদ্ধের বাজন বাজিয়ে দ্রুত-তালে চলে যাচ্ছে—আর কেউ-বা চিমে-তালে দীর্ঘদিন ধরে পিছনে পড়ে থাকছে।

যারা একসঙ্গে পা ফেলে চলে যেতে পারে, তাদের ভাগ্য ভাল। আমার ভাগ্যে তা হ'ল না। তিনি বিজয়-গর্বে কবে চলে গেছেন—আর আমি! পোড়া কপাল আমার!

আমাকে দেখে তোমরা নিশ্চয় পাগল মনে করছ? তা করতে পার। আমার সাজের সঙ্গে জীবনের যে বিষম গরমিল রয়েছে। আমার হাতে চুড়ি বক্বক্ব করছে। আমার সিংখের সিংহুর ডগ্‌ডগ্‌ করছে। আমার পরণে কস্তাপেড়ে শাড়ী। কিন্তু যার জন্মে এই-সব —তিনিই ত নেই।

সত্যি বলছি—ওগো তোমরা অমন করে হেসো না। গা-টেপাটিগি করে ব'লো না, আমি পাগল। সত্যি বলছি—আমি পাগল নই। তবে আমি কি? ওগো! ও-কথা বলতেও যে আমি বড় ভয় পাই! বাস্তবিক তিনি কি নেই?

আমি কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি,—কত সাধুসন্ন্যাসীর পায়ে মাথা খুঁড়েছি—কিন্তু কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না! তবে বুঝি এ-কথার জবাব নেই!

তোমরা যদি কেউ বলতে পার ত—এই অভাগিনীর বড় উপকার হবে। বলতে পারবে? আঃ—ভগবান তোমাদের সুখী করুন—আর কি বলব—দীর্ঘজীবী হও বলতে যে ভয় করে,—ভয় হয়, আশীর্বাদ করতে না শাপ দিয়ে বসি।

তবে বলি, শোনো—

বোশেখ মাসে বেলের গাছ দেখেছ? কত পাতার আঘরণে ঘন দলের বুদ্ধের মধ্যে কুঁড়িটি ঘুমিয়ে থাকে। বসন্তের কোকিলের ডাক তাকে জাগাতে পারে না। ঝলম্ব-বাতাসের সব আরাধনাকে সে তুচ্ছ করে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

তার পর, বলন্ত বখন হায় হায় করতে করতে চলে যায়—তখন অভাগী কুঁড়ি ধড়-ধড় করে তিনদিনের মধ্যে ফুটে উঠে। তখন তার সাত-শ খোয়ার। কড়া সূর্য্যের তাড়

অপ্রকাশিত রচনাবলী

তার উপর কি নির্দয়ভাবে পড়ে বিক্রম করতে থাকে ! দাঁড়কাকের হাহাকার শুনতে শুনতে দিনশেষে সে ডালের নীচে এলিয়ে পড়ে !

আমি ফুল নই । তাই এলিয়ে পড়লুম না । ঝরে পড়লে ত সব চুকেই যেত ।

খুব গরীবের ঘরে আমার জন্ম হয়নি । বাবা এমন ডাকসাইটে বড়লোকও কিছু ছিলেন না । কিন্তু কাল হ'ল আমার পোড়া রূপ ।

শুনতে পাই—আমার দুধে-রঙে আলতার আভা ছিল । কালো চুল পা অবধি লুটিয়ে পড়ত । আরো কত-কি ।

এ-সব আমার শোনা কথা । সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন । তোমরা কি তার পরিচয় কিছু পাচ্ছ ?

কি দেখছ ? না, না—ও রং নয়—আমার ঠোঁট অমনিতরই । এটা ? টিপ নয়—এটা একটা তিল । ওটা জন্ম থেকেই আছে ।

তাই দেখেই ত সন্ন্যাসী মিন্‌সে বলেছিল যে, আমি হবো রাজরাণী । আহা ! যদি না বলত ! মিন্‌সে যা বললে তাই হ'ল গা !

আহা, যদি না সেদিন সকালে সাজি-হাতে বেরুতাম ! গন্ধাজলে কি শিব-পূজো হয় না ? মা'র ছিল সবতাতেই যেন বাড়াবাড়ি । ফুল তাঁর চাই-ই, নইলে শিব-পূজো হবে না । আর তিনিই বা জানবেন কি করে ? আর রাজারই বা কি আক্কেল ! দুনিয়ায় এত পথ থাকতে—তাঁর যাবার রাস্তা হ'ল সেই আমাদের পুকুরের ধারের সরু গলিটা দিয়ে !

শুনলাম, রাজা আসছেন । রাজা আসছেন, হাঁ করে রাজা দেখছি । মনে করলাম, বুঝি-বা তাঁর চারটে হাত দেখব । হায় রে, তখন যদি ছুট মেরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ি !

রাজা ত বাপু কত লোক দেখেছিল । কপাল ত আর কারুর ধরল না !

সেদিন থেকে লোকের হাসি সহিতে পারিনে । মনে হয়, ওই হাসির নীচে যেন ছুরির বাঁকা ধারটা ঝিকঝিক করছে ।

রাজা হেসে বললেন, “মা, কি তোমার নাম ?”—আমি ত লজ্জায় মরে গেলাম । ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে বা-পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলাম । নাম মনে এল না । কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল । নাকের উপর বিন্‌কি বিন্‌কি ঘাম দেখা দিলে ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

রাজা বললেন, “কি শাস্ত—কি লক্ষণ—কি শ্রী—এ যে শুধু আমার ঘরেরই উপযুক্ত !”

সেদিন থেকে চারিদিকে কানাঘুষো পড়ে গেল। আমার মনের মধ্যে ছট্-ফটানি ধরল। কৈ, রাজার খবর আসে না কেন? হায় পোড়াকপালী!—শেষে তোর সাধ মিটল!

যখন ডাক পড়ল, তখন একেবারে চুলের মুঠি ধরে। আর সবুর সইল না। জানিনে, কবে কোন্ ফাঁকে কুমার আমাকে দেখে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে বসলেন।

পাঁজি-পুণি ধরে গোণকার বিয়ের দিন ঠিক করলেন,—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমেতে।

কি জল, কি ঝড় সে-রাতে। সত্যি বলছি—সে বাতাসে বিয়ের মন্তরগুলো সব উড়ে গেল। শুধু আমরা দু’জনে দু’জনকে দেখলাম—মাত্র একটিবার! তার পর ঝড়ে সব বাতি নিবে গেল—আমাদের গলার ঝুঁইএর গোড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল।

আমি কুমারের বুকের কাছে জড়সড় হয়ে বললুম, “ওগো, আমার যে বড় ভয় করছে।” তিনি মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, “আরো সরে এস—আমার এই বুকের মধ্যে।”

আমি কাঁপতে কাঁপতে ঝড়ের মধ্যে—পাখীর ছানা যেমন তার নীড়ের মধ্যে ঘুমোয়,—তেমনি করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম-ভেঙে দেখি, কই রাজকুমার,—এ যে আমাদের বুড়ো বির বুকের মধ্যে রয়েছি!

তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, দু’চোখ বেয়ে তার জল পড়ছে। কথা কইতে সাহস হল না।

দেখলাম, বাইরে মেঘ থেকে অজস্র জল পড়ছে—দেখলাম, বাড়ির সকলের চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। গাছের মধ্যে দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বাতাস বইছে। আমার বুকের মধ্যে মনে হ’ল অনেকখানি বাতাস তেমনি করে গুমরে উঠছে। মনে হ’ল কাঁদি। কাশা এল না। অবাক হয়ে রইলাম। একরাতেই মধ্যে আমার বুকের সব রক্ত—চোখের সব জল এমন নিঃশেষ করে কে গুষে নিলে!

তার পর আর কুমারের সঙ্গে দেখা হ’ল না। লজ্জায় কারুকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, তিনি কোথায়।

মস্তবড় বাড়ির মধ্যে খাঁচার পাখীর মত আটকা পড়ে রইলুম। যে আমাকে দেখে সেই কাঁদে—আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

শেষকালে একদিন রাজপুত্রুর দেখা দিলেন। সেদিন কি ঘুমেই না পেয়েছিল আমাকে! কত কথা তিনি বলেছিলেন; তার মানে তখন বুঝিনি। এখনই কি ছাই বুঝতে পেরেছি!

তিনি বললেন, আবার দেখা হবে; কবে তা বলেননি। বলেছেন, তিনি আমাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবেন না। তিনি মানা করেছেন—আমাকে সিঁথির সিঁদুর মুছতে—আমার হাতের চুড়ি খুলে ফেলতে। তাই এই সিঁদুর—তাই আজও এই পোড়া হাত-হুটোতে সোনার চুড়ি ঝকঝক করে।

এখন তোমরা কি কেউ দয়া করে আমাকে বলতে পার, কবে তিনি আসছেন?

ও কি! তোমরাও যে অবাক হয়ে চেয়ে রইলে! চোখের অমন উদাস চাউনি যে আমি সহিতে পারিনে!

ওগো, তোমরা কি সব ছবি? কথা কও না? হায় হায়—এ কোন্ দেশে তুমি আমায় রেখে গেছ, কুমার? ও মা! চোখের কোণে তোমাদের ও কি গা? জল নয় ত? সে কি, তোমরাও কথা কইবে না? তবে কে আনায় বলে দেবে—কবে তুমি আসবে কুমার?

বসচক্র

রাজশাহী শহরের ক্রোশ-কয়েক দূরে বিরজাপুর গ্রাম। গ্রামটি বড়,—বহু ঘর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কায়স্থের বাস। কিন্তু মৈত্র-বংশের সততা, সাধুতা এবং স্বধর্মনিষ্ঠার খ্যাতি গ্রাম উপচাইয়া শহর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বিষয়-সম্পত্তি ঘাড়া ছিল, তাহাতে মোটা ভাত-কাপড়টাই কোনমতে চলিতে পারিত, কিন্তু তাহার অধিক নয়। অথচ ক্রিয়া-কলাপ কোনটাই বাদ পড়িবার যো ছিল না। অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া ভদ্রাসন, অনেকগুলি মেটে খোড়ো ঘর, মস্তবড় চণ্ডীমণ্ডপ;—ইহার সকলগুলিই সকল সময়েই পরিপূর্ণ।

কিন্তু এ-সব হইত কি করিয়া? হইত, উপস্থিত তিন ভাই-ই উপার্জন করিতেন বলিয়া। বড় শিবরতন গ্রামেই জমিদারী-রাজসরকারে ভাল চাকরি করিতেন; সেজ শম্ভুরতন সেয়ারের গাড়ীতে জেলা আদালতে পেস্কারী করিতে যাইতেন,

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ .

কেবল ন' বিভূতিরতন ধনী শ্বশুরের কৃপায় কলিকাতায় থাকিয়া কোন একটা বড় সওদাগরী অফিসে বড় কাজ পাইয়াছিলেন। মেজ এবং ছোট ভাই শিশুকালেই মারা পড়িয়াছিল, তালিকায় ওই দুটা শূন্যস্থান ব্যতীত আর তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

দিন-দুই হইল দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেছে; প্রতিমার কাঠামোটা উঠানের একধারে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে,—সহসা চোখ না পড়ে; কেবল তাঁহার মঙ্গলঘট্টা আজিও বেদীর পার্শ্বে তেমনি বসানো আছে। তাহার আত্মপল্লব আজিও তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি সজীব রহিয়াছে,—এখনও একবিন্দু মলিনতা কোথাও স্পর্শ করে নাই।

সকালে ইহারই অদূরে একটা বড় সতরঞ্চের উপর বসিয়া তিন ভাইয়ের মধ্যে বোধ হয় ধরচপত্রের আলোচনাটাই এইমাত্র শেষ হইয়া একটু বিরাম পড়িয়াছিল, বিভূতিরতন একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত মুখখানা হাসির মত করিয়া কহিল, সেদিন শাওড়ী-ঠাকরণ আশ্চর্য্য হয়ে বলছিলেন, তোমার মাইনের সমস্ত টাকাটা এক-দফা বাড়িতে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। তিনি আবার দরকার-মত কিছু নিয়ে বাকীটা ফিরে পাঠিয়ে দেন, এতে মাসে মাসে অনেকগুলো টাকা পোষ্টাফিসকে দিতে হয়।

সংসার-ধরচের খাতাখানা তখনও শিবরতনের সম্মুখে খোলা ছিল,—এবং চক্ষুও তাঁহার তাহাতেই আবদ্ধ ছিল, অনেকটা অন্তমনস্কের মত বলিলেন, পোষ্টাফিস মনি-অর্ডারের টাকা ছাড়বে কেন হে? এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

বিভূতির ধনী শ্বশুরাণীর যে কিছুদিন হইতেই কণ্ঠা-জামাতার সাংসারিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ সংশয় শিবরতনের জন্মিয়াছিল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।

বিভূতি মনে করিল, দাদা ঠিকমত কথাটাতে কান দেন নাই, তাই আরও একটু স্পষ্ট করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তা ত বটেই। তাই তিনি বলেন, আপনার আবশ্যক-মত টাকাটাই যদি শুধু—

শিবরতন চোখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, আমার আবশ্যক তোমরা জানবে কি করে?

তাঁহার মুখের উপর তেমনি সূক্ষ্ম ও শান্ত ভাব দেখিয়া বিভূতির সাহস বাড়িল, সে প্রফুল্ল হইয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই তিনি বলছিলেন, আপনার চিঠিপত্রের মধ্যে তার একটুখানি আভাস থাকলেও এই বাজে-ধরচটা আর হতে পারত না।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বিভূতি কহিল, যে আজে, তাই যাবো।

শিবরতন আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, ন'বোমার কাছে বড় অপ্রতিভ হয়ে আছি। গত বৎসর তাঁকে একপ্রকার কথাই দিয়েছিলাম যে, এ-বৎসর তাঁর ছুটি,—এ-বৎসর বাপের বাড়িতে তিনি পূজা দেখবেন। 'কিন্তু দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই ভয় হতে লাগল, তিনি না থাকলে ক্রিয়া-কর্ম যেন সমস্ত বিশৃঙ্খল, সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। আদর-অভ্যর্থনা করতে, সকল দিকে দৃষ্টি রাখতে তাঁর ত আর জোড়া নেই কি না! এত কাজ, এত গণ্ডগোল, এত হান্ধামা, কিন্তু কখনো মাকে বলতে শুনলাম না—এটা দেখিনি, কিংবা এটা ভুলে গেছি। অন্য সময়ে সংসার চলে,—বড়বো ও সেজবোমাই দেখতে পারেন, কিন্তু বৃহৎ কাজকর্মের মধ্যে আমার ন'বোমা নেই মনে করলেই ভয়ে যেন আমার হাত-পা ঞ্টিয়ে আসে,—কিছুতে সাহস পাইনে। এই বলিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায় মুখখানি দীপ্ত করিয়া তিনি পুনরায় নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

বড়কর্তার ন'বোমার প্রতি বিশেষ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, ইহা লইয়া বাটীর মধ্যে আলোচনা ত হইতই, এমন কি একটা ঈর্ষার ভাবও ছিল। বড়-বধু রাগ করিয়া মাঝে মাঝে ত স্পষ্ট করিয়াই স্বামীকে শুনাইয়া দিতেন; এবং সেজ-বধু আড়ালে অসাক্ষাতে এরূপ কথাও প্রচার করিতে বিরত হইতেন না যে, ন'বো শুধু বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই এই ধোসামোদ করা। নইলে আমরা দু'জায়ে এগারো মাসই যদি গৃহস্থালীর ভার টানতে পারি ত পূজার মাসটা আর পারি না! বড়-মামুষের মেয়ে না এলেই কি মায়ের পূজা আটকে যাবে?

এই-সকল প্রচ্ছন্ন শব্দভেদী বাণ যথাকালে যথাস্থানে আসিয়াই পৌঁছিত, কিন্তু শিবরতন না হইতেন বিচলিত, না করিতেন প্রতিবাদ। হয়ত-বা কেবল একটুখানি মুচকিয়া হাসিতেন মাত্র। বিভূতি অধিক উপার্জন করে, তাহাকে বারো-মাস বাসা করিয়া কলিকাতাতেই থাকিতে হয়, সুতরাং ন'বধুমাতার তথায় না থাকিলে নয়। এ-কথা তিনি বেশ বুঝিতেন, কিন্তু অবুঝের দল কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহিত না। তাহাদের একজনকে সংসারের মামুলি এবং মোটা কাজগুলো সারা বৎসর ধরিয়াই করিতে হয় না। কেবল মহামায়ার পূজা-উপলক্ষে হঠাৎ একসময়ে আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব, সকল কর্তৃত্ব নিজের হাতে লইয়া তাহা নির্বিঘ্নে শেষ করিয়া দিয়া, ঘরের এবং পরের সমস্ত সুখ্যাতি আহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়,—সে না থাকিলে এ-সব যেন কিছু হইতে পারিত না, সমস্তই যেন এলোমেলো হইয়া উঠিত, লোকের মুখের ও চোখের এইসকল ইঙ্গিতে মেয়েদের চিন্ত একেবারে

অপ্রকাশিত রচনাবলী

শিবরতন তাঁহার হিসাবের খাতার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আনত করিয়া জবাব দিলেন, তাঁকে বলো, দাদা একে বাজে খরচ বলেও মনে করেন না, চিঠিপত্রে আভাস দেওয়াও দরকার ভাবেন না। যোগীন, তামাক দিয়ে যা।

বিভূতি পাংশু-মুখে শুকু হইয়া বসিয়া রহিল এবং শুকু দাদার আনত মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া হাতের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারো মুখেই কথা রহিল না,—একটা অবাঞ্ছিত নীরবতায় ঘর ভরিয়া রহিল। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে এই মৈত্রেয়-বংশের ইতিবৃত্তটাকে আরও একটু পরিস্ফুট করা প্রয়োজন।

এই বিরাজপুরে ইহাদের সাত-আট পুরুষেরও অধিককাল বাস হইয়া গেছে, অনেক ঘর-দ্বার ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, অনেক ঘর-দ্বার আবশ্যক-মত বাড়ানো কমানো হইয়াছে। কিন্তু সাবেক-দিনের সেই রুকনশালাটি আজও তেমনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় হইয়াই রহিয়াছে। কখনো তাহাকে বিভক্ত করা হয় নাই, কখনো তাহাতে আর একটা সংযুক্ত করিবার কল্পনা পর্য্যন্ত হয় নাই। এই পরিবার চিরদিন একাগ্রবর্তী, চিরদিনই যিনি বড়, তিনি বড় থাকিয়াই জীবনপাত করিয়া গেছেন,—পরে জন্মিয়া অগ্রজের সর্ব্বময় কর্তৃত্বকে কেহ কোনদিন প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় নাই।

সেই বংশের আজ যিনি বড়, সেই শিবরতন যখন ছোট ভাইয়ের অত্যন্ত দুঃস্থ সমস্যার শুধু কেবল একটা 'প্রয়োজন' নাই বলিয়াই নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, তখন বড়মামুষ খশুর-শাশুড়ীর নিরতিশয় জুড় মুখ মনে করিয়াও বিভূতির এমন সাহস হইল না যে, এই বিতর্কের একটুকুও জের টানিয়া চলে।

চাকর তামাক দিয়া গেল, শিবরতন খাতা বন্ধ করিয়া তাহা হাত-ধাক্কে বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ধীরে-স্থস্থে ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার ছুটি আর ক'দিন রইল বিভূতি?

আজ্ঞে ছ'দিন।

শিবরতন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হলে শুক্রবারেই তোমাকে রওনা হতে হবে দেখছি।

বিভূতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এই সময়টায় বড় বেশী কাজকর্ম, তাই—শিবরতন कहিলেন, তা বেশ। না হয়, ছ'দিন পূর্বেই যাও। দেবীপক্ষ—দিন-ক্ষণ দেখার আর আবশ্যক নেই,—সবই স্থদিন। তা হলে পরশু বুধবারেই রওনা হয়ে পড়, কি বল?

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

বছরের জন্তে আমাকে নিশ্চিত করে যেতে পারতেন, কেন না, এ-সকল কাজ আর কোন বোয়ের দ্বারাই অমন শৃঙ্খলায় হয় না,—কিন্তু কি আর করা যাবে! নিয়ে গিয়ে দু'দশদিন তাঁর মায়ের কাছে দিয়ো, তবু বোনদের সঙ্গে দিন-কতক আনন্দে কাটাতে পারবেন। বিভূতি, তোমার বাসায় ত বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না?

বিভূতি কহিল, আজে না, অসুবিধা কিছুই হবে না।

শিবরতন বলিলেন, বেশ তাই ক'রো। ন'বোমা বাড়ি ছেড়ে যাবেন মনে হলেও আমার বিজয়ার দুঃখ যেন বেশী করে উথলে ওঠে,—কিন্তু কি আর করা যাবে। সবই মহামায়ার ইচ্ছা। সারা বছর সবাইকে নিয়ে সংসার করা—বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বোধ করি আরও কি একটু বলিতে গাইতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ উপস্থিত সকলেই একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধা জননী কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবরতন শশব্যস্তে হঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শব্দ এবং বিভূতি তাহারাও অগ্রজের সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল; মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—শিবু, আমার গুরুর দিকি রইল, তোদের বাড়িতে আর আমি জল গ্রহণ করব না, যদি না এর বিচার করিস্। ন'বো বড়লোকের বেটী, আজ আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে!

সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি ভাইয়েরা অধিক চমকিত হইতেন না। বিভূতি ভয়ে পাংশু হইয়া উঠিল, শিবরতন বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ন'বোমা! একি কখনো হতে পারে মা?

মা তেমনি রোদন-বিকৃত-কণ্ঠে কহিলেন, হয়েও কাজ নেই বাবা, ও যে ন'বো! বড়লোকের মেয়ে! তা যাই হোক, যখন গুরুর নাম নিয়ে দিকি করেচি, তখন বাড়িতে রেখে বুড়ো মাকে আর মেরো না বাবা, আজই কাশী পাঠিয়ে দাও। যাই তাঁদের চরণেই আশ্রয় নিই গে।

দেখিতে দেখিতে ছেলে-মেয়ে দাসী-চাকরে প্রায় ভীড় হইয়া উঠিয়াছিল, শিবরতন তাঁর ছোট মেয়ে গিরিবালার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হয়েছে রে, গিরি, তুই জানিস্?

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি বাবা।—এই বলিয়া সে সাণ্ডেলদের সরাস্র সন্দেশ কম হইবার বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া কহিল, ঠাকুরমা ন'ধুড়ীমাকে বড় গালাগালি দিচ্ছিলেন, বাবা!

অপ্রকাশিত রচনাবলী

দৃষ্টি হইয়া যাইত। কাজকর্ম অস্তে এই লইয়া প্রতি বৎসরেই কিছু-না-কিছু কলহ-বিবাদ হইতই। বিশেষ করিয়া মা আজও জীবিত আছেন এবং আজও তিনি গৃহিণী। কিন্তু বয়স অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ায় অপরের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া তিরস্কার ও গালি-গালাজ করার কাজটুকু মাত্র হাতে রাখিয়া গৃহিণীপনার বাকী সমস্ত দায়িত্বই তিনি স্বেচ্ছায় বড় ও সেজ-বধুমাতার হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি ন'বোকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। সে সুন্দরী, সে বড়লোকের মেয়ে, তাহার কাপড়-গহনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাকে সংসার করিতে হয় না, সে চিঠি লিখিতে পারে, অহঙ্কারে তাহার মাটিতে পা পড়ে না, ইত্যাদি নালিশ এগারো মাস-কাল নিয়ত শুনিতে শুনিতে এই বধুটির বিরুদ্ধে মন তাঁহার তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত; এবং এই দীর্ঘকাল পরে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিত, তখন তাহা অনধিকার-প্রবেশের মতই তাহার ঠেকিত।

কাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, ধরনী সাঙোলদের বাড়ির মেয়েদের সরায় সন্দেহ ছুটো করিয়া কম পড়িয়াছে, এবং কম পড়িয়াছিল কেবল তাহারা গরীব বলিয়াই। এই দুর্নাম শুধু গ্রামে নয়, তাহা শহর ছাড়াইয়া না-কি বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিবার উপক্রম করিয়াছে,—এই দুঃসংবাদ গৃহিণীর কানে গেল যখন তিনি আহ্নিকে বসিতেছিলেন। তখন হইতে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেছে,—মালা-আহ্নিকের যথেষ্ট বিষ ঘটিয়াছে, কিন্তু আলোচনার শেষ হইতে পায় নাই। দোষ শুধু ন'বোমার এ-বিষয়েও যেমন কাহারও সংশয় ছিল না, এবং নিজে সে বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া দরিদ্র-পরিবারের অপমান করিয়াছে, ইহাতেও তেমনি কাহারও সন্দেহ ছিল না। ন'বো যে সকল কথাই নীরবে সহ করিয়া যাইত তাহা নয়,—মাঝে মাঝে সেও উত্তর দিত, কিন্তু তাহার কোন উত্তরটাই সোজা শাওড়ীর কানে পৌঁছিত না, পৌঁছিত প্রতিধ্বনিত হইয়া। তাই তাহার বক্তব্যটা লোকের মুখে মুখে ঘা খাইয়া কেবল বিকৃতই হইত না, তাহার রেশটাও সহজে মিলাইতে চাহিত না। সকালে আজ বাটার মধ্যে যখন এই অবস্থা—সাম্র্যাল-পরিবারের মিষ্টানের ন্যূনতা লইয়া ন'বধুর সম্বন্ধে আলোচনা যখন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরে তখন শিবরতন সেই ন'বধুমাতারই প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শিবরতন কহিলেন, বৃধবারে ন'বোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। মা আমার আরও কিছুদিন এখানে থেকে যেতে পারলে যেখানের যা-সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে সারা

অপ্রকাশিত রচনাবলী

শিবরতন কহিলেন, তার পরে ?

মেয়ে বলিল, ন'খুড়ীমা মুখ বুজে ঝাঁট দিচ্ছিলেন, হুমুখে ন'কাকার জুতা-
জোড়াটা ছিল, তাই পা দিয়ে শুধু ফেলে দিয়েছিলেন ।

শিবরতন প্রশ্ন করিলেন, তার পরে ?

গিরি কহিল, এক পাটি জুতো ছিটকে এসে ঠাকুরমার পায়ের কাছে পড়েছিল ।

শিবরতন শুধু কহিলেন, হুঁ !—মায়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ভেতরে যাও মা !
এর বিচার যদি না হয় ত তখন কাণীতেই চলে য়েয়ো ।

একে একে ধীরে ধীরে সবাই প্রস্থান করিল, শুধু কেবল তিন ভাই সেইখানে
স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন । ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, কিন্তু সে শুধু পুড়িতেই লাগিল,
শিবরতন স্পর্শ করিলেন না । প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এইভাবে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া
অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিলেন, বিভূতি ?

বিভূতি সসঙ্কমে কহিল, আজ্ঞে ?

শিবরতন বলিলেন, তোমার স্ত্রীর শাস্তি তুমি ছাড়া আর কারও দেবার
অধিকার নেই ।

বিভূতি আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞা করুন ।

শিবরতন বলিলেন, ঐ জুতো তোমার স্ত্রীর মাথায় তুমি তুলে দেবে । উঠানের
মাঝখানে তিনি মাথায় নিয়ে সমস্ত বেলা দাঁড়িয়ে থাকবেন । তোমার উপর এই
আমার আদেশ ।

আদেশ শুনিয়া বিভূতির মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল । তাহার
স্বপ্নর-শাওড়ীর মুখ, শালী-শালাজদের মুখ, চাকরীর মুখ, স্ত্রীর মুখ, সমস্ত একই সঙ্গে
মনে পড়িয়া মুখখানা ভয়ে ভাবনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল ; সে জড়িত-কণ্ঠে কহিতে
চাহিল,—কিন্তু দাদা, দোষের বিচার না করেই—

শিবরতন শাস্ত-স্বরে কহিলেন, মা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছেন, এ তোমরাও
দেখলে । তাঁর কি দোষ, কতখানি দোষ, এ বিচারের ভার আমার ওপর নেই ।
যাদের বিচার করতে পারি তাঁদের প্রতি আমার এই আদেশ রইল । এখন কি
করবে সে তুমি জানো ।

বিভূতি কহিল, আপনার হুকুম চিরদিন মাথায় বয়ে এসেছি দাদা, কোনদিন
কোন স্বাধীনতা পাইনি । আজও তাই হবে, কিন্তু—

এই কিস্তটা সেও শেষ করিতে পারিল না, শিবরতনও নীরবে অধোমুখে বসিয়া
রহিলেন

বিভূতি ঋণকাল চূপ করিয়া থাকিয়া বোধ করি বা দাদার কাছে কিছু প্রত্যাশা করিল। কিন্তু কিছুই না পাইয়া সে উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল, দাদা, আমি চললুম— এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

শিবরতন কোন কথা कहিলেন না, তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পূজার বাড়ি, আজও আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ছেলেমেয়ে চাকর-দাসীতে পরিপূর্ণ। এই-সকলের মাঝখানে যে ন'বউমা তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রী, তাঁহারই এতবড় অপমান, এতবড় শাস্তি যে কি করিয়া অর্জিত হইবে তাহা তিনি নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার নত নেত্র হইতে বড় বড় ভগ্ন অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কিন্তু 'বিভূতি' বলিয়া একবার ফিরিয়া ডাকিতে পারিলেন না। কেবল মনে মনে প্রাণপণ-বলে বলিতে লাগিলেন—কিন্তু, কিন্তু মা যে! মা যে! তাঁর যে অপমান হয়েছে! *

‘সধবার একাদশী’

এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিতে যাওয়াই বোধ করি একটা বাড়াবাড়ি। অথচ এই কাজের জন্যই আমি অহরুদ্ব হইয়াছি। খুব সম্ভব, আমাকেই ইঁহারা যোগ্য ব্যক্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

যে-বইয়ের দোষ-গুণ আজ অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরিয়া যাচাই হইতেছে,—বিশেষতঃ, যে মারাত্মক উৎপাত কাটাঁইয়া সম্প্রতি ইঁহা খাড়া হইয়া উঠিল, তাহাতে মূল্য লইয়া ইঁহার আর দরদস্তুর করা সাজে না। বাঙলা-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ একখানি জাতীয় সম্পত্তি—এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভাল।

- অতএব, গ্রন্থ-সম্বন্ধে নয়, আমি ইঁহার সংস্করণ-সম্বন্ধেই দুই-একটা কথা বলিব।

* ‘রসচক্র’ নামে বারোয়ারী উপস্থানের সূচনা-স্বরূপ শরৎচন্দ্র-রচিত অংশ।

অপ্রকাশিত রচনাবলী

অত্যন্ত দুর্দিনে দেশের অনেক বহুমূল্য বস্তুই বটতলার সংস্করণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, —তাই আজ তাহাদের অনেকেরই ভদ্র সাজ-সজ্জা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, এবং বাঙালীর সম্পত্তি বলিয়াও গণ্য হইয়াছে ।

জানি না, ইহারও কোনদিন বটতলার ছায়ায় মাথা বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে কি না, কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু এই যে, যে-কোন সংস্করণই এতদিন যাবৎ ইহার প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছে, তাহার যত দোষ যত ত্রুটিই থাক, সে কেবল আমাদের কৃতজ্ঞতা নয়, ভক্তিরও পাত্র ।

অথচ গুণিতেছি, বাঙলা-সাহিত্যের সে দুঃসময় আর নাই । তাই, দুঃখ যদি আজ সত্যই ঘুচিয়া থাকে ত, যে-সকল গ্রন্থ আমাদের ঐশ্বর্য্য, আমাদের গৌরব, তাহাদের মলিন জীর্ণ বাস ঘুচাইবারও প্রয়োজন হইয়াছে ।

প্রকাশক বলিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই নিভুল সুন্দর সংস্করণ, এবং একখানি মাত্র নং-ই তাহাদের প্রথম ও শেষ উত্তম নয় ।

উদ্দেশ্য সাধু, এবং প্রার্থনা করি, ইহা জয়যুক্ত হউক ; কিন্তু ইহাও জানি, প্রকাশক কেবল সঙ্কল্প করিতেই পারেন, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও সিদ্ধি যাহাদের হাতে, সেই দেশের পাঠক-পাঠিকা যদি না চোখ মেলিয়া চান ত, কিছুতেই কিছু হইবে না । কিন্তু এতবড় কলঙ্কের কথাও আমার ভাবিতে ইচ্ছা করে না ।

বিলাত প্রভৃতি অঞ্চলে Oxford Press 'World's Classics' নাম দিয়া একটির পরে একটি যে-সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই সহিত এই নব-সংস্করণের একটা তুলনা করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি বলি— আজ নয় ।

হয়ত অনতিকাল মধ্যেই একদিন তাহার সময় আসিবে, কিন্তু তখন বাঙলা দেশকে সে শুভ-সংবাদ নিবেদন করিতে যোগ্যতর ব্যক্তিরও অভাব হইবে না । *

শিবপুর, ৬ই ফাল্গুন, ১৩২৬ ।

* দীনবন্ধু মিত্র-লিখিত 'সধবার একাদশী' গ্রন্থের ভূমিকা ।

ବବନ ସତ୍ତାର
ମନ୍ତ୍ରାଣ୍ଡ

গ্রন্থ-পরিচয়

শেষ প্রণ

প্রথম প্রকাশ—‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে :—১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ—কার্তিক, মাঘ—চৈত্র ; ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ—শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ; ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ; ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ ।

পুস্তকাকারে প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ (২রা মে, ১৯৩১) । গ্রন্থকার-কর্তৃক পরিমার্জিত ও বিশেষভাবে প্রথমমাংশে পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত ।

স্বামী

প্রথম প্রকাশ—১৩২৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা ‘নারায়ণ’ মাসিক পত্রে ।
পুস্তকাকারে প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ (১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮) ।
‘একাদশী বৈরাগী’ নামক গল্পটীও ইহার সহিত সন্নিবেশিত হয় ।

একাদশী বৈরাগী

প্রথম প্রকাশ—১৩২৪ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রে ।
পুস্তকাকারে প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ‘স্বামী’ গল্পের সহিত একত্র প্রকাশিত হয় ।

নারীর মূল্য

প্রথম প্রকাশ—১৩২০ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা ‘যমুনা’ মাসিক পত্রিকায় । এই ধারাবাহিক অংশগুলি ‘শ্রীমতী অনিলা দেবী’ ছদ্মনামে প্রকাশিত ।
পুস্তকাকারে প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ (১৮ই মার্চ ১৯২৪) ।

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

অপ্রকাশিত রচনাবলী (গ্রন্থাকারে)

স্বপ্নের গৌরব—শ্রাবণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দে রচিত এবং ১৩২০ বঙ্গাব্দ, মাঘ সংখ্যা

‘যমুনা’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ।

সত্য ও মিথ্যা—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২, ‘বাঙ্গলার কথা’য় প্রকাশিত ।

রস-সেবায়ত্ত—১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, ‘আত্মশক্তি’ পত্রিকায় প্রকাশিত ।

আসন্ন আশান্ন—রূপকথা । জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ‘ভারতবর্ষ’ মাসিক পত্রে
প্রকাশিত ।

রসচক্র—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা ‘উত্তরা’ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ।

‘সধবার একাদশী’—১৩২৬ বঙ্গাব্দে ‘কর মজুমদার এণ্ড কোং’-প্রকাশিত

দীনবন্ধু মিত্র-লিখিত ‘সধবার একাদশী’ নামক গ্রন্থের ভূমিকা ।

